তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রচিত

স্বর্ণলতা

[ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত]

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রীপবিত্র সরকার

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা ৭৩

FIRST ORILNT EDITION : April : 1961

TARAKNATH GANGULI
SVARNALATA
A NOVEL

Edited by

Promothonath Bisi
Pabitra Sarkar

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

Luzac's Oriental List, London

..."The maid Shama is the most charming character in the book, and one cannot help regretting that, nothing is said about arrangements for her happiness in the denonement, when poetical justice is being dealt out to the hero and heroine and their friends and enemies."

ভ্রম সংশোধন : ৫০ পৃষ্ঠায় টলস্টয়ের সংক্ষিপ্ততর উপন্যাসের প্রসঙ্গে 'Anna Karenina'-র স্থলে 'Resurrection' পড়লে ভালো হয়।

স্বর্ণলতা

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১

বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় উনিশ শতকে অধিকাংশ সমালোচকই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের নজির দেখাতেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ প্রদর্শন করাই সমালোচক অন্যতম কর্তব্য বোধ করতেন। কোনো সমালোচক এজন্যে শ্লাঘা বোধ করেছেন, আবার কেউ বা জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির দৈন্যে অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের এই প্রভাব বেশ কিছুদিন চলেছিল। মাঝে ভাঁটা পড়েছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে এই জাতীয় আলোচনার ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। একটা কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সাহিত্য বৃন্তহীন পুষ্প নয়। সব দেশের বৈশিষ্ট্য একাকার হয়ে যায় না। দেশজ সংস্কার শতবার ধুলেও নষ্ট হয় না। সুতরাং একথা মানতেই হবে কোনো পূর্বনির্দিষ্ট মতবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সাহিত্য-সমালোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কিন্তু একথাও মানব যে বাংলা রচনা (উনিশ শতকের) অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত। আর বাংলা সাহিত্যের তুলনায় ইংরেজি সাহিত্য বয়সে খুব প্রবীণ না হলেও অনেক বেশী সমৃদ্ধ। আমরা অনুসরণ করেছি ইংরেজি সাহিত্য। অনেক লেখকের অনুশীলনের শৈশব কেটেছে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠশালায়।

এখন, আমাদের উপন্যাসের আলোচনায় দেখতে পাই আমাদের সাহিত্যের এই আঙ্গিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস থেকে আহৃত। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করলে এইটি পরিষ্কার হয় যে, আমাদের উপন্যাসের ধারা ঠিক এই নিয়মে বিবর্তিত হয় নি। ইংরেজি অষ্টাদশ শতকের উপন্যাসের জগৎ আমরা কি হুবহু অনুসরণ করেছি? নিশ্চয়ই না। অষ্টাদশ শতকের রিয়ালিজম আমাদের সাহিত্যে আজ অবধি অনাবিষ্কৃত। তার জন্যে পরিতাপের কারণ নেই। কেননা উপন্যাসের জগৎটি সৃষ্টি হয়েছিল সেই শতকের বিশিষ্ট পরিবেশেই। বাংলা উনিশ শতকের সমাজের সঙ্গে তার নানা দিক দিয়ে ব্যবধান। তা না হলে নববাবুবিলাস কলিকাতা কমলালয় এবং

আলালের ঘরের দুলালের পরই অঙ্গুরীয় বিনিময়, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনীর মত রচনা পাই কেন? আলালের ঘরের দুলালে বাস্তবধর্মী উপন্যাস দানা বেঁধে উঠতে না উঠতেই ভূদেব-বঙ্কিম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন কেন? মনে রাখতে হবে ডিফো, ফিল্ডিং, রিচার্ডসনের পর স্কটের আবির্ভাবের মত অনুরূপ ঘটনা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ঘটে নি।

আসলে ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ বিশেষ প্রবণতা যেমন বিশেষ বিশেষ যুগে এসেছিল সেরকম সুনিয়মিত ভাবে আমাদের সাহিত্যের এইরকম যুগবিভাগ করা উচিত নয়। করা সম্ভবও নয়। মধুসূদন ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক দুই-ই। বঙ্কিমচন্দ্রও সম্ভবত তাই। আমাদের বিভিন্ন সাহিত্যিকবৃন্দ বিশেষ বিশেষ প্রবণতা অনুযায়ী এক এক প্রস্থান অবলম্বন করেছিলেন। ফলে একই সময়ে আমরা পেয়েছি মহাকাব্য, গীতিকবিতা, বাস্তবধর্মী উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস। আলালের ঘরের দুলালে উপন্যাসে যে পটভূমিকা দেখা দিয়েছিল বঙ্কিম তাকে প্রশংসা করেছেন সত্য কিন্তু তিনি সেপথ মাড়ান নি। বিশাল ঐতিহাসিক দৃশ্যপট, অভিজাত নরনারী অথবা কাব্যধর্মী নায়িকা এবং প্রকৃতির মনোহর রূপ বঙ্কিমচন্দ্রকে আকর্ষণ করেছিল। আটপৌরে সাদামাঠা বাঙালী জীবনে তিনি উপন্যাস রচনার কোনো উপাদান খুঁজে পান নি ঠিক নয়। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, ইন্দিরা তার প্রমাণ। কিন্তু এনব ক্ষেত্রেও দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর হৃৎপিণ্ডের ছন্দকে যতটা প্রশ্রয় দিয়েছেন ততটা উৎসাহ বোধ করেন নি তাদের আটপৌরে ঘরোয়া জীবন-অঙ্কনে। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেই তাঁর উপন্যাস রচনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রহমণ্ডলী থেকে দূরে অবস্থিত কয়েকজন সাহিত্যিকের প্রচেষ্টা বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ রোমান্সরাজ্যে বিচরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। এই দলের মধ্যে তারকনাথের স্বর্ণলতা নানা কারণে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল।

তারকনাথ যখন উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন তখন বাংলা নাটকের একটা গৌরবময় স্তরের সমাপ্তি ঘটে আরেকটি স্তরে পদার্পণ করেছে। প্রথম স্তরের নাটকের বিষয়বস্তু নানা দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক। অর্থাৎ রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র এবং অসংখ্য

সামাজিক সমস্যাঘটিত নাটকের লেখকবৃন্দ নাট্যরচনা প্রয়াসে সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উপন্যাসে যা সম্ভব ছিল নাটকে তা গৃহীত হল। এজন্যে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যকারদের হাতে ভাল নাটক পাওয়া না গেলেও অজস্র সমাজচিত্র পেয়েছি। কোথাও বিধবাবিবাহের সমর্থন অথবা বিরোধিতা, কোথাও মদ খাওয়ার কুফল, কোথাও কৌলীন্যপ্রথার ভয়াবহতা প্রদর্শিত হয়ে নাটকগুলি বাজারমূল্যে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছিল। সুতরাং উপন্যাসে যে বস্তু প্রত্যাশিত ছিল নাটক নামধেয় এই জাতীয় রচনা তা অধিকার করে নিলে। ফলে উপন্যাস আপাতত রোমান্সের কল্পলোকে বিচরণ করতে লাগল। এমন কি তারকনাথের রচনায় সকলে যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেরকম কোনো প্রমাণও খুব বেশী পাওয়া যায় না। এদিক থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখকের মধ্যে তারকনাথের ভূমিকা প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথ যে আক্ষেপ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ গৃহস্থ জীবনকে পরিস্ফুট করতে পারেন নি সে আক্ষেপ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, তারকনাথ কতকটা পূরণ করেছিলেন। স্বর্ণলতার বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে এবারে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিই।

২

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ৩১-এ অক্টোবর নদীয়া জেলার অন্তর্গত (বর্তমান যশোর জেলার বনগ্রাম) বাগআঁচড়া গ্রামে প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে তারকনাথের জন্ম। পিতার নাম মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। বাল্যকালেই তারকনাথ মাকে হারান। তারকনাথের জেঠাইমা তাঁকে মাতৃস্নেহ দান করেন। দশ বৎসর বয়সে তারকনাথ কলকাতায় আসেন। এখানে ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিতে তিনি ভর্তি হন। চোদ্দ বৎসরের সময় তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তিনি বৃত্তি পান। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন, 'তারকবাবুকে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে অতি অল্প সময়ই দেখিতাম। তিনি অধিকাংশ সময়েই ডিকেন্সের কোন উপন্যাস, না হয় মেকলে কিম্বা গিবনের ইতিহাস পড়িতেছেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। এজন্য আমরা অনেক সময় বিদ্রূপ করিতাম, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে রাসবিহারী

(স্যর রাসবিহারী ঘোষ) তারকবাবুকে বলিতেন, তুমি ডাক্তার হবে, তোমার ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ার দরকার কি? তারকবাবু বলিতেন, সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা ভাল।' ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডিগ্রী পান এল, এম, এস। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ৬ই জুলাই অতিরিক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন রূপে তারকনাথ সরকারী কাজে যোগ দেন। বাইশ বৎসর কাল পর্যন্ত তারকনাথ সরকারী কাজে ছিলেন। সরকারী কাজে তিনি কলকাতা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, যশোহর, শাহবাদের বক্সার ইত্যাদি অঞ্চলে ছিলেন। ভ্যাক্‌সিনেশ্যন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে উত্তরবঙ্গে কাজ করার সময় তারকনাথ ঐ জেলার বিভিন্ন গ্রামে যান। এই উপলক্ষ্যে সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই সময়েই তারকনাথ সঞ্চয় করেন। তিনি যখন গরুর গাড়িতে করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতেন তখন বিশ্রামের সময় পথের মধ্যেই গরুর গাড়ীর তলায় বসে স্বর্ণলতা বইটি লিখতেন। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে স্বর্ণলতা প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তব ভিত্তির উপর কল্পিত। তারকনাথ ডায়েরিতে লিখেছেন, Finished my tale in the evening at about 8 P. M. It was melancholy pleasure to see it completed as I was to part company with my friends for ever * * * some characters of my novel are from the real life * * My friend Suresh and Paresh two figures under the name of Ramesh and Debesh. স্বর্ণলতা শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রে প্রথম খণ্ড বার হয়। (আশ্বিন ১২৭৯—ভাদ্র ১২৮০, ইং ১৮৭২-৭৩).। রচনায় লেখকের নাম ছিল না। জ্ঞানাঙ্কুর কাগজ প্রকাশে তারকনাথই উৎসাহ দেন। এই পত্রিকাতেই ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কল্পতরু' উপন্যাসটি ছাপতে দেন। কিন্তু ব্রাহ্মবিদ্বেষ অতিরিক্ত ছিল বলে সম্পাদক বইটি ছাপেন নি। ইন্দ্রনাথ তারকনাথের বন্ধু ছিলেন। ইন্দ্রনাথের অনুরোধেই তারকনাথ যে স্বর্ণলতার লেখক তা প্রকাশ করে দেন। জ্ঞানাঙ্কুর পত্রে স্বর্ণলতা বার হবার সময়ে পত্রটির প্রচার বেড়ে যায়। স্বর্ণলতা যে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠকচিত্ত জয় করেছিল এই এক প্রমাণ। তারকনাথ গল্পপ্রবন্ধাদিও লিখতেন। তিনি কাব্যানুরাগী ছিলেন। ভারতচন্দ্রের তিনি সুরসিক পাঠক। কল্পলতা নামে তারকনাথ একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে পক্ষাঘাত রোগে তারকনাথের মৃত্যু হয়।

৩

স্বর্ণলতার আখ্যাপত্রে হরিবংশ [২৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য] ও হোরেসের একটি করে ছত্র উৎকলিত ছিল। ছত্র দুইটি হচ্ছে, Fictions to please should wear the face of truth. কথাপি তোষয়েদ্বিজ্ঞং যত্নসৌ তথ্যবস্তুবেৎ ইতি হরিবংশম্। এ দুটি ছত্রকে গ্রন্থের মর্ম বলা যেতে পারে। প্রথম বাক্যটি থেকে পাচ্ছি সত্যবস্তুই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হবে। এই 'সত্য' বলতে তারকনাথ বুঝেছেন জাগতিক সত্য। অর্থাৎ এই পরিবর্তমানজগতের চিত্রই উপন্যাসে পরিবেশন করা হবে। লেখকের কল্পিত বস্তু অথবা মিথ্যাকাহিনী গ্রন্থে স্থানপাবে না। সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে কবি-সাহিত্যিক-সৃষ্ট জগৎ কল্পনার জগৎ। তারকনাথ যথাসম্ভব এ কল্পনার জগৎ পরিহার করে জীবননিষ্ঠ হতে চেয়েছেন। তবে যেহেতু সে 'সত্য' to please-এর জন্যই লিখিত সেই হেতু সেই সত্যকে উপযুক্ত ভাবে পরিবেশন করতে হবে। অর্থাৎ কথাসাহিত্যের দেহকেও সজ্জিত করতে হবে। হরিবংশ থেকে যে ছত্রটি তোলা হয়েছে তারও মর্ম এই। বিজ্ঞজনকে সন্তুষ্ট করবার জন্য উপযুক্ত তথ্য পরিবেশন করা চাই। 'তোষয়েৎ' এবং 'to please' সমার্থক। তাহলে দেখতে পাচ্ছি তারকনাথ এইটি বুঝেছিলেন যে, তথ্য অথবা সত্যকে বিজ্ঞজনের জন্য এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যা তাঁদের আনন্দ দেবে অথবা সন্তোষ উৎপাদন করতে পারে। ফলে উপন্যাসের আশ্রয় নিতে হয়। এবং উপন্যাসের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যকেও উপেক্ষা করা যাবে না। কিন্তু তারক নাথের আলোচনায় যে তথ্যটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত সেটি হচ্ছে Face of truth অথবা তথ্যবস্তুবেৎ। কেননা এখানেই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এবং এখানেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সেকালে অন্যান্য লেখকদের মত তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশিত পথ অনুসরণ করলেন না কেন? এ প্রশ্ন মনে জাগে। কোথাও কোথাও তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। কখনও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যে ব্যঙ্গের ছোঁয়া লেগেছে। যেমন স্বর্ণলতার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের এই অংশটি—'গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন;

এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর বঙ্কিমবাবুই বা কিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া ওস্‌মান ও আয়েশার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? ইহা ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। বিষ্ণুশর্মা তো একেবারে বোবা হইতেন। * * এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিমবাবু আড়াই শত বৎসর পূর্বে এক যবনতনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন। এ কথা আমাদিগের বলিবার প্রয়োজন এই যে, এই গ্রন্থে উত্তরোত্তর যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিব তাহা, হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের পার্থিব কর্ণ ও চর্মচক্ষুর অগোচর হইলেও অমূলক নহে। আমরা আপনাদিগের অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ দেখিতে ও শুনিতে পাই। অতএব সে সমুদয় অবিশ্বাস করিবেন না।' বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর এ রকম বিরূপ সমালোচনা আমাদের তারকনাথের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ করে তোলে। কিন্তু তারকনাথের বঙ্কিমরচনাশৈলীর বিরোধিতার অন্য কারণও থাকতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী বার হবার পর যে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সময়ে একদল অক্ষম লেখক 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র অনুকরণে যেমন বাংলা সাহিত্যে আবর্জনার স্তূপ জড় করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণে সুলভ উপন্যাসে বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। সেসব বইএর কথা আজ আমাদের মনে নেই। কিন্তু তারকনাথের সময়ে সেগুলির কথঞ্চিৎ মূল্য ছিল সেকথা মানতে হয়। এ-সব বইএর মধ্যে কতকগুলির নাম করছি। নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রত্নোত্তমা (১৮৬৭), অজ্ঞাতনামার মনোত্তমা (১৮৬৮), জয়গোপাল গোস্বামীর শৈবলিনী (১৮৬৯), কালীবর ভট্টাচার্যের অকাল কুসুম (১৮৬৯), ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চণ্ডালিনী (১৮৭০), রাজকৃষ্ণ আঢ্যের কামরূপ-কামলতা (১৮৭১), গৌরীনাথ নিয়োগীর আশা-মরীচিকা (১৮৭২) ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। এ সকল গ্রন্থের স্থায়ীমূল্য বিশেষ কিছু ছিল না। তারকনাথের প্রতিক্রিয়া এসেছিল সম্ভবত এই সমস্ত গ্রন্থ দেখে। রোম্যান্টিক-ঐতিহাসিক-এড্‌ভেঞ্চারমূলক এ-সব কাহিনী তারকনাথকে বিপরীতধর্মী সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহিত

করেছিল। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে যেমন এক সময়ে ভাববিলাসী কবিবৃন্দ বাংলা কবিতার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং আরও কারো কারো মধ্যে, আমাদের মনে হয় সেরকম ভাবে তারকনাথও কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে বঙ্কিম প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করেছিলেন। তারকনাথ এই কারণে আটপৌরে বাঙালীর সংসারযাত্রার দিকে তাঁর দরদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

অন্য কারণটি গুরুতর। তারকনাথের জীবনীপাঠে জানতে পারি যে, যে-ইংরেজ ঔপন্যাসিক তারকনাথের চিত্তজয় করেছিলেন তিনি হচ্ছেন ডিকেন্স (Charles Dickens)। ডিকেন্সের সৃষ্ট জগতের সীমানা খুব বিস্তৃত নয়। প্রধানত ইংরেজ সমাজের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার এবং নিম্ন-সমাজের ছবিই ডিকেন্স এঁকেছেন। তাঁর রচনার প্রধান বিশিষ্টতা বোধ করি এটাই যে তিনি সমাজকে দূর থেকে দেখেন নি। যখন যে চরিত্র অঙ্কন রছেন তখন তিনি সেই চরিত্রের সঙ্গে নিবিড় মমত্ব উপলব্ধি করেছেন। তাদের সমস্তরে এসে পৌছেছেন। সাহিত্যিকের নিরাসক্ত দৃষ্টির পরিবর্তে তিনি চরিত্রগুলির সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনের সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য দেখিয়েছেন। ডিকেন্সের রচনার দোষগুণ উভয়ই এর জন্য। ডিকেন্সের কল্পনা উচ্চমার্গী ছিল না। তথাপি তিনি আদর্শবাদী। অসঙ্গতির পরিবর্তে সঙ্গতি, বৈষম্যের পরিবর্তে সামঞ্জস্য তিনি চেয়েছিলেন। আরও একটি বিষয়ে ডিকেন্স পাঠকচিত্ত জয় করেছিলেন। লণ্ডন শহরকে এত নিবিড় ও এত ঘনিষ্ঠভাবে বোধ করি এর আগে কেউ আঁকেন নি। লণ্ডন শহরের অনন্ত কলরোল ডিকেন্সের রচনায় ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। তারকনাথ যে বাংলা-দেশকে আঁকতে চাইলেন সেই বাংলাদেশও কল্পনার উজ্জ্বল আলোকে মহৎ নয়, কিংবা সকল দেশের সেরা বঙ্গভূমিকে তিনি লক্ষ্য করেন নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশকে তিনি যেমন দেখেছিলেন, যেমন বুঝেছিলেন তেমনি অঙ্কন করেছেন। শশিভূষণ, বিধুভূষণ, সরলা, গদাধর, নীলকমল, শ্যামা এমন কি শশাঙ্কশেখর সবই পরিচিত জগতের। এরা কাছের মানুষ, ধরাছোঁয়ার মধ্যে। সেকালের অধিকাংশ বাঙালীর জীবনের দৈনন্দিন ছবিই এই। সুতরাং তারকনাথের গুরু ডিকেন্সও লেখককে বাঙালী জীবনের সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনের ছবি আঁকতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তবে চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য যতখানি দূরত্বের প্রয়োজন তারকনাথের দৃষ্টি-

ভঙ্গিতে সে দূরত্ব ছিল না। তাঁর প্রবল সহানুভূতি চরিত্রগুলিকে যথার্থ ভূমিকায় স্থাপিত হতে দেয় নি। পাপপুণ্যের বণ্টনে লেখক যতটা উৎসাহী ততটা চরিত্র বিশ্লেষণে আগ্রহী নন।

৪

তারকনাথের স্বর্ণলতার কাহিনী খুব দীর্ঘ নয়, জটিল ত নয়ই। বাংলা দেশের পরিচিত ভ্রাতৃকলহ তাঁর কাহিনীর উপজীব্য। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখন কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে পাব দুটি স্পষ্ট বিভাগ। প্রথম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে শশিভূষণ ও বিধুভূষণের গৃহকলহ, ফলে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন এবং ভাগ্যান্বেষণে কনিষ্ঠের বিদেশ যাত্রা। বিদেশে বিধুভূষণের অর্থোপার্জন এবং শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদার চক্রান্তে বিধুভূষণের প্রেরিত অর্থ গদাধর কর্তৃক আত্মসাৎ ও অসহায় সরলার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের করুণ আলেখ্য। পরিশেষে বিধুভূষণের গ্রামে আগমন, সরলার মৃত্যু এবং গদাধরের জেল। দ্বিতীয় ভাগে আছে বিধুভূষণের পুত্র গোপাল-স্বর্ণলতা-হেমচন্দ্র প্রসঙ্গ এবং শশাঙ্কশেখরের খলতার কাহিনী। নানা দারিদ্র্য বরণ করে শ্যামার সাহায্যে গোপালের কলকাতায় জীবনযাপন, পরে হেমচন্দ্রের আশ্রয় লাভ। সেই সূত্রে স্বর্ণলতার সঙ্গে গোপালের পরিচয় ও সেই পরিচয়ে মদনের শরপতন। কিন্তু দৈব প্রতিকূল হওয়ায় স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরের গৃহে বন্দী ও পরে পলায়ন এবং স্বর্ণলতা ও গোপালের মিলন কাহিনী দিয়ে সমাপ্তি। পাপের পরিণাম ঘটল শশিভূষণ, প্রমদা ও প্রমদার মাতার ক্ষেত্রে। এরা সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিধুভূষণের আশ্রয়ে এল।

উপন্যাসটির প্রথম অংশই তৎকালীন পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। কেননা বইটি যখন নাট্যাকারে (১৮৮৮) মঞ্চস্থ হয় তখন তার নামকরণ হয় সরলা। মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকটি দর্শক সাধারণের মনপ্রাণ লুট করে নেয়। সেকালের ভাষায়, 'ধর্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম এখন কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল। যে অভিনয় দর্শনে আত্মহারা হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও মন তন্ময়ত্বভাবে বিভোর হয়, যাহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ক্রোধ, বীভৎস প্রভৃতি রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই ত অভিনয়, সেই ত নাট্যচিত্র।' নাটকটির এই সাফল্যের মূলে কেবল তারকনাথের কৃতিত্বকে

বড়ো করে দেখা চলে না। কেননা অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শক পরিচালকের সহায়তা এবং যিনি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন সেই অমৃতলাল বসুর নৈপুণ্য নিশ্চয়ই সাফল্যের মূলে ছিল। এবং তখনকার রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকালে দেখতে পাব প্রায় সব রঙ্গমঞ্চেই অভিনীত হচ্ছে ঐতিহাসিক-রোম্যান্টিক-পৌরাণিক কিংবা স্বদেশ-উদ্দীপনমূলক নাটক। এর মধ্যে তারকনাথের উপন্যাসের নাট্যরূপ বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে এবং বাঙালী একান্ত পরিচিত জগতের সাক্ষাৎ পেয়ে উল্লসিত হয়েছিল অবশ্যই। সর্বোপরি তারকনাথের রচনাগুণ তো ছিলই।

৫

তারকনাথ স্বর্ণলতা উপন্যাসে যে বাস্তবরস নিষ্কাশন করেছেন সে বাস্তবতা আমরা একালে যা বুঝি ঠিক তা নয়। এ কালের বাস্তবতা হচ্ছে নরনারীর আঁতের কথা বার করে দেখানো। তারকনাথ ততদূর গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন নি। তাঁর জীবনী ও ডায়েরী থেকে যে সংবাদগুলি পাওয়া যায় তাতে জানতে পারি তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তবে দৃষ্ট। এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি বঙ্কিমরচনাশৈলীর কথা। বঙ্কিমচন্দ্রও হয়ত বাস্তবে অনেক কিছু দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন। যেমন মতিবিবি, কাপালিক, বারুণী পুষ্করিণী, কালাদিঘী এবং বিভিন্ন ডাকাতির কথা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ সমস্ত উপাদানকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন তারকনাথ সেভাবে কাজে লাগান নি। তারকনাথ যেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি বাস্তব থেকে এক পা দূরে যাবেন না। ফর্স্টার (E. M. Forster) যে বলেছিলেন উপন্যাসের নরনারী হচ্ছে প্রত্যক্ষদৃষ্ট নরনারীর বিশ্লেষণই নয় তার সঙ্গে লেখক যোগবিয়োগ করেন যাতে তাঁরই অধিকার। তারকনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে অধিকারকে ব্যবহার করেন নি। প্রমদা, শশাঙ্কশেখর, গদাধর, নীলকমল, শশিভূষণ সকলেই তারকনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। তিনি চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু যোগও করেন নি, বিয়োগও করেন নি। যেখানে পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় দেখানো কর্তব্যবোধ করেছেন সেখানে চরিত্রগুলির উপর আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগই বেশী। এই সব ক্ষেত্রে তারকনাথ শিল্পীর আসন পরিত্যাগ করে নীতিবেত্তার আসন গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামে থাকাকালীন অথবা

তিনি যখন কর্মসূত্রে নানা স্থান পরিভ্রমণ করেছেন সেই সময়ে যে সকল মানুষের আচার আচরণ তাঁর মনে রেখাপাত করে তাদেরই অদলবদল (যৎসামান্য) করে তারকনাথ তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সেইজন্যে তাঁর উপন্যাসে ফটোগ্রাফিক সৌন্দর্য আছে। কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যের অনুরূপও বটে আবার লেখকের কল্পনাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। তারকনাথের সৃষ্ট চরিত্রে লেখকের সহানুভূতি আছে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তবতা আছে—নেই ঔপন্যাসিকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

এখন, উপন্যাসে এই জাতীয় চরিত্রকে এক কথায় লেখকের অক্ষম সৃষ্টি বলা চলে কিনা তা ভেবে দেখবার যোগ্য। অনেক বড় বড় ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি কিন্তু এই পর্যায়ের হয়ে থাকে। এই জাতীয় চরিত্রকে সমালোচকরা Flat characters বলেছেন। বাংলায় বলতে পারি একরঙা চরিত্র। এই চরিত্রগুলি আলোচনা করলে দেখি গোটা মানুষটাকে পাওয়া যায় না। ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলিকে সমগ্ররূপে দেখতে চান নি কিংবা একটা কোনো বস্তুর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে চান বলে চরিত্রগুলির একটি বিশেষত্বের দিকেই তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইংরেজি সাহিত্যে ডিকেন্সের প্রায় চরিত্রগুলি যে একরঙা সে সম্বন্ধে সমালোচকরা একমত হয়েছেন। এই শ্রেণীর চরিত্রের সাক্ষাৎ Ben Jonson-এর নাটকেও খুবই পাওয়া যায়। Jonson-এর নাটক আলোচনা করে বলা হয়েছে, He seizes character under one aspect, because he sees it so; neglecting, because he does not see them, the cross-play of impulses, the inconsistencies and conflicts, mingled with strength and weakness, of which they are normally composed. His observation was prodigiously active and acute, but its energy was spent in accumulating observations of single dominant trait, not in distinguishing fine shades. The nuances fell together for him, and the vast complexes of detail which his voracious eye collected, and his unsurpassed memory retained, grouped themselves round a few nuclei of ludicrous character…his personages are real men seen from a particular angle not moral qualities translated into their human

embodiments. কিন্তু একরঙা চরিত্র অঙ্কন করতেও যে শক্তির প্রয়োজন ডিকেন্সের পাত্রপাত্রীদের আলোচনা করলেই তা বুঝতে পারা যায়। তারকনাথের প্রায় সব চরিত্রগুলিই Flat. তিনি যে সমস্ত পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেছেন তাদের আবির্ভাবের পরই পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয় না যে এরা এক একজন এক একটি বিশিষ্ট গুণ অথবা দোষের প্রতিনিধি। প্রমদা, প্রমদার মাতা, গদাধর ইত্যাদি একরঙা চরিত্র। লেখক এদের জীবনের একটি বিশেষ দিকের উপরই তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। প্রমদার আচরণে পূর্বাপর কোনো বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। গোড়া থেকে তাকে যেভাবে ঈর্ষাকাতর, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর দেখানো হয়েছে তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নি। একবার প্রমদার সামনে কঠিন পরীক্ষা এসেছিল। যখন শশিভূষণ জেলে যাবার মুখে তখনও প্রমদা অর্থপ্রদান করতে চায় নি। সে যে-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে অর্থপ্রদানে বিরত হয় তার মধ্যে স্বার্থপরতার ভয়াবহ রূপ দেখে আমরা চমকিত হই বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রটি কি রকম রক্তহীন মনে হয়। ছোট গল্পে যা মানাত উপন্যাসে তা মানায় না। এই রকম অন্তর্দ্বন্দ্ববর্জিত চরিত্র প্রমদার মা দিগম্বরীও। গদাধরচন্দ্রকে নিতান্ত সরল চরিত্র ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সে গোড়াগুড়ি অন্যচালিত। কখনও মাতার পক্ষপুটে, কখনও দিদির আশ্রয়ে, কখনও রমেশের প্রতি বশ্যতায় সে একটার পর একটা নির্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দিয়েছে। অনেকে গদাধরকে খল চরিত্র বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দেখব এ চরিত্রটির নিজস্বতা কিছু নেই। সে তল্পিবাহক মাত্র। এমন কি সে যে অর্থ আত্মসাৎ করেছে তার অংশও বিশেষ কিছু পায় নি। খলের খলতারও একটা কারণ অথবা উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। গদাধরের চরিত্রে খলতার কোনো কার্যকারণ সূত্র নেই। তারকনাথ তাকে হাস্যরসের জোগান দেবার জন্যেই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। বিধুভূষণের জীবনসংগ্রামের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাও একরঙা। কোনো বৈচিত্র্য তারকনাথ দেখাতে পারেন নি। কিন্তু সংগ্রামের বর্ণনার মধ্যে মর্মস্পর্শিতা আছে। ব্যাখ্যা ও টীকা টিপ্পনী অংশে দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাসের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই জাতীয় উপন্যাসে এক ভাই সরল, উদার, নিস্পৃহ রূপে উপস্থিত হয়, অন্য ভাই সাধারণত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, চালাক রূপে প্রকাশিত হয়। সাধারণত বাঙালীর যৌথ পরিবারে বাপ, মা, ভাই,

বোন আত্মীয়স্বজন নিয়ে যে স্নেহসুনিবিড় নীড় গড়ে ওঠে তার মধ্যে স্থায়িত্ব থাকত। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপে এ ব্যবস্থা ভেঙে যায়। তারকনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। একথা ঠিক তারকনাথ শশিভূষণ-বিধুভূষণের সংসারের ভাঙনের যে চিত্র উপস্থিত করেছেন তাতে গভীরতর জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় নেই। অর্থনৈতিক চাপ যখন কঠিন হয়ে দেখা দেয় তখনই পরিবর্তন আসে। স্বর্ণলতা উপন্যাসে সে গুরুতর চাপের বর্ণনা নেই। তবে তারকনাথ শশিভূষণ-বিধুভূষণের সংসারের বিপর্যয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও অবিশ্বাস্য নয় বরং প্রচলিত নিয়মে এভাবেও ভাঙন আসে। একান্নবর্তী যৌথপরিবারের পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে অন্য পরিবার থেকে যে বধূ বিবাহিত হয়ে আসে তার স্থান নির্দিষ্ট হয় কতকটা সেই পরিবারের সহানুভূতি ও মমতার উপর, কতকটা নির্ভর করে নববধূর উদারতার উপর। প্রমদা ও সরলা এই দুই জায়ের মধ্যে নৈকট্য থাকত যদি শশিভূষণ ও বিধুভূষণ আয়ের দিক দিয়ে সমান হত। কিন্তু একদিকে শশিভূষণের অর্থপ্রাপ্তি এবং বিধুভূষণের অর্থের অভাব প্রমদা ও সরলার জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রমদা স্বাচ্ছন্দ্য চায়, সুখ চায়। সে নিজের জগতে সম্রাজ্ঞী হতে চায়। কিন্তু অন্তরায় সরলা-গোপাল-বিধুভূষণ। প্রমদা পৃথক হবার জন্য ব্যাকুল হল। অবশ্য পশ্চাতে প্রমদার মাতারও খানিকটা পরামর্শ ছিল। সুতরাং তারকনাথ নারীর দুই আদর্শ স্থাপন করেছেন। এক জন কষ্টসহিষ্ণু, দারিদ্র্যপীড়িত; আর একজন অর্থগর্বিত, স্বার্থপর। বাঙালীর জীবনের এই চিরপরিচিত ছবি স্বর্ণলতা উপন্যাসে দীপ্যমান। চরিত্রগুলি Flat তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথাও সত্যের ব্যত্যয় নেই। এখানেই তারকনাথের জীবননিষ্ঠার পরিচয়। বিধুভূষণের প্রথম জীবনের খামখেয়ালিপনা সরলার দারিদ্র্যের মধ্যে আরও অশান্তি নিয়ে আসে। বিধুভূষণের উদ্যমের অভাব এবং পারিবারিক বিপর্যয়ের প্রতি অমনস্কতা সরলার জীবনে নিদারুণ হয়ে ওঠে। পরে বিধুভূষণ যখন কৃষ্ণনগর ছেড়ে অর্থসংগ্রহের আশায় কলকাতায় এসে উপস্থিত হয় তখনও সরলা নীরবে দারিদ্র্যকে বরণ করে নেয়। বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের মধ্যে যে কারুণ্যের চিত্র প্রচ্ছন্ন আছে তারকনাথ সরলাকে তারই প্রতিনিধি করে এঁকেছেন। বাঙালীর সাহিত্যে যে কারুণ্যের প্রবাহ তার আদি যুগ থেকে চলে আসছে তারকনাথও তার মধ্যে জীবনের

সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। আমাদের আদর্শবাদই জয়ী হয়েছে সরলাচিত্রের মধ্য দিয়ে। বোধ করি এই জন্যেই উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডের এত জনপ্রিয়তা।

আর একটি করুণ-মধুর চিত্র তারকনাথ অঙ্কন করেছেন নীলকমল চরিত্রটি রূপায়নের সাহায্যে। পথে নীলকমলকে বিধুভূষণ সাক্ষাৎ পেয়েছিল আবার পথেই সে মিলিয়ে যায়। উপন্যাসের সঙ্গে এই চরিত্রটির যোগ প্রায় নেই। হয়ত লেখকের কোনো প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতা এ চরিত্রটি রূপায়ণে সাহায্য করে থাকবে। কিন্তু নীলকমল তার বিশ্বাস, তার সঙ্গীতপ্রিয়তা এবং আত্মম্ভরিতা নিয়ে চিরকাল বাঙালী পাঠককে মুগ্ধ করবে। স্বর্ণলতা উপন্যাসে অভাব, অভিযোগ, চুরি রাহাজানি এমন কি নৃশংসতার মধ্যে নীলকমল চরিত্রটি অম্লান, বিশুদ্ধ এবং স্নিগ্ধ। অকালবোধনের সময়ে নীলপদ্মের দুর্লভতা যে কতখানি ছিল তা বিভীষণের উক্তি থেকে জানতে পারি। বাংলা উপন্যাসেও নীলকমলের মত চরিত্র দুর্লভ এবং বিরলদৃষ্ট। তারকনাথ বলেছেন, 'নীলকমল পদ্ম-আঁখির গানটা বড়ই ভালবাসিত এবং এতই গাইত যে, যদি গানটি কোন জড়পদার্থ হইত তবে পাষাণের মত কঠিন হইলেও ক্ষয় হইয়া যাইত।' লেখক কি সেই কারণেই চরিত্রটির নামকরণ করেছেন নীলকমল?

৬

গদ্যরীতি যখন আকারপ্রাপ্ত হয় তখনই উপন্যাসের জন্ম সম্ভব। গদ্য বহুচিন্তাবহনক্ষম হলেই উপন্যাসের নায়ক নায়িকার জটিল মননকে অনায়াসে তার মধ্যে সঞ্চার করা যায়। অর্থাৎ উপন্যাস গদ্যের পরিণত রূপের অপেক্ষা রাখে। উপন্যাসের সঙ্গে রোমান্সের পার্থক্যের একটা সূত্র হল গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান। রোমান্সে সাধারণত যে-গদ্য ব্যবহৃত হয় তাও পরিণত গদ্য বটে কিন্তু তা কাব্যধর্মী। তারকনাথ যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন বাংলা গদ্য একটা পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্য তখন সৃষ্টির যুগে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ অবশ্য তখনও বার হয় নি। কিন্তু কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের যে অনন্যসাধারণ রূপ পরিস্ফুট করেছেন তা তুলনারহিত। তারকনাথের প্রতিভা তার থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। কিন্তু মনে হয় তারকনাথও উপন্যাসের একটা ভাষারীতি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারকনাথ মনে প্রাণে রোমান্সকে বর্জন করতে চেয়েছেন। সুতরাং তিনি উপন্যাসে কাব্যধর্মী পরিবেশের সৃষ্টি করেন নি। এমন কি স্বর্ণলতা-গোপালের

অপরিস্ফুট প্রেমের ক্রমবিস্তারের বর্ণনায় তারকনাথ রোমান্সের সুলভ পথ অবলম্বন করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে নারীরূপের বর্ণনায় যে আরোহ ও অবরোহ লক্ষ্য করা যায়, প্রকৃতি বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিজাত সূক্ষ্ম সংবেদনশীল গদ্য নির্মাণ করেন কিংবা নরনারীর আবেগ প্রকাশ করবার জন্য বঙ্কিম যে প্রাণাবেগসম্পন্ন অথচ আবেগমন্থর গদ্য সৃষ্টি করেন তার তুলনা নেই। তারকনাথ প্রকারান্তরে এ-রকম গদ্যভাষাকে সমর্থন করেন নি। সাহিত্যের আদর্শের দিক থেকে তারকনাথের রচনা সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি যে সুফল ফলিয়েছে তা নয়। কিন্তু তারকনাথও আর একদিক থেকে গদ্যে বিশিষ্টতা এনেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির রূপবর্ণনায় গদ্যকে সর্বদাই সমতল-ভূমিতে বিচরণ করিয়েছেন। তিনি যে দারিদ্র্যের চিত্র এঁকেছেন সেখানেও বাষ্পাকুল গদ্যরীতি নেই। কয়েকটি মাত্র ছত্রে দারিদ্র্যের নির্মম রূপ ধরেছেন। পৃথক হবার পর বিধুভূষণের জীবনে বিপর্যয় দেখা দিল। সে কলকাতার পথ ধরল। তারকনাথ তার পরের বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে, 'দূর হইতে পথিকের বয়স চল্লিশ বৎসরের ন্যূন বোধ হইতেছে না, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলে তদপেক্ষা অন্তত দশ বার বৎসর কম নিশ্চয় বিবেচনা হইত। মস্তকে দুটি একটি পক্ক কেশ দেখা যাইত, কিন্তু তাহা বয়োবৃদ্ধিহেতু নহে। মুখশ্রী ম্লান ও চিন্তাকুল। দেখিবামাত্রই জানিতে পারা যাইত, চিন্তায় পথিককে যৌবনেই বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথিকের এক জোড়া পাঁচ সাত জায়গায় তালি দেওয়া জুতা। তাহাও ধূলায় আবৃত। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ধূলি। পরিধানে একখানি অর্ধমলিন থানের ধুতি, গায়ে একখানা তালি দেওয়া জামা। জামাটি পূর্বে পশমী কাপড়ের ছিল; কিন্তু কালে দুর্দশাবশতঃ লোমহীন হইয়াছে।' এই রকম নিরলঙ্কার রচনারই পক্ষপাতী ছিলেন তারকনাথ। তারকনাথ যে-সকল মানুষের চিত্রচরিত্র বর্ণনা করেছেন তাদের জীবনেই যখন ঐশ্বর্যের স্থান নেই তখন অযথা ভাষায় অলঙ্কার প্রয়োগ করে তিনি সৌখীন মজদুরি করতে চান নি। গদ্যভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে-বস্তুটি প্রধান তা হল সারল্য। সরলতা—যা বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে তোলে তা তারকনাথের ভাষার অন্যতম লক্ষণ। তারকনাথের উপন্যাস বক্তব্যপ্রধান। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদেই তিনি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। নীতিকথন এই উপন্যাসে আছে। সুতরাং পাঠকের মনকে কল্পনারাজ্যে বিচরণ করতে তারকনাথ দেন নি। গদ্যরীতিতে তারকনাথের অন্যতম কৃতিত্ব হল তিনি

সংলাপের ভাষাতে কথ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিপূর্বে নাটকে কথ্য-রীতির দেখা মিললেও এবং হুতোমী ভাষায় কথ্যরীতির সাক্ষাৎ পেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার ব্যবহার দেখতে পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র সংলাপে যে কথ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তা মিশ্রধরণের। সংলাপে একই ছত্রে তিনি কথ্য ও সাধুরীতিকে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু তারকনাথ প্রায় আগাগোড়া সংলাপের ভাষায় কথ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। আগেই বলেছি তারকনাথ বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক ছিলেন। ভাষা ব্যবহারেও তিনি সেই বাস্তবতার নিদর্শন রেখে গেছেন। গদাধরের সংলাপে, নীলকমলের আত্মপ্রশংসায়, সরলার রুদ্ধ বেদনা প্রকাশে কিংবা স্বর্ণ-গোপালের প্রেমচিত্রে তারকনাথ ভাবাতিরেকপ্রবণতাকে স্পর্শমাত্র করেন নি। এখানেই তারকনাথ গদ্যরীতিতে বাংলা সাহিত্যে একটি অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বিশ্লেষণ ও বিচার
শ্রীপবিত্র সরকার

তারকনাথের জীবন

সম্পাদকীয় ভূমিকাতে [৭ পৃষ্ঠা] তারকনাথের জীবনীর সাধারণ তথ্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। 'স্বর্ণলতা'র আলোচনায় তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবনই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। শৈশবে তারকনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল এবং তখন থেকে তাঁর জ্যাঠাই মা তাঁকে আপন স্নেহলালনের মধ্যে রেখে বড়ো করে তোলেন। এ থেকে মাতৃব্যতিরিক্ত অন্য নারীর স্নেহ সম্পর্কে তারকনাথের সশ্রদ্ধ মনোভাব জন্মেছিল—এমন অনুমান করা হয়েছে। সেইজন্যই শ্যামা ও গোপালের স্নেহবৎসলতার বন্ধনটিকে হয় তো তিনি এমন করুণমধুর করে তুলে ধরতে পেরেছেন। কিন্তু মাতৃতুল্যা অন্য নারীর স্নেহ পেতে হলে মাতৃহীন হওয়ার প্রয়োজন হয় না—এ বাংলাদেশের একটি বহুদৃষ্ট সামাজিক অভিজ্ঞতা। প্রায়ই এমন দেখা গেছে যে মা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও শিশু আত্মীয়া বা অনাত্মীয়া কোন নারীর অকৃপণ মমতা লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে স্নেহের এই তির্যক গতির ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে যার সস্নেহ বৎসলতায় শিশুটি আশ্রয় পাবে তার নিঃসন্তান বা মৃতবৎসা হওয়া যতটা প্রয়োজনীয়, শিশুটির মাতৃহীন হওয়া ততটা প্রয়োজনীয় নয়। মাতৃহীনতা অবশ্য সহজেই স্নেহ বা হৃদয়াতিথ্য কেড়ে নিতে পারে, যেমন মাতৃহীনতার সূত্রেই স্বর্ণ ও গোপাল পরস্পরের সহমর্মী হয়েছে, কিন্তু মাতৃহীনতার জন্য স্নেহ-আকর্ষণের চেয়ে সন্তানহীনতার জন্য স্নেহ-বিকিরণের ঘটনা হয় তো বাংলা গল্প-উপন্যাসে বেশি। তাই লেখকের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে তাঁর রচনাকে জড়িত করার চেষ্টা একটু বিপজ্জনক।

তারকনাথের বিবাহ হয় তাঁর চোদ্দ বৎসরের সময়। তাঁর স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী ছিলেন ২৪ পরগনা জেলার ঢোঁড়া গ্রাম নিবাসী দরিদ্র পুরোহিত রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর কন্যা। নিস্তারিণী দেবী সুন্দরী ছিলেন না, তারকনাথ তাঁকে নিয়ে সুখী হতে পারে নি বলে কেউ উল্লেখ করেছেন।[১] বেশির ভাগ সময়ই স্ত্রীকে তিনি স্বগ্রামে রাখতেন, কর্মস্থলে তাঁকে নিয়ে যাবার উৎসাহ দেখান নি। একদিকে স্ত্রীর কুরূপতার জন্য প্রার্থিত গৃহসুখের অভাব, অন্যদিকে সেই স্থির গৃহসুখের প্রবল ও দুরপনেয় বাধা তাঁর

১. ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা', ১৩১৪ সাল, ৫৭ পৃষ্ঠা।

ভ্রাম্যমাণ কর্মজীবন। এই কর্মজীবনের যে ছকটি সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধার করেছিলেন তা তুলে দিলেই তারকনাথের জীবিকার স্বরূপটি বোঝা যাবে ঃ—

স্থান	পদ	নিয়োগকাল
কলিকাতা	ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব সিবিল হসপিটালের নিয়ন্ত্রণ অতিরিক্ত (Supernumerary) অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন (৩য় শ্রেণী)	৬ই জুলাই ১৮৬৯
দার্জিলিং	দার্জিলিং কেন্দ্রের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ভ্যাক্‌সিনেশন (অস্থায়ী)	১৯শে জুলাই ১৮৭১
ঐ	ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ভ্যাক্‌সিনেশন	৩০শে অক্টোবর ১৮৭২
জলপাইগুড়ি	অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন (৩য় শ্রেণী) ডিস্‌পেন্সারি	১৪ই আগস্ট ১৮৭৭
যশোহর	ঐ (৩য় শ্রেণী) দাতব্য ঔষধালয়	২৮শে মে ১৮৭৮
ঐ	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৩ই নভেম্বর ১৮৭৯
শাহাবাদ	ঐ ঐ	
	বক্‌সার সেণ্ট্রাল জেলের চিকিৎসক	১৪ই জানুয়ারী ১৮৮২
বক্‌সার	অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন (১ম শ্রেণী) বক্‌সার সেণ্ট্রাল জেলের চিকিৎসক	১৬ই মে ১৮৮৭

তা ছাড়া, তাঁর কাজটিও ছিল এমন যে, প্রায়ই ইতস্তত সঞ্চরমাণ না হয়ে তারকনাথের উপায় ছিল না। বস্তুতঃ, সরকারী কাজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পর্যটনের মধ্যেই তারকনাথ 'স্বর্ণলতা' রচনা করেন। এসব তথ্য থেকে বোধগম্য হয় যে নিরবচ্ছিন্ন ও স্থায়ী গৃহসুখ তারকনাথের ভাগ্যে জোটে নি। তাই সরলার মতো একটি চরিত্রকে তারকনাথ হৃদয়ের সমস্ত মমতা দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন। সরলা-বিধুভূষণের ক্ষণিক ও ব্যাহত

সংসারসুখ তারকনাথের চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষার ধন, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর পরম কামনা। যে গৃহে সরলার অধিষ্ঠান, সেই পরমরমণীয় গৃহ চিরদিন তাঁর নাগালের বাইরে রয়ে গেল, তাই বাসনা, সৌন্দর্য ও দীর্ঘশ্বাসে মণ্ডিত করে ঐ কল্পনার গৃহপরিবেশটিকে সাজিয়ে দিলেন। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের সরলা-আখ্যানটুকুতে তারকনাথের যে-চরিতার্থতা ঘটেছে, বাকী অংশে, নীলকমল ও শ্যামার চরিত্র দুটি ছাড়া তাঁর সে-চরিতার্থতা ঘটেনি—এ বিষয় সহজে চোখ এড়াবার মতো নয়।

সম্পাদকীয়তে বিস্তৃতভাবেই তারকনাথের মানসিক প্রবণতা ও সাহিত্যাদর্শের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা তারকনাথ প্রথম বিভাগে পাশ করলেন, পরের বৎসর মেডিক্যাল কলেজের ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উক্তিটি থেকেই তারকনাথের মনোভঙ্গির স্বরূপ বোঝা যাবে। ডিকেন্স তিনি অনুরাগ সহকারে পড়তেন, এবং এ তথ্যটি তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার বিচারে বিশেষভাবে স্মরণীয় [সম্পাদকীয় ৭, ৮ ও ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। তাঁর সাহিত্যগুরু ডিকেন্স, স্যার ওয়াল্টার স্কট নন,—এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মৌলিক প্রভেদ। মূলতঃ স্কটের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং শেক্‌সপীয়রের ট্রাজিক বেদনায় দীক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সুখদুঃখের গভীর তলদেশে অবগাহন করেছেন, অতীতের রহস্যময় রাজ্যে অভিযাত্রায় বেরিয়েছেন। অন্যদিকে তারকনাথ কাছের মানুষের, চোখের আলোয় চোখের বাইরে দেখা মানুষের জীবনের সুখদুঃখগুলির সমাহার করেছেন, চিরাগত মানুষের সুচিরকালীন আনন্দ, যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা বা অচারতার্থতার খবর দেন নি। যা সুদূর, যা গভীর, যা রহস্যময়, এবং যা চিরন্তন ও সর্বজনীন—এই হল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পসরা, অন্যদিকে যা নিকট, যা সুপ্রাপ্য, যা সহজ অথচ যা হৃদয়সংবেদ্য—এ পসরা তারকনাথের। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট কল্পনা-পরিধি তারকনাথের ছিল না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে অসম্পূর্ণ—বাঙালী জীবনের সহজ সুখদুঃখের পরিবেষণে—সেখানে তারকনাথের অধিকার। দুয়ের তুলনার প্রশ্ন ওঠে না, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তারকনাথ নিষ্প্রভ জ্যোতিষ্ক হয় তো, কিন্তু তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের পরিপূরক। এখানেই ডিকেন্সের সাহিত্য-দীক্ষা তারকনাথে অসামান্য সার্থকতা লাভ করেছে। বঙ্কিমযুগের ইতিহাস-রোমান্সের প্রাবল্যে যদি তারকনাথ 'স্বর্ণলতা' না রচনা করতেন, বা অন্য এক

ইতিহাসপথিক রমেশচন্দ্র দত্ত পরিশ্রান্ত হয়ে 'সমাজ' ও 'সংসার'-এ বিরাম না খুঁজতেন, তা হলে ঐ সময়কার বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের একটি অভাববোধ থেকেই যেত। তারকনাথ বঙ্কিমযুগের উপন্যাসকে একমুখিতার অপবাদ থেকে রক্ষা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ মানদণ্ডে তারকনাথকে স্বল্পজীবী বলা যায়। জন্ম ১৮৪৩-এ, মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২-এ সেপ্টেম্বর। ৪৮ বৎসরের জীবন। শিক্ষা ও কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। তারকনাথ মানুষটি,—তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায়—ছিলেন প্রসন্ন, বিনয়ী, মিষ্টভাষী। তাঁর রহস্যপ্রিয়তার সংবাদ তো স্বর্ণলতার ছত্রে ছত্রে। ঔপন্যাসিক প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বসম্পাদিত 'দাসী' পত্রিকায় তারকনাথ সম্বন্ধে যে-আলোচনা করেছিলেন, তাতে তাঁর একটি উদার মানবিক দিকের উল্লেখ করেছেন—"তিনি বড় বড় গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী অপেক্ষা সামান্য বেতনভোগী কেরানী প্রভৃতির প্রতি সমধিক অনুরক্ত থাকিতেন।" এ কথা যে কত বড় সত্য তা 'স্বর্ণলতা'র চরিত্রগুলির তুলনা করলেই স্পষ্ট হবে। অন্ততঃ এই উপন্যাসে বিত্তবান বা উচ্চপদস্থের চেয়ে দরিদ্র, ছন্নছাড়া এবং অসহায়ের দলই তারকনাথের স্নেহদাক্ষিণ্য পেয়েছে বেশি।

বক্সারেই তাঁর শেষজীবন কেটেছিল। এখানে অতি স্বল্পকালের জন্য তিনি সংক্ষিপ্ত গৃহসুখ লাভ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীপুত্র এই সময় তাঁর সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু নিস্তারিণী দেবী অল্পদিনের মধ্যে পরলোকগমন করলেন। এই শোকের পরেই তারকনাথকে পিতৃবিয়োগের আঘাত পেতে হল। উপর্যুপরি দুই শোকে তারকনাথের মনোবল ভেঙে পড়ল, তিনি সুরার আশ্রয় নিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিক পক্ষাঘাত রোগে তাঁর মৃত্যু হল।

সাহিত্যজীবন

সদাব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যে অবসর রচনা করে তারকনাথ সাহিত্য সৃষ্টি করতেন। তাঁর জীবনীতে তাঁর ডাক্তার হাওয়ার পিছনে পিতার ইচ্ছা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারকনাথের ব্যক্তিগত প্রবণতা স্পষ্টতঃই ছিল সাহিত্যের প্রতি, একথা তাঁর হিন্দু হোস্টেলের সহ-আবাসিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিবৃতি এবং তাতে উল্লিখিত রাসবিহারী ঘোষের

বিদ্রূপোক্তি থেকে[১] সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর অধ্যয়নের মানচিত্রটিও এঁদের কথা থেকেই পাওয়া গেছে। দেশীয় লেখকদের মধ্যে তাঁর প্রিয় ছিলেন ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। হিন্দু হোস্টেল ছাত্রাবাসের খোলা ছাদে রবিবার বিকালে তারকনাথ এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের যে বৈঠক বসত একদিন তারকনাথ স্পষ্টতঃই এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন যে, তিনি এমন উপন্যাস লিখবেন একদিন, যাতে 'দুর্গেশনন্দিনীর' মতো অবাস্তব ও কল্পনামূলক প্রণয়লীলা বা লোকজীবনব্যবহিত ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীর অপরিচিত বাসনা ও প্রয়াসের কথা কিছুই থাকবে না, থাকবে বাঙালী সংসারের ঘনিষ্ঠ জীবন-চিত্র। ঘটনাটি, বলা বাহুল্য, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের [১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ] অব্যবহিত পরবর্তী। আট বৎসর পরে এই বাসনা কায়ালাভ করেছিল 'স্বর্ণলতা' রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর এই অভিলাষের সাক্ষী ছিলেন যে দুই ব্যক্তি, তাঁদের কথা আগেই উল্লেখ করা হল—ল কলেজের দুই ছাত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং রাসবিহারী ঘোষ। লৌকিক জীবনের স্বভাব-চিত্র, 'দেশের লোকের প্রকৃত চরিত্র বা দেশের সম্যক পরিচয়'—এই ছিল তাঁর অন্বেষণের বস্তু। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই 'স্বর্ণতার' রচনা সম্পূর্ণ হয়। বলা দরকার, 'স্বর্ণলতা' রচনার আরো একটি পটভূমিকা ছিল। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের স্বাভাবিক সংসারযাত্রার বিবরণের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখককে ৫০ পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন বলে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। তারকনাথ এই প্রতিযোগিতায় যোগদানে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু সুহৃদ্ রেভারেণ্ড লালাবিহারী দে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। লালবিহারী নিজেই ঐ পুরস্কারের প্রত্যাশী হয়ে তাঁর Bengal Peasant Life বা Govinda Samanta উপন্যাসটি রচনায় অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন, তাই তারকনাথ আর বন্ধুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন না, বরং বছর-খানেকের মধ্যে স্বাধীনভাবে 'স্বর্ণলতা' রচনায় ব্যাপৃত হলেন।

'স্বর্ণলতা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ এপ্রিল তারিখে। কিন্তু তার আগেই রাজসাহী জেলার বোয়ালিয়া থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীকৃষ্ণ দাস-সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার প্রথম বৎসরে এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় [আশ্বিন ১২৭৯—ভাদ্র ১২৮০, ইং ১৮৭২-

---

১. সুরেশচন্দ্র নন্দী : 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়'—'সাহিত্য', শ্রাবণ ১৩২৯।

৮৩]। 'স্বর্ণলতার' প্রকাশ 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রটিকে দ্রুত জনসংবর্ধনা এনে দেয়। এ সাময়িক-পত্রের জন্য তারকনাথ গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদিও লিখেছিলেন।

'স্বর্ণলতার পর তারকনাথের প্রকাশিত রচনা **'ললিত সৌদামিনী'** (গল্প)। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ—মাঘ সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'-এ প্রথম এটি প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ ১৬ই এপ্রিল, ১৮৮২। তাঁর **'হরিষে বিষাদ'** অথবা 'নায়ক-নায়িকাশূন্য উপন্যাস' প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালে [২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭]। **'তিনটি গল্প'**—'ললিত সৌদামিনী', 'সুখ ও দুঃখ' এবং 'নিধিরাম' ১২৯৫ সালে [২৭ অক্টোবর ১৮৮৯] প্রকাশিত। সামাজিক উপন্যাস **'অদৃষ্ট'**-এর প্রকাশকাল ১২৯৯ সাল [২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯২]। তারকনাথের সর্বশেষ রচনা **'বিধিলিপি'** নামে অসমাপ্ত উপন্যাসটি। প্রমদাচরণ সেন প্রবর্তিত 'সখা' পত্রে মার্চ ১৮৯১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৮৯১-এর মধ্যে এটির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

উপন্যাস-গল্প ছাড়া তারকনাথ প্রবন্ধ বা কবিতাও রচনা করতেন। তাঁর প্রবন্ধ 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ মুদ্রিত হয়েছে। 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এই তিনি Cowper-এর 'The Solitude of Alexander Selkirk' কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন। 'Friend of India'-তে ও অন্যান্য ইংরেজী পত্রিকায় তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধও মুদ্রিত হত। তা ছাড়া তারকনাথ কয়েক বৎসর 'কল্পলতা' নামে একটি মাসিক-পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। 'কল্পলতা' ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এ পত্রিকাতেই তারকনাথের 'হরিষে বিষাদ' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। 'কল্পলতার' সম্পাদনার সময় তিনি যশোহরে ছিলেন। কিন্তু সম্পাদক বা মনস্বী হিসাবে তারকনাথ স্মরণীয় নন, স্মরণীয় কথক হিসাবে, মূলতঃ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে। ঘটনা ও চরিত্রের আধারে মানবজীবনকে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর সাধনা, এবং সেই সাধনার সর্বোত্তম সিদ্ধি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্বর্ণলতা য়। তাঁর অন্য গল্প-উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'য় স্বর্ণমান স্পর্শ করতে পারে নি, যদিও 'স্বর্ণলতা'র যেটুকু বিফলতা—উপন্যাসের শেষদিকে ঘটনার ঘনঘটা ও আকস্মিকের উৎপাত—তা পরবর্তী রচনাগুলিকে আক্রমণ করেছে। যেমন তাঁর উপন্যাস 'হরিষে বিষাদ'-এ পুলিস, আদালত, জেলখানা, মিথ্যা খুনের অভিযোগ, পচা লাস, গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষ, ফাঁসী, দ্বীপান্তর—সমস্তই আছে। তারকনাথ শরৎচন্দ্র বা দীনবন্ধু মিত্রের মতোই অভিজ্ঞতা-সম্বল লেখক, কিন্তু প্রায়ই তিনি তাঁর

অভিজ্ঞতাকে গল্প-জমানোর পক্ষে যথেষ্ট রোমাঞ্চকর বলে মনে করতেন না—এই ছিল তাঁর দুর্বলতা।

তারকনাথের সাহিত্যাদর্শ

তারকনাথ নিজের একটি স্পষ্ট সাহিত্যাদর্শ নিয়ে খুব তত্ত্বগতভাবে ভেবেছিলেন, এমন নয়। তবু হিন্দু হোস্টেলের ছাদে বসে তাঁর সেই বিখ্যাত বঙ্কিমবিরোধী সংলাপ,—যা উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সাহিত্যপ্রসঙ্গের আভাস দেয়—তাতেই তাঁর নিজের সাহিত্যাদর্শের বীজটি নিহিত আছে। এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় ভূমিকার ৯ থেকে ১১ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত সমাজে কেমন উদ্দীপনাসহকারে গৃহীত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রসঙ্গে বারবারই উচ্ছ্বসিতভাবে তার উল্লেখ করেছেন। "কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য!"[১] অন্যত্র তিনি দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙানোর সঙ্গেও উপমিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা তারকনাথকে সংক্রামিত করতে পারল না। 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁর ভালো লাগে নি—একথা বাইরে বন্ধুদের কাছে এবং 'স্বর্ণলতা'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমে অসংকোচে এবং অস্বস্তিকর স্পষ্টতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

কেন তাঁর ভালো লাগল না ঐ সর্বজনচিত্তজয়ী উপন্যাস? সত্য বলতে কি, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে ঐ উপন্যাসের তুলনা নেই—তার প্রকাশ ও শতাব্দীর অন্যতম মহত্তম ঘটনা। এ উপন্যাস বাঙালীর কল্পনাসীমাকে দেশে এবং কালে প্রসারিত করেছে। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনীর' এই যে ভূমিকা —তারই মধ্যে এ গ্রন্থের অপূর্ণতাও নিহিত আছে। এই উপন্যাস [বা সমালোচনার পরিভাষায় 'রোমান্স'] দূরকালের অপরিচিত ও রহস্যময় নরনারীর হৃদয়বাসনা-বেদনার খবর দিয়েছে, কিন্তু সমকালীন বাঙালীর গৃহপরিবৃত শান্তরসাস্পদ আঙিনাটির ছবি এতে নেই। The Race, the milieu, the moment—ফরাসী সমালোচক তেইন যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের

১ 'বঙ্কিমচন্দ্র', : 'আধুনিক সাহিত্য'।

সন্ধান করতেন সাহিত্যে, তার কোনটিই 'দুর্গেশনন্দিনী'তে প্রত্যক্ষভাবে নেই। এই অলৌকিক গ্রন্থ পড়ে কেউ যদি সমকালীন বাংলাদেশের ছবি উদ্ধার করতে চায়, নিঃসন্দেহে সে ব্যর্থ হবে। বঙ্কিমচন্দ্র চিরন্তন বাংলাদেশের আত্মিক মূর্তিটি তাঁর উপন্যাসে স্পষ্ট ধরতে পেরেছিলেন ; কিন্তু এ কথা কে না স্বীকার করবে যে, কবির ভাষায় যাকে বলি 'ধানের শীষের উপর শিশিরবিন্দু',—যা সন্নিকটে, ঈশ্বরগুপ্তের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যে-বিষয়ের কথা বার বার বলেছেন,[১] সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাঙালীর জীবন, তার সমাজ, তার গৃহ, তার পরিবারভুক্ত বিচিত্র মানুষ, তাদের আচার-আচরণ—এক কথায় বাঙালীর 'manners' বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা অবহেলা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। জগৎসিংহের বীরবাসনাকে বাঙালী সমাজের কোথায় আশ্রয় দেওয়া যায়? আয়েষার বেদনা ও মহৎ ত্যাগের যে কারণ, তার কোন্ প্রতিবিম্ব আছে বাঙালীর দিনানুদিনের জীবনযাত্রায়? বীরেন্দ্রসিংহের ট্রাজিডি কি এ সমাজের প্রাতিস্বিক ঘটনা? কিছুই নয়, সবই অধরা, সমস্তই দূরবর্তী, মানুষের রোমান্স-স্বপ্নলোকের অধিবাসী এরা। বঙ্কিমচন্দ্র যে-অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে realist বলেছেন সে-অর্থে নিজে realist তিনি নন, এবং এখানেই তারকনাথের সর্বপ্রধান অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।

কী করে, সে কালের সমস্ত বাঙালীর থেকে আলাদা করে এই অভিযোগ একা তারকনাথের মনে জাগল? পূর্বেই বলা হয়েছে, চার্লস ডিকেন্সের দীক্ষা তার একটি বড়ো কারণ। আরো কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর-বিস্তারী উপন্যাস-রোমান্স প্রবাহের অন্তরালে সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে একটি প্রচ্ছন্ন realism-এর ধারা বইছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ যে বস্তুরস এবং ঘনিষ্ঠ সমাজচিত্র পাই তা-ই Satire-এ রূপান্তরিত হয় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা-'তে কিংবা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' ইত্যাদি গ্রন্থে। রোমান্টিক অভিভবের যুগেই Satire-এর সোনার ফসল ফলে, কারণ Satire ছদ্মবেশী realism ছাড়া আর কিছুই নয়—রোমান্টিক উপদ্রবকে বিদ্রূপ করে বাস্তবের ক্যানেস্তারাবাদ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যে রোমান্স-রস শিল্পের সুনিয়মে স্বাদু হতে পেরেছিল, অন্যান্য অক্ষম রচনাকারদের

১ 'যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বৈ কি।'—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ'—ভূমিকা।

হাতে তা দূষিত হয়ে পড়ল [এই শক্তিহীন লেখকদের একটি তালিকা সম্পাদকীয় ভূমিকার ১০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে], সুতরাং ডিকেন্স-শিষ্য তারকনাথ উচ্চারণ করলেন, তাঁর প্রার্থিত আর কিছুই নয়—Truth ; কল্পনা নয়, সত্য। 'স্বর্ণলতা'র নামপত্রে হোরেসের বাণী উৎকলন করলেন—'Fictions to please should wear the face of truth'. 'হরিবংশ' থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটিও প্রায় সমার্থক[১] [ভূমিকা ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। এ 'সত্য' তারকনাথের কাছে কোনো প্লেটনিক সত্যস্বরূপ নয়—এ সত্য ইন্দ্রিয়বেদ্য, অনুভবের গোচর—দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার দ্বারা আধৃত সত্য। চোখ মেলে যা দেখা যায়, মনের সহজ অনুভবগুলি দিয়ে যাকে স্পর্শ করা যায়। সমাজাশ্রিত এই লোকব্যবহারের সত্যকে বঙ্কিমচন্দ্রে সব সময় পাওয়া যায় না, এ কথা অনস্বীকার্য।

বঙ্কিম যুগের উপন্যাসের মধ্যে এই যে রোমান্সের আত্যন্তিক প্রবণতা, যা এক সময় রুগ্ণতায় পর্যবসিত হয়েছিল—তার বিরুদ্ধে তারকনাথের বিক্ষোভ নিশ্চয়ই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তিন বছর পরে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এমন কর্ম আর কর্ব না' [১৮৭৭] প্রহসনে—যা পরে 'অলীকবাবু' নামে খ্যাত হয়েছে—নায়িকার উক্তিতে বঙ্কিমী ধরনের অবাস্তব রোমান্স-রঙিনতাকে প্যারডি করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রে রোমান্সের আতিশয্য নেই—কিন্তু ঐ যুগের রোমান্স-তারল্যের জন্য তিনিই দায়ী। তারকনাথের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমর্থকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্ণলতা' সম্পর্কে কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু বলেছিলেন কি না

১. 'হরিবংশ' থেকে উদ্ধৃত বলে যে শ্লোকটি 'স্বর্ণলতা'র নামপত্রে মুদ্রিত হয়েছে—'কথাপি তোষয়েদ্বিজ্ঞং' ইত্যাদি—তা আদৌ 'হরিবংশ'-এর নয়। এ সম্বন্ধে তারকনাথের নিজের কথাতেই পাওয়া যায়—" ঠিক ঐরূপ (লাটিন ও ইংরেজী মর্ম) ভাব প্রকাশ করে এরূপ কোন শ্লোক না জানা থাকাতে নবীন পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া শ্লোকটি রচনা করাইয়াছিলাম। আমি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিট্যান ইন্‌স্টিটিউশনে কিছুদিন কেমিস্ট্রির অধ্যাপকের কাজ করি। সেই উপলক্ষে নবীন পণ্ডিত (প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন) মহাশয়ের দ্বারা ঐ শ্লোক রচিত হয়। শ্লোক যদি হইল, ত কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই গ্রন্থ অথবা গ্রন্থকারের নাম দিতে হইবে। আমি বলিলাম, 'কুল্লুক ভট্ট' অথবা 'মহানির্বাণ তন্ত্র' এমন একটা কোনও বদখৎ নাম বলিয়া দিন যাহা সাধারণ লোকে সচরাচর পড়ে না। তাহাতে নবীন পণ্ডিত মহাশয় শ্লোকটির নিম্নে 'হরিবংশম্' নামটি বসাইয়া দিয়াছিলেন।"

সন্দেহ, যদিও তারকনাথের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, এমন আভাস আছে তাঁর দু-একটি উক্তিতে। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারকনাথের দৃষ্টিভঙ্গিকেই তিনি মান্য করেছেন, তার প্রমাণ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কাছে তাঁর লেখা চিঠিগুলিতে। পুরানো 'ছিন্নপত্র'-এর ৪ নম্বর চিঠিতে তিনি লিখছেন :

......"যা হোক, আপনার বহিটা[১] শেষ হয়ে গেলে সাধারণ পাঠকদের কি রকম লাগে জানতে ইচ্ছে রইল। হয়তো বা ভালো লাগতেও পারে। ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলা দেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত করে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হন নি। এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই পড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলা দেশই ছিল কি না ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে।"

পরবর্তী চিঠিটি ['ছিন্নপত্র'—৫নং]—যার পীড়াদায়ক স্পষ্টোচ্চারণ এখনও আমাদের বিভ্রান্ত করে—একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধার করা চলে—

......"আপনার লেখা আমার ভারি ভালো লাগে; ওর মধ্যে কোনোরকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি মনে এনে দেয় যা আমাদের দেশের কোনো লেখকের লেখাতে দেয় না। আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না— সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আমকাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন। প্রকৃতির শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধছায়া শ্যামল নীড়ের মধ্যে যেসব ছোটো ছোটো হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাস করছে, দোয়েল কোকিল বউ-কথা-কও'-এর

[১] 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ফুলজানি।'

গানের সঙ্গে মানবহৃদয়ের যে-সকল আকাঙ্ক্ষাধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিরাম আকাশের দিকে উঠছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান মেশাবেন। কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি অধিক ফলাও কাণ্ড না করেন তাহলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারবেন। বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালীদের সুখদুঃখের কথা এ পর্যন্ত কেহই বলেন নি—আপনার উপর সেই ভার রইল। বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল-দেশীয় সকল-জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল-পৃথিবীর-এক-নিভৃতপ্রান্ত-বাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।”

এই দীর্ঘোদ্ধৃত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের জন্য যে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করলেন তা হয় তো একটু কাব্যময়, একটু ভাবরসসিক্ত। এবং এও যথার্থ যে এ চিঠি লেখার সময় অন্ততঃ ‘স্বর্ণলতা’র কথা রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগটিকে চিনে নিতে সেজন্য দেরি হয় না। তারকনাথের অভিযোগও স্বরূপতঃ একইছিল।

‘ছিন্নপত্র-’এর এই দুটি চিঠিতেই নয়। রবীন্দ্রনাথ ‘গল্পগুচ্ছ’-এর কয়েকটি গল্পে, তৎকালীন উপন্যাসের ঐ কল্পনাসর্বস্ব রোমাঞ্চজগৎ, এবং সে-তুলনায় সহজ জীবনের আপাতগোচর দুঃখসুখের জগতের অধিক মহনীয়তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে তো [অগ্রহায়ণ ১২৯৯] এই দুটি পরস্পরবিরোধী জগতের মধ্যে বঙ্কিমী রোমান্সের অলৌকিক জগৎকে যথেষ্ট হাস্যকর করেই দেখানোর চেষ্টা আছে।. .

“সে তখন আমার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে ‘আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম’

খেলতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"[১]

'নষ্টনীড়' গল্পে অমল ও চারুর রচনা প্রতিযোগিতার মধ্যে, কিংবা 'দর্পহরণ' গল্পে হরিশ্চন্দ্র হালদার ও নির্ঝরিণী দেবীর গল্পরচনা-প্রয়াসে উনবিংশ শতাব্দীর গল্প-উপন্যাসের ঐ দুটি বিপরীত আদর্শের আভাস পাওয়া যায়। অমলের রোমান্টিক, উচ্ছ্বাস-প্রবণ, অলঙ্কার-অত্যুক্তিবহুল বাক্যপ্রলাপের পাশে চারুর লেখার বিষয়বস্তু নিতান্ত আড়ম্বরহীন,—

"কোনোমতেই অমলের গণ্ডি এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও এ সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল ; সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জগ্রত ঠাকুরাণীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প—এই সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা-ভঙ্গী-আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল[২]।"

এই লেখা 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকার সমালোচকের প্রশংসা এবং রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ সমর্থন লাভ করেছে। 'দর্পহরণ' গল্পে 'ইংরেজী প্লট এবং সংস্কৃত অভিধান মিলাইয়া' খাড়া করা গল্প 'বিক্রমনারায়ণ'-এর তুলনায় নির্ঝরিণীর 'ননদিনী' গল্পটিও একই কারণে 'উদ্দীপনা' পত্রিকায় পুরস্কার লাভ করেছে। 'ছিন্নপত্র'-এর চিঠি দুটি এবং 'গল্পগুচ্ছ'-এর এই কটি গল্প যদি কোনো আভাস হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বলা চলে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণজাত রোমান্স-পন্থা এমন একটি আতঙ্কর পর্যায়ে

১. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠা।

২. রবীন্দ্ররচনাবলী, ২২শ খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা।

পৌঁছেছিল যে, প্রচ্ছন্নভাবে হোক, ব্যক্তভাবে হোক, প্রতিবাদ কিছু না উঠে পারে নি। অর্থাৎ তখন বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সমান্তরাল ধারার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সমান্তরাল রীতি সর্বপ্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ লাভ করে তারকনাথেরই মুখে। বঙ্কিমের অবিসংবাদিত সাম্রাজ্যবাদে ঐ একটি বিরোধী কণ্ঠস্বর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের মর্যাদা বৃদ্ধি না করুক, নষ্ট হতে দেয়নি ঐ মর্যাদাকে। এখানেই 'স্বর্ণলতা' এবং তার লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যবান ঐতিহাসিক ভূমিকা। 'স্বর্ণলতা' মহৎ উপন্যাস নয়, 'বিষবৃক্ষ'-এর সঙ্গে তুলনায় এর দীনতাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট—তবু এ উপন্যাস বাঙালী জীবনের সত্য ছবি—বাঙালীর গৃহপরিবেশের প্রায় নিখুঁত আলেখ্য। প্যারী নগরী লুপ্ত হয়ে গেলে ভলতেয়ারের 'কঁদিদ্' থেকে যদি তার পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়, তবে তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' থেকেও চতুঃসহস্রতম শতাব্দীতে বসে উনবিংশ শতাব্দীর গ্রামবাংলার কিছুটা চেহারা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হবে না। তারকনাথের এই তথ্যনিষ্ঠাই স্বীকৃতি লাভ করেছে দক্ষিণাচরণ রায়-কৃত 'স্বর্ণলতার' ইংরেজী অনুবাদে—যেখানে স্বর্ণলতার বিকল্প নাম অনুবাদক দিয়েছেন—Scenes from Hindu Village Life in Bengal,[১] তৎকালীন পত্র-পত্রিকার এই অনুবাদের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে সমস্ত সমালোচক প্রায় একবাক্যে তারকনাথ কর্তৃক বাঙালী জীবনের যথার্থ চলচ্ছবি উপস্থাপনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এবং 'ক্যালকাটা রেভিউ'-র আলোচক যে 'স্বর্ণলতা'কে 'This is the only true novel we have read in Bengali' বলেছেন,[২] তাও নিশ্চয়ই তারকনাথের এই তথ্যভূয়িষ্ঠতার জন্য। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের দৈনন্দিন ঘরোয়া

১. 'স্বর্ণলতা'র অনুবাদক হিসাবে দক্ষিণারঞ্জন রায়ের নাম সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। অনুবাদ প্রকাশের তারিখ ১৯০৩ সাল। কিন্তু এই দাক্ষিণারঞ্জন রায়ের অনুবাদটির কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। বরং দক্ষিণাচরণ রায় [D. C. Roy] যে অনুবাদ করেছিলেন তার অন্ততঃ দুটি সংস্করণ আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে—১৯০৬-এর সান্ন্যাল এণ্ড কোং-এর ২য় সংস্করণ ও ১৯১৪-এর ম্যাকমিলান, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত আরেকটি সংস্করণ। দক্ষিণাচরণের অনুবাদই সম্ভবতঃ ১৯০৩-এ প্রথম সংস্করণ বেরোয়। 'স্বর্ণলতা'র অনুবাদ-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সকলেই এক ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন।

২. 'ক্যালকাটা রেভিউ'র এই সমালোচক সম্ভবতঃ রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। সেক্ষেত্রে তাঁর 'Bengal Peasant Life'-এর নামকরণটিও মনে রাখার মতো।

জীবন, তার ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ও ঈর্ষা, তুচ্ছ কারণে কলহবিবাদ ও মূক দুঃখ-সহনের ঘটনাগুলি তারকনাথের মতো করে ঐ যুগে আর কে বলেছেন? তাও সম্পূর্ণ বঙ্কিমপ্রভাবমুক্ত হয়ে? বাংলার প্রথম গার্হস্থ্য উপন্যাস এই 'স্বর্ণলতা'র নিখুঁত বাস্তবচিত্রগুলিকে আজ পর্যন্ত অম্লান ও উজ্জ্বল লাগে।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে তারকনাথের এই বঙ্কিম-বিদ্বেষ বঙ্কিমচন্দ্রের তারকনাথ-সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের কারণ হয়েছিল। সেকালে তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'কে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রতি অন্যায় কটাক্ষ করেছিলেন। চতুর্থ সংস্করণের 'স্বর্ণলতায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে চিঠিটি মুদ্রিত হয়েছে তাতে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে—"ইংরেজী ধরণের প্রণয়-লীলা, চোর-ডাকাতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এ সকল প্রসঙ্গের ছায়াপাত বর্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী তাহার অসাধারণ কোনও গুণ আছে ইহা কে না স্বীকার করিবে?" 'ক্যালকাটা রেভিউ'র সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গুলিকে উপন্যাসপদবী দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন, বলেছেন সেগুলি কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। 'স্বর্ণলতা'র সমস্ত সমালোচকই এ উপন্যাসের ঐ 'বাস্তব' গুণটির উপর জোর দিয়েছেন এবং প্রাসঙ্গিকভাবেই তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ণতার কথাও এসে পড়েছে। তারকনাথ ব্যক্তিগতভাবে এমন বঙ্কিম-বিরক্ত ছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা ও 'স্বর্ণলতা'র সুখ্যাতি যে তাঁর কাছে করেছে, তারই জন্য তিনি নাকি 'পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত' করেছেন।[১] 'স্বর্ণলতা' প্রকাশের ফলে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার দ্রুত প্রচারবৃদ্ধি হয়, 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রচারসংখ্যা তখন একটু হ্রাস পেয়েছিল। এই সব কারণে বঙ্কিমচন্দ্র ও তারকনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্ভবতঃ স্বাভাবিক হতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র তারকনাথ সম্পর্কে তাঁর রচনায় বিস্ময়কররূপে নির্বাক ছিলেন, এমন কি 'বঙ্গদর্শন'-এ 'স্বর্ণলতা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। তারকনাথ তো প্রকাশ্যভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দাবাদে মুখর হয়েছেন। সাহিত্যরীতিতে প্রভেদ দু জনের ব্যক্তিগত সম্পর্ককেও ক্লিষ্ট করে তুলেছিল।

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'দাসী', আগস্ট, ১৮৯৬।

'স্বর্ণলতা'র কাহিনী-সংক্ষেপ

প্রথম পরিচ্ছেদ—শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাইয়ের একান্নবর্তী সংসারে শশিভূষণ উপার্জনশীল। বিধুভূষণের দশ বৎসর বয়সের সময় দুই ভাইয়ের পিতৃবিয়োগ ঘটে। শশিভূষণ অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে স্বগ্রামের জমিদার-সরকারে মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে চাকুরি পেয়েছিল। ঐ কাজে বেতনের চেয়ে অন্যান্য প্রাপ্তিযোগ বেশি থাকায় নিজের বিচক্ষণতায় সে অল্পকালেই সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠল। বিধুভূষণ 'মা-সরস্বতীর ভালবাসা ঘৃণার দ্বারা পরিশোধ' করে লেখাপড়া তেমন কিছু শিখল না, বরং ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করে দাদার আশ্রয়ে থেকে নিরুদ্বেগে দিন কাটাতে লাগল। সঙ্গীতবাদ্যে তার বেশ দক্ষতা জন্মেছিল—এই তথ্য উপন্যাসে পরবর্তী ঘটনাসংস্থানে সাহায্য করেছে। তার বিবাহের বছর পাঁচেকের মধ্যে শশিভূষণের এক ছেলে ও এক মেয়ে, এবং বিধুভূষণের এক ছেলে গোপাল জন্মগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—এ পরিচ্ছেদের ঘটনা প্রথম পরিচ্ছেদের ঘটনার চার-পাঁচ বৎসর পরবর্তী। সেদিনকার শিশুরা একটু বড়ো হয়েছে। মার মৃত্যুর পর [মা বিধুভূষণের বিবাহের পর বছর পাঁচেক বেঁচেছিলেন] শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদার কুটিলতা দু-ভাইয়ের সংসারে বিরোধের সূচনা করে। গলগ্রহস্বরূপ দেবরের সংসারটি প্রমদার দুঃসহ মনে হচ্ছিল। এই পরিচ্ছেদেই সে গোপালের বাঁশি কেনার জন্য একটিমাত্র পয়সা সরলাকে দিতে চায় নি—বরং নিজের স্বামীর নির্বুদ্ধিতা ও বিধুভূষণের নৈষ্কর্ম্য নিয়ে সরলাকে সে দু-কথা শুনিয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মা ও সন্তান, সরলা ও গোপালের হাসি-অশ্রুর করুণ-মধুরতায় এই পরিচ্ছেদটি নির্মিত। আখ্যানের কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—প্রমদা 'ব্যামো'র ছল করে বিশ্রামসুখ উপভোগ করে, এবং 'রন্ধনাদি এবং গৃহকার্য সরলাকেই করিতে' হয়। স্বামীর অকর্মণ্যতার দায়মোচন সরলা এভাবেই করে যায়। প্রমদা প্রথমে দ্বার রুদ্ধ করে নিজের ঘরে শুয়েছিল, রূপকথার রানীরা যেমন 'গোঁসা

ঘরে' গিয়ে শুয়ে থাকতেন সেই রকম। এ কিছুই নয়, শশিভূষণকে ছদ্ম অভিমানের ছলনায় বিগলিত করার কৌশল। যাই হোক অত্যন্ত কৌশলী একটি ভূমিকার দ্বারা প্রমদা বিধুভূষণদের প্রতি স্বামীর বিরক্তি উদ্রেক করার চেষ্টা করল এবং বিধুর বৈঠকখানা নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে নিজের চন্দ্রহারের দাবিটি আদায় করে নিলে। শ্যামার গুপ্তচর-বৃত্তির সহায়তায় এ খবর সরলার কাছে পৌছুল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সরলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন শ্যামাকে তুলে বিধুভূষণকে ডেকে আনতে পাঠাল। সে পাড়ায় যাত্রাগানের আসরে ব্যস্ত ছিল, রাত্রে বাড়িতে ফেরে নি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—পরদিনের সকালবেলা। এ পরিচ্ছেদে নতুন চরিত্র এসেছে, ঠাকরুণদিদি। তাকে প্রমদা কূটপরামর্শের ও সহায়তার জন্য ডেকেছে, এবং তার উক্তিতে বোঝা গেল যে ঐ প্রত্যূষ থেকেই প্রমদা সরলাদের পৃথগন্ন করে দেবার সুমহতী ইচ্ছা রাখে। এদিকে মুখুজ্যেদের বাড়ির যাত্রাদলে বাজিয়ে প্রশংসা অর্জন করে হৃষ্টচিত্তে বিধুভূষণ বাড়ি ফিরছিল, পথিমধ্যে শ্যামা তাকে সংসার-দুর্যোগের খবরটা জানালে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বিধুভূষণ প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে নি শশিভূষণ হঠাৎ তাকে পৃথক করে দেবে। কিন্তু শশিভূষণের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারেই সে বুঝল প্রমদার সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ দাদা ধ্রুবসত্য বলে প্রত্যয় করে বসে আছে, সুতরাং বিধুভূষণকে এবার উপার্জনের পথ দেখতেই হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কয়েকদিন পরের ঘটনা। এই প্রথম বিধুভূষণ গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছে, এবং কদিনের অসহায়তায় তার সদাতৃপ্ত ভাবটি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। সে জমিদারের সঙ্গে দেখা করেছিল, কিন্তু পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েও 'বাবু' বিধুভূষণকে তাঁর মদমত্ত আলস্যের মধ্যে এক উৎপাত মনে করলেন। হতাশ ও তিক্ত বিধুভূষণের সঙ্গে শশিভূষণের আবার একটু কলহ হল। সে কিছুতেই সরলাকে বাপের বাড়ি যেতে কিংবা শ্যামাকে অন্যত্র কাজ দেখতে সম্মত করাতে পারলে না। একজন স্বামীপ্রেমে, অন্যজন গোপালের প্রতি

স্নেহে এ সংসারের সুখদুঃখের অংশ নিতে চায়। অগত্যা শ্যামার কাছ থেকে রাহাখরচস্বরূপ পাঁচটি টাকা নিয়ে বিধুভূষণ পথে নামল।

নবম পরিচ্ছেদ—কলিকাতার রাস্তায় হাঁসখালির কাছে একটি গাছের নিচে বিধুভূষণ বিশ্রাম করছিল, এমন সময় পাশে এসে বসল এই উপন্যাসের অবিস্মরণীয় চরিত্র **নীলকমল**। নিজের বিচারে নীলকমল একজন বিরাট সংগীতশিল্পী। সেও 'পয়সার' চেষ্টায় পথে বেরিয়েছে, কিন্তু তার বেহালাবাদ্য ও 'পদ্মআঁখি' গান শুনে বিধুভূষণ তার গুণপনা মুহূর্তেই বুঝে নিলে। কলকাতার পথে নীলকমল বিধুর যাত্রাসঙ্গী হল।

দশম পরিচ্ছেদ—মুদীর বাড়িতে দু জনের অবহেলিত আশ্রয়লাভ। দুটি ব্রাহ্মযুবক ও তাদের প্রতি মুদিনীর পক্ষাপাতিত্ব, পরে প্রত্যাবৃত্ত মুদীর হস্তক্ষেপ। নীলকমলের রুদ্ধশ্বাস বেহালাবাদ্য ও 'পদ্মআঁখি' সংগীতের মধ্যে বিধুভূষণের ক্লিষ্ট নিদ্রাপ্রয়াস।

একাদশ পরিচ্ছেদ—উপন্যাসের নূতন episode বা উপকাহিনীর শুরু এই পরিচ্ছেদে। এখানে এবং উনবিংশ পরিচ্ছেদে এ উপকাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলেছে, কিন্তু ত্রিংশ পরিচ্ছেদে গোপাল ও হেমচন্দ্রের দেখা হওয়ায় দুয়ের যোগ ঘটেছে। এই যোগ অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ স্বর্ণলতা ও গোপালের মিলনও উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। এ পরিচ্ছেদে বিপ্রদাস চক্রবর্তীর দুটি সন্তান হেমচন্দ্র ও স্বর্ণলতার সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হবে, এবং হেমচন্দ্র তার বিনয়, শিক্ষা ও উদারতা দিয়ে এবং স্বর্ণ তার বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য ও আত্মপ্রত্যয় দিয়ে প্রথম থেকেই আমাদের চিত্ত জয় করবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—স্বাধীনচেতা ঠাকরুণদিদি অসন্তুষ্ট হয়ে প্রমদার সংসার ত্যাগ এবং এই সুযোগে প্রমদা নিজের মা ও অল্পবুদ্ধি জড়জিহ্ব ভাই গদাধরকে এনে শশিভূষণের সংসার-তরণী সুগতিসম্পন্ন রাখার চেষ্টা করছে। নিজের শাশুড়ী এবং শ্যালককে শশিভূষণ বিলক্ষণ চিনত, তাই ব্যাপারটা তার পক্ষে খুব সুপাচ্য হল না। **'গডাচর চণ্ড'**কে এই পরিচ্ছেদে প্রথম দেখা যাচ্ছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—সরলার বিচ্ছেদকাতরতার ছবিটি লেখক আমাদের

এতক্ষণে দেখানোর সুযোগ পেলেন। শ্যামা প্রমদার বাক্যবাণ থেকে **সরলাকে সর্বতোভাবে** রক্ষা করে, প্রয়োজনমতো প্রতি-আক্রমণও করে,—সরলার সংসারের 'guardian angel' বা রক্ষক দেবদূতের মতো সে আছে। গদাধরকে সে বিড়ম্বিত করতে ছাড়ে নি, এবং সেই সূত্রেই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র **রমেশের** দেখা পাওয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—শশিভূষণের দ্রুত সমৃদ্ধির মূলে আছে জমিদারকে প্রতারণা, তা-ই এ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত ঘটনায় বোঝানো হয়েছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—শশিভূষণ বিধুর দাবিকে ফাঁকি দেবার জন্য নূতন জমি কিনল গদাধরের নামে, সেখানে তার নূতন বাড়ি ও বৈঠকখানা নির্মিত হল। পুরানো বৈঠকখানাটি বিধুভূষণকে দান করার সদিচ্ছা প্রমদার 'মেঘাচ্ছন্ন মুখচন্দ্রিমা'র দ্বারা নিরস্ত হল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—বিধুভূষণ ও নীলকমলের পথযাত্রা চলছে। উপন্যাসের ভ্রাম্যমাণ অংশগুলিকে শুধু সংলাপ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়, সেজন্য নূতন ঘটনা বা আখ্যান ইত্যাদি আনতে হয়। এ পরিচ্ছেদে নীলকমলের সেই বিখ্যাত কর্মসূত্রের বিষাদকরুণ কাহিনীটি আছে। পথবর্তী দোকানে দুজনেই রাত্রির বিশ্রাম নিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—পরের দিন, আবার পদযাত্রা। কলিকাতায় পৌঁছে নীলকমল মহা বিস্ময়াভিভূত, কিন্তু শহরের প্রথম অভিজ্ঞতা তার তেমন সুখকর মনে হল না। দুজনে কালীঘাটের দিকে রওনা হল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—ঢাকাই চালওয়ালা মহাজনের বাদশাহী মেজাজ—কালীঘাটে পাণ্ডাদের আক্রমণে উভয়ের বিচ্ছেদ। বিধুভূষণের পথখরচার থলিটি চুরি গেল, সে মন্দিরের ভোগ থেকে প্রসাদ পেয়ে নাটমন্দিরে শুয়ে বিষণ্ণ দিন কাটাতে লাগল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—আবার বিপ্রদাস-হেমচন্দ্র-স্বর্ণলতার উপাখ্যানে কাহিনীর প্রবেশ। বিপ্রদাস উইল করে স্বর্ণকে পনের হাজার ও হেমচন্দ্রকে পনের হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিলেন। স্বর্ণের এই সম্পত্তিপ্রাপ্তি থেকেই পরে শশাঙ্কের ষড়যন্ত্র অনুস্যূত হবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ—গদাধর সরলার ভাঙা সিন্দুক থেকে সংসার খরচের টাকা চুরি করায় সরলার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু শ্যামার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ভয়প্রদর্শনে শশিভূষণ এসে টাকাগুলি গুণে দিলে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ—গোপালের পাঠশালার দৃশ্য। দোলের পার্বণী গোপাল দিতে পারে নি, সেই সূত্রে সে সমপাঠী ভুবনের সহানুভূতি পেয়েছে। ভুবনের মার কাছ থেকে গোপাল দুর্মূল্য আরো একটু মাতৃস্নেহ লাভ করেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—নীলকমল কালীঘাটে এক সদাশয় ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু নিজের 'শিল্পি-সত্তার' পূর্ণ চরিতার্থতা না হওয়া পর্যন্ত তার তৃপ্তি নেই। বাবুর সঙ্গে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা শুনতে এসে সে আর ফিরে গেল না, বরং আসরে গিয়ে বসল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—বিধুভূষণ একজন সহায়ক পাণ্ডার মধ্যস্থতায় একটি পাঁচালির দলে বাদকের কাজ পেল এবং তার পূর্বের স্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা ফিরে এল। সরলাকে চিঠি লিখে এবং গোপালের স্বাক্ষরযুক্ত সে-চিঠির রসিদ দেখে তার মনও ভাল হল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—হুগলী জেলার দেবীপুরে বিধুভূষণ ও নীলকমলের পুনরায় সাক্ষাৎ হল। হনুমানের সং সাজার হীনমন্যতায় নীলকমল পাঁচালির আসর পণ্ড করে বিধুভূষণের সঙ্গে দেখা করল এবং দল থেকে বিদায় নিয়ে একলা চলে যেতে চাইল। বিধুভূষণের পরামর্শে সে তার প্রিয় 'পদ্ম আঁখি' গানটি এ-পরিচ্ছেদে ত্যাগ করল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ—বিধুভূষণের বিদেশযাত্রার চার বছর পরে, সরলা ক্রমশ রুগ্‌ণা হয়ে পড়ছে, নিজের সম্বন্ধে ভয়ও তার বাড়ছে। শ্যামা এই চার বছর প্রাণের সবটুকু মমতা দিয়ে এই অনাত্মীয় সংসারটিকে পালন করেছে। সরলা গোপালকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে, যাতে সে চিরজীবন শ্যামাকে মায়ের মতোই দেখে ও শ্রদ্ধা করে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—এখন বোঝা যাচ্ছে, বিধুভূষণ গোপালের নামে যে

টাকা পাঠাত, তা গদাধর রমেশের কুমন্ত্রণায় গোপালের স্বাক্ষর জাল করে আত্মসাৎ করেছে। রমেশ গদাধরের ষড়যন্ত্রের সঙ্গী, কিন্তু সে গদাধরের চেয়ে বেশি চালাক, এবং এই সুযোগে সে গদাধরকে 'blackmail' করছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—বিধুভূষণ নীলকমলকে নিয়ে দেশে ফিরে এল, কিন্তু তার এই প্রত্যাবর্তন সুখের হয় নি। সরলার দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ ধরেছিল আগেই। প্রাণশক্তি ফুরিয়ে এসেছিল তার, শুধু স্বামীর মুখ দেখার আশায় নিজের প্রাণটুকুকে ধরে রেখেছিল। গোপালকে শ্যামার হাতে সঁপে দিয়ে, স্বামী-সন্নিধানের সুখ বুক ভরে নিয়ে সরলা মৃত্যুকে গ্রহণ করল। উপন্যাসের প্রথমাংশ এখানে সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—শশিভূষণের সুখের দিন শেষ হয়ে আসছে। রামসুন্দর প্রভৃতি আমলাবর্গ শশিভূষণের অবনতির জন্য চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বিধুভূষণ গদাধর গোপালকে পাঠানো টাকা আত্মসাৎ করেছে বুঝতে পেরে পুলিশে খবর দিয়েছে। রমেশ গদাধরকে গোপনে এই বিপদের কথা জানালে। কিন্তু গদাধরের শেষরক্ষা হল না—ধরা পড়ে তার ১৪ বৎসর জেল হল। বিধুভূষণ শ্যামা ও গোপালকে নিয়ে কলকাতায় এল, সেখানে এক বাড়িতে ঐ দুজনকে রেখে সে জীবিকান্বেষণে অন্যত্র গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ—নীলকমল বিধুভূষণের বাড়ি থেকে ভোরবেলায় সকলের অগোচরে চলে যায়। নিজের গ্রামে সে পরিবারের সকলের সঙ্গে পুনর্মিলিত হল, কিন্তু তাকে লক্ষ্য করে গ্রামবালকদের 'বাছা হনুমান' চীৎকারে তার জীবন অচিরেই দুর্বিষহ হয়ে পড়ল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ—এই পরিচ্ছেদে হেমচন্দ্রের সঙ্গে গোপালের সাক্ষাৎ ঘটছে—এই যোগাযোগের মূলে আছে হেমচন্দ্রের সহানুভূতি। যে বাড়িতে গোপাল ও শ্যামা থাকে সে বাড়ির কর্তাদের ব্যবহার অন্যরকম।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ—রামকুমার চাকরের সঙ্গে পরামর্শ করে হেমচন্দ্র গোপালের জন্য একটি স্থায়ী আশ্রয়ের পরিকল্পনা করছে। গোপাল এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে শ্যামার সম্মতি জেনেছে, তারপর সকৃতজ্ঞভাবে হেমচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ—পুজা উপলক্ষে হেমচন্দ্র গোপালকে তাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। স্বর্ণলতার সঙ্গে গোপালের দেখা এবং মদনদেবের শরপতন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ—স্বর্ণলতার মনেও 'অভূতপূর্ব ভাবের উদয়'। স্বর্ণলতার বিবাহপ্রসঙ্গে বিপ্র াস ও হেমচন্দ্রের কথোপকথন; সে স্থল থেকে গোপালকে হেমচন্দ্র অন্যত্র যেতে বলায় সে 'কিছু ক্ষুণ্ণ' হয়ে চলে গেল। গোপালের সঙ্গে স্বর্ণের বিবাহের জন্য হেমচন্দ্র প্রস্তাব করল, বিপ্রদাস দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে সম্মত হলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ—গোপালের প্রাংশুলভ্য স্বর্ণলতালাভের আকাঙ্ক্ষা, নিজের দারিদ্র্যের জন্য মনস্তাপ। স্বর্ণলতাও গোপালের ঘরে এসেছিল, কিন্তু শেষোক্তজনের পদশব্দ শুনেই সে অন্তর্হিত হয়।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ—মুহুরির কাজ নিয়ে এক ডেপুটি কালেক্টরের সঙ্গে বিধুভূষণ ঢাকা জেলায় গিয়েছিল, 'বাছা হনুমান' চীৎকারের তাড়নায় বিড়ম্বিত নীলকমলের ভাগ্য তাকে বিধুর কাছেই আবার নিয়ে পৌঁছে দিল। শান্তিহীন স্বস্তিহীন এই হতভাগ্য তখন অপরিসীম দুর্দশাগ্রস্ত। বিধুভূষণ তাকে নিজের কাছে রাখতে যত্ন নিলেন, কিন্তু সে আবার পলাতক হল।

ওদিকে আমলাদের ষড়্‌যন্ত্রে শশিভূষণের পুকুর চুরি ধরা পড়ল, মাজিস্ট্রেট কাছারির কাজ বন্ধ রাখলেন। শশিভূষণের পূর্বপ্রতিষ্ঠা নিঃশেষ হল। আমলারা উৎকোচের বিনিময়ে তার অপরাধ ঢাকতে রাজী হল। শশিভূষণের এ অংশটুকু অন্য পরিচ্ছেদে দেওয়া উচিত ছিল।

[ষট্‌ত্রি]ংশ পরিচ্ছেদ—হেমচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয়েছে। অল্প পরে সে নিজে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হল এবং সে রোগের প্রকোপে হতচেতন হয়ে পড়ল। গোপাল প্রাণ দিয়ে তার সেবাশুশ্রূষায় নিরত হল। স্বর্ণকে কলকাতায় আসতে লিখে দিলে। স্বর্ণ ও তার পিতামহী কলকাতায় আসার জন্য গুরুদেব **শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরির** শরণাপন্ন হল। কুচক্রী শশাঙ্ক স্বর্ণের পিতামহীকে কলকাতায় রেখে এল, কিন্তু স্বর্ণকে নিজের বাড়িতে রেখে দিলে, তার পৈশাচিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ—শশাঙ্কের পৈশাচিক উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—একটি অপদার্থ পাত্রে সে স্বর্ণের বিবাহ দিয়ে স্বর্ণের উত্তরাধিকার ১৫ হাজার টাকার একটি অংশ আত্মসাৎ করতে চায়। পাত্রের পিতা হরিদাসের সঙ্গে তার এই মর্মে চুক্তি হয়েছে। স্বর্ণকে সে প্রায় বন্দিনী করেই রেখেছে—কিন্তু স্বর্ণ ঘুণাক্ষরেও এসব কথা জানে না।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ—হেমচন্দ্র ক্রমশ সেরে উঠছে—শশাঙ্ক তাকে রোজ দেখতে আসে। স্বর্ণলতার সেজন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। ওদিকে শশাঙ্ক গোপনে হরিদাস-তনয়ের সঙ্গে তার বিবাহের গোপন উদ্‌যোগ করে চলেছে। এই ষড়্‌যন্ত্রের কথা একদিন স্বর্ণ জানতে পারল। শশাঙ্কের স্ত্রীর পরামর্শে সে হেমচন্দ্রের বাসায় চিঠি লিখলে।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—চিঠি পৌঁছুতে একটু দেরি হল, কিন্তু চিঠির মর্মানুধাবন করে হেমচন্দ্রের পিতামহী, হেমচন্দ্র ও গোপাল অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। গোপাল কালবিলম্ব না করে শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। পথে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সে ট্রেন ধরল, কিন্তু ক্লান্তিতে অঘোর নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে সে একেবারে বর্ধমান গিয়ে পৌঁছুল। অল্প টিকিটে অধিক ভ্রমণের জন্য গারদে আবদ্ধ গোপালের মনে স্বর্ণলতা-উদ্ধারের আশা নির্মূল হয়ে গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—বিবাহের দিন। শশাঙ্ক এসে স্বর্ণকে উপবাসী থাকতে বলে গেছে। স্বর্ণের প্রতিবাদ ও ধিক্কার ঐ অর্থপিশাচকে বিচলিত করতে পারেনি। এদিকে সে ত্রাণকর্তা হিসাবে গোপালকে প্রতিমুহূর্তেই প্রত্যাশা করছে, কিন্তু গোপাল এল না। ত্রাণকর্তা-রূপে এলেন অগ্নিদেব—শশাঙ্কের চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—আমলাদের উৎকোচ দেবার জন্য শশিভূষণ প্রমদার অলঙ্কারগুলি চাইলে—প্রমদা প্রত্যাখ্যান করল। এ পরিচ্ছেদে তাকে দানবী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। শশিভূষণের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই ছিল প্রমদার করতলগত। শশিভূষণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলে; প্রমদাকে এতদিনে সে চিনেছে। এদিকে প্রমদা তার মায়ের সঙ্গে অলঙ্কারের বাক্স নিয়ে পালাবার মতলব করেছে।

বাড়ির চতুর্দিকে পুলিশের পাহারা, তবু রমেশের সহায়তায় প্রমদা তার অলঙ্কারের বাক্স নিয়ে মার সঙ্গে পলায়ন করল। কিন্তু আকস্মিক ঝড়বৃষ্টি বন্যায় তার নৌকা ডুবল, গহনার বাক্স হস্তচ্যুত হল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—আগুন এবং তৎপ্রসূত হট্টগোলের মধ্যে স্বর্ণলতা শশাঙ্কের গৃহ থেকে পালানোর সুযোগ পেল। গুরুঠাকুরের দাসীও একটি অলঙ্কারের বাক্স নিয়ে পালাচ্ছিল, তার মাসীর বাড়িতে স্বর্ণ রাত্রিবেলাকার মতো আশ্রয় পেল। শশাঙ্ক হবিদাসের দেওয়া টাকাগুলি উদ্ধারের জন্য কুঠার দিয়ে তক্তাপোশের উপর আঘাত করল। সেই আঘাতে চালের জ্বলন্ত আড়কাঠা ভেঙে তার উপরে পড়ল এবং নিজেরই কুঠারে তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল। অসৎ-কাজের সবটুকু দণ্ড তার জুটল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—গদাধরের জননীর কাছে অনুসন্ধান করে জানা গেল, রমেশই তাদের পলায়নের উপায় করে দিয়েছিল, রমেশই শশিভূষণের বাড়িতে পাহারাদার দারোগাকে মদ খাইয়ে অচেতন করে রেখেছিল। গদাধরের সর্বনাশ করে সে যে টাকা নিত তাও ধরা পড়ল। গদাধরের কুকর্মের পিছনে মস্তিষ্কটি যে তারই তাও আর গোপন রইল না। বিচারে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—ওদিকে বর্ধমানে রেল গারদ থেকে মুক্তি পেয়ে গোপাল শ্রীরামপুরের গাড়ি ধরল। কিন্তু শশাঙ্কের বাড়ির কাছে পৌছে সে দেখলে ভস্মস্তূপ মাত্র পড়ে আছে। নদীতীরে মাঝিদের কথোপকথন থেকে সে আকস্মিকভাবে স্বর্ণলতার সন্ধান পেল। স্বর্ণ-সন্নিধানে এসে ক্লান্তিতে উত্তেজনায় গোপাল মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—জ্ঞান হয়ে গোপাল দেখল স্বর্ণলতার জানুতে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে। পরদিন তারা কলিকাতায় হেমের বাসায় এসে পৌছুল। হেমচন্দ্র তখন গোপালকে তার পিতা বিপ্রদাসের ইচ্ছার কথা জানালে—স্বর্ণকে তিনি গোপালেরই হাতে সমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। গোপাল ও স্বর্ণলতার বিবাহ হল।

ওদিকে শশিভূষণ সত্য কথা বলে মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, কিন্তু তার সম্পত্তি বিক্রয় হয়ে গেছে। সে বিপিন ও কামিনী সহ এখন গোপালের আশ্রিত। প্রমদা পিত্রালয়ে। সন্তান ন্যাপালকে নিয়ে এবং বিধুভূষণ শ্যামা প্রভৃতিকে নিয়ে গোপাল-স্বর্ণলতার সুখের সংসারে হেমচন্দ্র মাঝেমাঝেই এসে থাকেন। নীলকমলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

স্বর্ণলতা ও তারকনাথের অভিজ্ঞতার ব্যবহার

স্বরচিত 'হরিষে বিষাদ' [১২৯৪ সাল] উপন্যাসের 'পরিশিষ্ট' অংশে তারকনাথ লিখেছেন, "আমি সত্যস্বরূপ বলিতেছি যে এ গ্রন্থে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার দুই-চারিটি ঘটনা ভিন্ন সমস্তই সত্য ; তবে একজনের নামে আরোপিত হইয়াছে অর্থাৎ ভেড়ার মুণ্ড ঘোড়ায় দেওয়া হইয়াছে। যদি এ গ্রন্থের নাম পূর্ব হইতে 'হরিষে বিষাদ' না রাখিতাম তাহা হইলে 'ভেড়ার মুণ্ড ঘোড়ায়' এই রাখিতাম তাহার আর সন্দেহ নাই।"

এই উক্তি থেকে উপন্যাসে নিজের অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যবহারের তারকনাথের দৃষ্টিভঙ্গিটি সহজেই বোঝা যায়। 'স্বর্ণলতা'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে হোরেস ও তথাকথিত হরিবংশের যে দুটি ছত্র motto হিসাবে উৎকীর্ণ ছিল তা থেকে স্পষ্ট যে সত্য ছিল তারকনাথের অন্বিষ্ট,—সত্যের উপস্থাপনা তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এ সত্য ভাবনালোকে বিচরিত সত্য নয়, গ্রন্থের শ্রুতিলোক থেকে উপাদান নিয়ে একে নির্মাণ করা যায় না—এ সত্যকে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় অধিকার করতে হয়, চোখে দেখে, কানে শুনে--লোকপ্রজ্ঞার সহজ পথটি অনুধাবন করে। ভাবলোকের বাইরে যে সুপ্রত্যয় বস্তুসত্য, তাকে গ্রহণ করেই তারকনাথ তাঁর সত্যসন্ধিৎসা চরিতার্থ করলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এ সত্য কোনো প্লেটনিক বিমূর্ত সত্তা নয়। সুতরাং তাঁর বাঞ্ছিত ঐ 'সত্যে'র সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকার জন্য তারকনাথ সোজাসুজি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গ্রন্থে ব্যবহার করলেন, শেক্স্‌পীয়ার-কথিত কবিদের মতো 'the airy nothing'-কে 'a local habitation and a name' দিয়ে নাম-রূপাশ্রিত করেই তৃপ্ত রইলেন না শুধু,—প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্রের পিছনে তার বাস্তব প্রচ্ছায়া রেখে দিলেন। এ উপন্যাসকারদের চিরাচরিত কৌশল, তারকনাথ খুব

বৈপ্লবিকরূপে স্বতন্ত্র পথ ধরেন নি। সুতরাং নিজের ডায়েরিতে তিনি যে লিখেছেন—'Some characters of my novel are from the real life' : [11 July, 1873].—এ সমস্ত ঔপন্যাসিকেরই কথা। ফ্লবেরের 'মাদাম বোভারি' [1857], Delamare নামে রুয়েঁ-র [Rouen] এক গ্রাম্য ডাক্তার এবং তার শিথিলচিত্ত স্ত্রীর ব্যক্তিগত ট্রাজেডির উপাদান নিয়ে লেখা। জেন অস্টেন তাঁর 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস' উপন্যাসে এলিজাবেথ চরিত্রটি এঁকেছেন নিজের ছায়ায়; জেন বেনেট চরিত্রটিকে তাঁর বোন কাসান্দ্রাকে মনে রেখে। তারকনাথের গুরু ডিকেন্সের কথাই ধরা যাক। তাঁর 'ডেভিড কপারফিল্ড' উপন্যাসে এই ধরনের স্বাভিজ্ঞতালব্ধ চরিত্র প্রচুর। মিঃ মিকোবারের চরিত্র ডিকেন্স নিজের বাবার আদলে এঁকেছিলেন। ডোরার চরিত্রটি নেওয়া তাঁর প্রথম প্রণয়িনী মারিয়া বীডনেল [Maria Beadnell] থেকে। অ্যাগ্‌নেস চরিত্রটি জনৈকা মেরি হগার্থ এবং ডিকেন্সের নিজের বোন জর্জিকে মিশিয়ে তৈরী। দৃষ্টান্ত অন্তহীনভাবে বাড়ানো চলে। সুতরাং কেবল দীনবন্ধু নন, স্বদেশ-বিদেশের বহু ঔপন্যাসিক-নাট্যকারের সঙ্গে রচনায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ-বিষয়ে তারকনাথের তুলনা করা চলে।

বস্তুতঃ, তারকনাথের ভূয়োদর্শন এ ব্যাপারে তাঁকে কম সাহায্য করে নি। তাঁর কর্মজীবন ছিল ভ্রাম্যমাণ বহুচারিতার—উত্তরবঙ্গের নানা অঞ্চলে কার্যোপলক্ষে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হত। বিচিত্র স্থানে বিচিত্র মানুষ ও ঘটনার সংস্পর্শ তাঁর লোকচরিত্রের জ্ঞান ও লৌকিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করে তোলে। 'স্বর্ণলতা'র রচনা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :—

> "সরকারী কার্যে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্যটন করিতে হইত এবং এই সময়ই স্বর্ণলতা রচিত হয়। পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ি জোটে না, সুতরাং গোরুর গাড়িই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোন বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিয়দ্দূরে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ সদ্য-নির্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তারবাবু গোরুর গাড়ির তলায় সতরঞ্চ বিছাইয়া স্বর্ণলতা লিখিতেছেন। স্বর্ণলতার অধিকাংশ এইরূপে গোরুর গাড়ির তলায় রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল।"[১]

এই নিত্যপর্যটনে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছিল তাঁর অননুকরণীয়

১। 'দাসী', আগষ্ট, ১৮৯৬

পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা। এই বস্তু-অনুবিদ্ধ স্থিরদৃষ্টি বিশেষভাবে ডিকেন্সীয়। তারকনাথ দু-একটি তুচ্ছ তথ্যের সাহায্যে একটি মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পাঠ করতে পারেন,—নীলকমলের বর্ণনাটি থেকে সহজেই তাঁর এই শক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। 'স্বর্ণলতা'র অধিকাংশ চরিত্রের বিশ্বাস্য বাস্তবতাই তারকনাথের লোকচরিত্রে গভীর অধ্যবসায় ও প্রবেশের সাক্ষ্য দেয়। মার্কিন দার্শনিক জর্জ স্যাণ্টায়ানা ডিকেন্স সম্বন্ধে বলেছিলেন, '[He is a] Supreme mimic of people as they really are'. লোকচরিত্রানুকরণ বা mimicry-র এই গুণ ডিকেন্স শিষ্য তারকনাথেও রিক্থ-রূপে সমর্পিত হয়েছে দেখা যায়।

'স্বর্ণলতা'র প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের যে বাস্তব ভিত্তি আছে, একথা তারকনাথের নিজস্ব রোজনামচা থেকেই জানা যায়। 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩২৯ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে এই ইংরেজী রোজনামচার কিছু উদ্ধৃত করা হয়েছিলে। তাতেই তিনি লেখেন যে……'Some characters of my novel are from the real life……My friends Suresh and Paresh two figures [figure ?] under the name of Ramesh and Debesh , 11th July, 1873. এই উক্তিটি একটু বিস্ময়কর লাগে। রমেশ নামে 'স্বর্ণলতা'য় একটি চরিত্র আছে—সে এই কাহিনীর অন্যতম Villain বা খলচরিত্র। তারকনাথ একজন বন্ধুকে ['my friend কথাটি নিশ্চয়ই ব্যঙ্গাত্মক প্রয়োগ নয়!] একটি ঘৃণিত খলচরিত্ররূপে আঁকবেন, এটা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি অস্বাভাবিক ঐ দেবেশ নামে আরেকটি চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। 'স্বর্ণলতা'য় দেবেশ নামে কোনো চরিত্রই নেই—অথচ তারকনাথ পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঐ দুটি বন্ধুর নাম একত্র উল্লেখ করেছেন,[১] যেন তাঁরা দুটি সহোদর।

সরলা চরিত্রটির বাস্তব আভাস সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তির পত্নী ছিলেন—ব্যক্তিগতভাবে তারকনাথ তাঁর তিল তিল করে মৃত্যু লক্ষ্য করেছেন। সরলা কাল্পনিক চরিত্র নয়—তারকনাথের

---

১. শেষ মুহূর্তে সন্দেহ হচ্ছে হয়-তো এই নাম দুটি রোজনামচা লেখার পর তারকনাথ উপন্যাসে বদলে দিয়েছেন। শশিভূষণ-বিধুভূষণের বাস্তব নামই কি ছিল রমেশ-দেবেশ? অথচ রমেশ মালদহ থানার দারোগা ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, আর শশিভূষণের উৎসও ভিন্ন? এ সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

মতো লেখকদের পক্ষে 'কাল্পনিক' চরিত্রকে এতদূর জীবন্ত ও 'বাস্তব' করে তোলা দুরূহ। বরং স্বর্ণলতা সে তুলনায় অনেক কাল্পনিক। সরলার চলন-বলন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয় ও মৃত্যু—সবই এমন নিকট অনুভবের মতো পাই যে, তার একটি আদল বা prototype না-থাকাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কোনো সত্য দৃষ্টান্ত না থাকলে যক্ষ্মা রোগের বর্ণনা অত বিশ্বাসযোগ্য করা সম্ভব নয়—তাও 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ প্রকাশিত রোগ-বর্ণনাকে তারকনাথ গ্রন্থে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

শশিভূষণ মালদহের কোনো নবীন জমিদারের নায়েব ছিলেন। এবং শশিভূষণের সম্পূর্ণ আখ্যান—জমিদারের তহবিল থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে অট্টালিকা ও গৃহিণীর অলঙ্কার-নির্মাণ; পরে পুলিশের হাঙ্গামায় স্ত্রীর শরণ নেওয়া, স্ত্রীর অর্থদানে সম্পূর্ণ বিমুখতা ও সর্বশেষে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ—সমস্তই সত্য ঘটনা। গদাধর রাজশাহীর এক জমিদারের 'পেট মোটা গলা সরু' কিম্ভূতদর্শন শ্যালক। সে জমিদারের শ্যালক-পরিচয়ে গর্ব প্রকাশ করত এবং অন্যের রেজিস্ট্রি চিঠিতে জাল সই করে কারাবাস লাভ করেছিল। নীলকমল তারকনাথের নিজের গ্রামেরই গোপজাতীয় ক্যাপাগোছের লোক ছিল। বেহালাবাদনে তার যৎকিঞ্চিৎ দক্ষতা সত্যসত্যই ছিল। নীলকমলের মতো তারও মত ছিল 'ন বিদ্যা সংগীতাৎ পরা'—লেখাপড়াকে সে একটু বিশেষ অবজ্ঞার চোখে দেখত। 'পাপিষ্ঠা প্রমদার চিত্র তারকনাথের কোন পরিচিত ব্যক্তির পত্নীর চিত্র।' 'জ্ঞানাঙ্কুর'-পত্রিকায় তার চরিত্র মুদ্রিত উপন্যাসের চেয়ে আরো কালিমালিপ্ত ও ভয়াবহ ছিল। দিগম্বরী ঠাকরুণ তারকনাথের স্বগ্রামেরই এক দুর্ধর্ষ ও জাঁদরেল মহিলা। তারকনাথ সুহৃদ্‌বর্গের কাছে বলেছেন; 'ঠাকরুণদিদির রূপ ও গুণের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা এক বর্ণও অত্যুক্তি করি নাই, যেমনটি দেখিয়াছি, সেইরূপই ফটো তুলিয়াছি।' গুরুদেব শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি ছিলেন রংপুর জেলার এক স্কুলের পণ্ডিত। কোনো জমিদারের নায়েবের প্রলোভনে এই কূটবুদ্ধি ব্যক্তি জনৈক গৃহস্থের অনূঢ়া মেয়েকে নিজের বাড়িতে বন্দী রেখে বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে বিবাহ দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন।

এই গেল 'স্বর্ণলতা'র কুশীলবের তালিকা—তারকনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে যাদের সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া আছে ছোটোখাটো ঘটনা। মুদিনীর আখ্যানটি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারকনাথ ১৮৭৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারির ডায়েরিতে লিখছেন,—"Started from Tetalyah (Rajshahi) in the morning. Break-fasted at Bhagwanpore and passed the night in a **mudikhana** ; moody altogether a good man, but moodini a troublesome woman." দিনাজপুরে পৌঁছে ইন্দ্রনাথের কাছে মুদিখানার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময়, তিনিই এ আখ্যানটিকে 'স্বর্ণলতা'র অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন।

শ্যামা, বিধুভূষণ, গোপাল, হেমচন্দ্র, স্বর্ণলতা ইত্যাদি প্রধান চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তারকনাথ তাদের উৎস নিয়ে কিছু বলেছেন বা লিখেছেন বলে জানা যায় না। বিশেষভাবে শ্যামা সম্বন্ধে তারকনাথের নিরুচ্চার থাকা আমাদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি বলেই মনে হয়, কেন না, স্বদেশে এবং বিদেশে 'স্বর্ণলতা'র পাঠকবর্গ শ্যামাকে অন্যতম আদরণীয় চরিত্রের সম্মান দিয়েছেন। শ্যামা এবং বিধুভূষণ ছাড়া বাকী তিনটি প্রধান চরিত্র খানিকটা আদর্শায়িত এবং বায়বীয়, মনে হয় এদের পিছনে তারকনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থন কম। এরা অধিকাংশেই কাল্পনিক। সরলা যে কাল্পনিক নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ চরিত্রটিকে তারকনাথ তাঁর সম্পূর্ণ মমতা দিয়ে এঁকেছেন, ফলে সরলার সুখেদুঃখে তিনি নিজেই অত্যন্ত জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। সরলার মর্মস্পর্শী মৃত্যুদৃশ্য রচনা করে তিনি রোজনামচায় লিখেছিলেন :—"I am very sorry and shed tears for the death of Sarala. Very sorry to part with her. I feel as if I am a murderer ! What an awful thing death is." [21st June, 1873.] রুশ ঔপন্যাসিক টুর্গেনেভ তাঁর 'Father and Sons' [১৮৬২] উপন্যাসের নায়ক নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী বাজারভ-এর মৃত্যুতে এইরকম বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বলে শোনা যায়। 'মাদাম বোভারি' উপন্যাসের নায়িকা এম্মা বোভারির আত্মহত্যার দৃশ্য রচনা করে পথে বেরিয়ে ফ্লবের তাঁর এক বন্ধুকে দেখেই উত্তেজিতভাবে বলেছিলেন, 'জানো, জানো, এম্মা মারা গেছে আজ।' বন্ধুটি তো হতবাক ! কিংবা আমাদেরই ঘনিষ্ঠ মধুসূদনের দৃষ্টান্ত তো সকলেরই জানা। মেঘনাদের মৃত্যু সমাধা করে লিখেছিলেন, ..."It was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish him. Thank Heavan, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI. Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill

him." [রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি]। সরলার মৃত্যু সেকালের একজন বিশিষ্ট পাঠককে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সঙ্গে তারকনাথের বকসারে সাক্ষাৎ হয়। তিনি লেখককে বলেছিলেন—"বেচারা সরলাকে তিলে তিলে না মারিয়া তাহাকে বাঁচাইলেই সব দিক দিয়া রক্ষা হইত।" অশ্রুবিসর্জনের সূত্রে লেখক-পাঠকের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল।

'স্বর্ণলতা'র প্রকাশ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলার আছে। ১৮৭৩ সালের ৭ই জুলাই 'স্বর্ণলতা' রচনা সমাপ্ত হয়। শেষ করে তাঁর 'হরিষে বিষাদ' উপস্থিত হয়েছিল এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন, কিন্তু এই 'হরিষে বিষাদ'-এর যে-কারণটি তাঁরা দিয়েছেন সেটি অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। তাঁদের মতে 'স্বর্ণলতা'য় প্রিয় ও পরিচিত বন্ধুবান্ধবের জীবন প্রতিবিম্বিত হওয়ায় এ গ্রন্থের প্রকাশে লেখক তাঁদের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়বেন, তাই ক্ষুব্ধ ও অপ্রসন্ন বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় তিনি নাকি বিমর্ষ হয়ে থাকতেন। 'স্বর্ণলতা'য় তারকনাথের দু-একজন পরিচিত ব্যক্তির জীবনের আভাস বা প্রতিফলন আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ চরিত্রই যে তাঁর পর্যটনজাত অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া—তারকনাথের অকস্মাৎ-আহৃত সম্পত্তি—এ তো আমরা আলোচনাতেই দেখেছি। আসলে তারকনাথের একদিনের রোজনামচাই এইসব সমালোচকদের প্রতারিত করেছে। রোজনামচাটি এইরকম—"Finished my tale (Swarnalata) in the evening at 8 p. m. It was melancholy pleasure to see it completed as I was to part company with my friends for ever." [Monday, 7th July, 1873]. যদি বন্ধুবিচ্ছেদের চিন্তাই তারকনাথকে সব সময় বিব্রত ও বিষণ্ণ করে রাখবে, তাহলে এ-কথাটা তাঁর উপন্যাস রচনার আদিতে বা মধ্যে কোথাও মনে হল না কেন? কেন তিনি সৃষ্টির উত্তেজনায় বন্ধুদের জীবন যথেচ্ছ চিত্রিত করে (!) উপন্যাসের শেষে বিষণ্ণ হওয়ার প্রতীক্ষা করলেন? এ গ্রন্থে যাঁদের চরিত্রে ক্রোধ জন্মায় তাঁরা কেউ কি তারকনাথের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন? শশিভূষণ কি তাঁর বন্ধু? শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি? রমেশ কন্স্টেবল? তাহলে কোন্ বন্ধুদের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন? অথচ তাঁর ২৩শে জুনের ডায়েরিতে দেখি তিনি লিখেছেন, 'Thinking of printing my book Swarnalata on my own account'. বই লেখা

শেষ হওয়ার প্রায় এক পক্ষকাল আগে যখন তিনি স্বাধীনভাবে 'স্বর্ণলতা' ছাপার সঙ্কল্প করেন, তখন তাঁর ঐ বন্ধুবিচ্ছেদের নৈরাশ্যচিন্তা কোথায় ছিল?

ব্যাপারটি আসলে সম্পূর্ণ অন্যরকম। 'স্বর্ণলতা'র যে-চরিত্রগুলি তাঁর এতদিনকার সুখদুঃখের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিল তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের করুণ সম্ভাবনাই তারকনাথকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। তাঁর বহু দিনকার আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, বেদনা ও উত্তেজনার অংশভাক্ ঐ চরিত্রগুলি তাঁর আত্মীয় হয়ে পড়েছিল, উপন্যাসের উপসংহারে তাদের বিদায় দিতে হবে—লেখকের অধিকার থেকে তারা পাঠকের অধিকারে গৃহীত হবে—সেই দুর্ভাবনাই তারকনাথকে ক্লিষ্ট করে তুলেছিল। 'স্বর্ণলতা'য় সরলার মৃত্যু প্রসঙ্গেও তিনি লিখেছেন—'Verry sorry to part with her'. আবার উপন্যাস সমাপ্ত করেও তিনি লিখছেন,—'I was to part company with friends for ever!' একই ধরনের ইংরেজী ক্রিয়াপদের ব্যবহার নিঃসন্দেহে একই ধরনের ভাবনার সূচক।

স্বর্ণলতা উপন্যাসের ধর্ম

উপন্যাসই সম্ভবত সবচেয়ে অসংহত ও শিথিলবদ্ধ সাহিত্যশাখা। এর সংজ্ঞা বিস্তৃত এবং অস্পষ্ট, শিল্পের কঠোর নিয়ম উপন্যাসের ক্ষেত্রে এসে প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফর্স্টার ফরাসী সমালোচক Abel Chevalley-র উক্তিকে অনুবাদ করে উপন্যাসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন—উপন্যাস 'a fiction in prose of a certain extent,'—তাতেই ঐ অস্পষ্টতা এবং অসম্বদ্ধতা প্রকট। উপন্যাস গদ্যে রচিত মানব-কথা—এ না হয় মানা গেল, কিন্তু তার আকারটি যথার্থ কী হওয়া দরকার। টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যাণ্ড পীস' বা হেরম্যান্ মেলভিল্-এর 'মবি ডিক'—বিশালকায় এবং উপন্যাস; আবার আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'The old Man and the Sea' কিংবা আলবেঅর কামুর The Fall—ক্ষুদ্রকায়, অথচ উপন্যাস। এদের মাঝামাঝি যাদের অবস্থান—ধরা যাক জেন অস্টেনের 'Pride and Prejudice' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'—তাও উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে[১]; আয়তনের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই তাঁর কাছে

১. 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত।

উপন্যাসের আদর্শ, কিন্তু এই যুক্তিতে মহাকায় উপন্যাসগুলিকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা কি কারো হবে? অর্থাৎ উপন্যাসসৃষ্টির প্রায় আড়াই শো বৎসরের[২] মধ্যে তার কোনো আয়তন নির্দিষ্ট করা গেল না। হেগেল যে-অর্থে উপন্যাসকে এ যুগের মহাকাব্য বলেছিলেন সে-অর্থে উপন্যাসকে লঘুকায় বলে মনে করতে ভালো লাগে না। বস্তুত হেনরি ফিল্ডিং, টলস্টয়, হেরমান মেলভিল, রোমা রোলাঁ, টমাস মান প্রভৃতি কয়েকজন তাঁদের একটি-দুটি উপন্যাসে ঐ মহাকাব্যিক বিস্তারকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন জীবনের বহুলতা, বৈচিত্র্য, গভীরতা ও সর্বাঙ্গীণতা উপন্যাসের আধারে আশ্রিত করে। কিন্তু এঁরাই আবার সংক্ষিপ্ততর উপন্যাসও লিখেছেন —টলস্টয়ের যেমন 'Anna Karenina। সুতরাং আয়তনের মধ্যে উপন্যাসের ধর্ম সন্ধান করা মূঢ়তা। শুধু একটি ব্যাপারে ফর্স্টারের নির্দেশ মানা চলে—যে মানবকাহিনীতে ৫০০০০-এর কম শব্দ আছে, তাকে উপন্যাস বলা চলবে না।

তবে উপন্যাসের লক্ষণ কোথায়? কী তার রূপ? প্রত্যেক শিল্পের যেমন কতকগুলি নির্দিষ্ট সুনিয়ম আছে—যা লঙ্ঘন করে সে-সব শিল্প ধর্মচ্যুত ও চরিত্রভ্রষ্ট হয়—উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কি সে-রকম বাঁধাধরা কোনো রীতি আছে? উপন্যাস কি নাটকের মতো সংহত হবে না কি ইতিহাসের মতো আলুলায়িত? তার গতি দ্রুত হবে না ধীর হবে? ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন উঠেছে।

আসলে বহু উপাদানের একত্র মিশ্রণের ফলে উপন্যাসের এমন একটি সঙ্কর চরিত্র গড়ে উঠেছে যে তার একটি কেন্দ্রগত ধর্ম খুঁজে পাওয়া দুরূহ। এই সর্ববহ সাহিত্যরূপে কাব্যের স্থান আছে, নাটকীয়তার স্থান আছে; সমাজ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির তথ্যাবলীর স্থান আছে; তা চিত্রল হতে পারে, সুরপ্রবাহিত হতে পারে,—অর্থাৎ মানবসংক্রান্ত যাবতীয় উপাদান এবং মানুষের যাবতীয় শিল্পের ভঙ্গিকে উপন্যাসের মধ্যে ভরে দেওয়া যায়। এমন সর্বব্যাপী যার অধিকার—সেই সাহিত্যরূপের শ্রেণীবিভাগ করা সহজ নয়। আরো সহজ নয় এই কারণে যে উপন্যাস জনপ্রিয়তম সাহিত্যরূপ—প্রতি ঋতুতে সহস্র সহস্র উপন্যাসের জন্মমৃত্যু ঘটছে নানা দেশে,—তার মধ্য থেকে নির্বাচন করা এক দুঃসাধ্য কাজ। তবু প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু উপন্যাসের মধ্য থেকে বেছে কেউ কেউ ঐ দুঃসাধ্য কাজটিই নিষ্পন্ন করেছেন। শ্রীযুক্ত

২. জাপানে যদিও উপন্যাসজাতীয় রচনা দ্বাদশ শতাব্দীতেই রচিত হয়েছে!

এডুইন মুর তাঁদের অন্যতম। তাঁর 'The Structure of the Novel' গ্রন্থে তিনি উপন্যাসকে ঘটনানির্ভর (Novels of action), চরিত্রনির্ভর (Novels of character), নাটকীয়তা-নির্ভর বা নাট্য-নির্ভর (The Dramatic Novel), ইতিবৃত্ত-নির্ভর বা কালানুক্রমিক (The chronicle) —মূলত এই চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে এই সমালোচক মূলত উপন্যাসিকের উপায় বা পদ্ধতির বিচার করেছেন, উপাদানের বিচার করেন নি। Edwin Muir সাহেবকে Percy Lubbock সাহেবের চেয়ে উদারনীতিসম্পন্ন বলে আমাদের মনে হয়, কেননা মুর যেখানে উপন্যাসের নানা রীতিকে মেনে নিয়েছেন সেখানে Lubbock উপন্যাসের একটি আদর্শ রূপ ভেবে নিয়েছেন—যা থেকে বিচ্যুত হলে তিনি টলস্টয়কেও ক্ষমা করেন না। Lubbock 'War and Peace' উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে যদিও উপন্যাসের 'form' জিনিসটা থাকা একান্তই দরকার তবুও, অন্তত এক্ষেত্রে "We have a magnificent novel without it.[১] অথচ নিজেই দেখিয়েছেন যে এ উপন্যাসের গাঁথুনিতে বেশ দুর্বলতাই রয়েছে।

উপন্যাসের বিভাগ অসংখ্য হতে পারে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এই অর্থহীন classification-প্রবণতাকে ফর্স্টার নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর 'Aspects of the Novel' পুস্তিকার প্রথম দিকে।

যাই হোক, Muir-এর নির্দেশই আমরা মানছি। ঘটনা-প্রধান বা 'প্লট'-প্রধান উপন্যাস এবং 'চরিত্রপ্রধান' উপন্যাসের মধ্যেই বেশির ভাগ উপন্যাস এসে পড়ে। 'স্বর্ণলতা'র আলোচনায় আমাদের বিশেষ করে এই দু ধরনের উপন্যাসের কথা মনে রাখতে হবে।

এখন, উপন্যাসের রূপ বা রীতির আলোচনায় পণ্ডিতদের মধ্যে যত মতপার্থক্যই থাক না কেন, একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে ঘটনা-প্রধান বা 'প্লট-প্রধান' উপন্যাসের স্থান খুব একটা উঁচুতে নয়। কারণ এ ধরনের উপন্যাসে আমরা মানুষদের কথা ততটা জানতে চাই না যতটা জানতে চাই, কী ঘটছে তার বৃত্তান্ত। এ জাতের উপন্যাসে আমাদের একমাত্র রুদ্ধশ্বাস জিজ্ঞাসা—'তারপর?' এ ধরনের উপন্যাসের আবেদন মূলত আমাদের কৌতূহলের কাছে, হৃদয়ের কাছে নয়—কৌতূহল-তর্পণেই এ ধরনের

১. The Craft of Fiction. Page 40.

উপন্যাসের চরিতার্থতা। ফর্স্টার এ কথা বলেছেন, এবং আমরাও জানি যে কৌতূহল আমাদের মনের নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম। তাই আদিম গল্প শোনার অদম্য বাসনাকে যে-উপন্যাস শুধু তৃপ্ত করতে চায়, তারই মধ্যে ঘটনার পর ঘটনা আসে, রোমহর্ষক পরিচ্ছেদ, আকস্মিকের চমক—পর পর সাজানো থাকে। গোয়েন্দা কাহিনী বা হাস্যরসাত্মক-ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসগুলি এই ধরনের। উড্‌হাউস বা চেস্টরটনের হাসি-তামাশার উপন্যাস খুবই ভালো,—চেস্টরটনের লেখায় একটি গভীর জীবন-প্রত্যয়েরও আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু এগুলি কোনো অর্থেই মহৎ উপন্যাস নয়। কিন্তু 'চরিত্র-প্রধান' উপন্যাস অনায়াসেই সে বাঞ্ছিত মহত্ত্ব অর্জন করতে পারে, কেন না ঐ জাতীয় উপন্যাসে আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্তি লাভ করে। অবশ্য ঘটনা-প্রধান উপন্যাসে চরিত্রায়ণ-বর্জিত, বা চরিত্রপ্রধান উপন্যাস ঘটনাশূন্য হবে—এ ধারণা ভুল—ঘটনা বা চরিত্র দুয়ের আপেক্ষিক প্রাধান্যেই উপন্যাসের জাতি নির্ণীত হয়ে থাকে।

'স্বর্ণলতা'কে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাবে? 'ভূমিকা'তে বলা হয়েছে যে 'স্বর্ণলতা'র দুটি কাহিনী আছে—প্রথম কাহিনীর নায়িকা সরলা, দ্বিতীয়টিতে নায়িকা স্বর্ণলতা সরলার মৃত্যুতে—উপন্যাসের প্রথম খণ্ড যেখানে সমাপ্ত হয়েছিল সেখানে—প্রথম কাহিনীটি শেষ হয়েছে। এমন নয় যে দুটি আখ্যান পারম্পর্য অনুসরণ করে উপন্যাসে এসেছে—একটির পর আরেকটির আরম্ভ হয়নি। স্বর্ণলতা আখ্যানের ক্ষীণ সূত্রপাত একাদশ পরিচ্ছেদে, ওদিকে সরলার মৃত্যু সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে। সুতরাং কিছুদূর পর্যন্ত দুটি আখ্যান সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু সরলার মৃত্যু পর্যন্ত স্বর্ণলতার কাহিনী তেমন প্রাধান্যলাভ করেনি—একাদশ এবং উনবিংশ—এই দুটিমাত্র পরিচ্ছেদে আমরা স্বর্ণলতার সাক্ষাৎ পাই, আবার ঐ আখ্যানের আভাস পাই ত্রিংশ পরিচ্ছেদে। সুতরাং সরলার মৃত্যু পর্যন্ত উপন্যাসের যে-ঘটনা-স্রোত, তার মধ্যে একটি অব্যাহত শান্ত গতি লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার আন্দোলন পারিবারিক ঈর্ষা-কলহের উপরে ওঠে নি। প্রমদার হৃদয়হীনতা, ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতা, শশিভূষণের দুর্বলচিত্ততা কিংবা গদাধরের অর্থলোভের সংবাদ পাওয়া গেছে, কিন্তু একমাত্র বিংশ ও ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ছাড়া কাহিনীর সামগ্রিক আবহাওয়া খুব একটা উত্তাল হতে পারে নি। বিংশ পরিচ্ছেদে গদাধরের টাকা চুরির ঘটনাও উপন্যাসের পারিবারিক চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি।

কিন্তু ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদেই নৈর্ঋত কোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রমেশ ও গদাধরের মধ্যে একটি ষড়্‌যন্ত্রের আভাস পাওয়া গেল—তাতেই স্পষ্ট হল যে গদাধর যে বিংশ পরিচ্ছেদে টাকা চুরি করেছে কিংবা পরে গোপালের স্বাক্ষর জাল করে বিধুভূষণ প্রেরিত টাকা আত্মসাৎ করেছে, তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা গদাধরের স্বাধীন উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত ব্যাপার নয়—তার পিছনে কখনও প্রমদা কখনও রমেশের প্ররোচনা এবং তার মায়ের সমর্থন আছে। গদাধর রমেশকে বলেছে—"এখন ছ-শ টাকার চার-শ টোমাকে দিলে আমার ঠাকে কি? আর টার মধ্যে ঠেকে ডিডিকে ডিটে হবে?" ভাঙা সিন্দুক থেকে টাকা চুরির সময় কেবল প্রমদা, গদাধর ও গদাধর-জননী—এই তিনজনে মিলে চৌরসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী অপরাধে গদাধর রমেশ কনস্টেবলকেও দলে টেনেছে। সরলার মৃত্যু পর্যন্ত এই দলের কার্যকলাপে তেমন-কিছু প্রচণ্ডতা আসেনি বলে উপন্যাসের কাহিনীস্রোতে প্রবল আবর্তন বা আলোড়ন দেখা দেয়নি। আরেকটি অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেছে, সেটি শশিভূষণের। সে জমিদারের কাছারি থেকে অবৈধভাবে অর্থ আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদের আগে তা নিয়েও ঘটনাস্রোত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি। তাই সরলার মৃত্যু বা উপন্যাসের প্রথম খণ্ড পর্যন্ত কাহিনী মোটামুটিভাবে সরলগতিসম্পন্ন, সরলা, শ্যামা, নীলকমল ইত্যাদি চরিত্রগুলিই পাঠকের প্রধান লক্ষ্যস্থল। ঘটনার গতি সম্বন্ধে এর মধ্যে পাঠক সচেতন হয়ে ওঠার অবকাশ পান না। আর আকর্ষণীয় বস্তু পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ঈর্ষা, কলহ, অপরাধ, সহৃদয়তা, ত্যাগ, স্নেহ, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি দোষগুণের চিত্র—যা মানুষকেই দর্শনীয় করে, ঘটনাকে নয়। অর্থাৎ 'স্বর্ণলতা'র প্রথম খণ্ডে চরিত্র ও গার্হস্থ্য-পরিবেশ—এই দুইয়ের উপরেই আমাদের অভিনিবেশ সংসক্ত থেকেছে। আমরা সরলার সুখ-দুঃখে, শ্যামার সহৃদয়তায়, নীলকমলের করুণ আত্মম্ভরিতায় আরও বেশি মগ্ন হতে চেয়েছি। পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে যখন বিধুভূষণ-নীলকমল প্রসঙ্গ হঠাৎ শেষ হয়ে শশিভূষণের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হল তখন যে আমাদের বিরক্তি জন্মায় তার কারণ ঐ চরিত্রের প্রতি আমাদের মমতা। এখানে মনে হল ঘটনা এসে চরিত্রের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। তার আগে পর্যন্ত উপন্যাসের অগ্রগতি সন্তোষজনকভাবে মন্থর—তা আমাদের খুব বেশি উৎপীড়িত করে না।

কিন্তু তার পরেই--বাকী দশ পরিচ্ছেদ ধরলে তারই মধ্যে—[এমন কি চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদেও গোপাল-স্বর্ণলতার উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ-ব্যাকুলতা নিয়েই একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ—ঘটনা কিছুই নেই]—অসংখ্য ঘটনা ঘটে গেছে। শশিভূষণের চুরি ধরা পড়েছে, হেমচন্দ্র কঠিন বসন্ত রোগে পীড়িত হয়েছে, স্বর্ণলতা শশাঙ্কের হাতে বন্দিনী হয়েছে এবং বন্ধনদশা থেকে উদ্ধারের জন্য গোপালকে চিঠি লিখেছে, তার মুক্তির জন্য বিপুল বাধা অতিক্রম করেও গোপাল যথাসময়ে শ্রীরামপুর পৌছাতে পারেনি, শশাঙ্কের চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লেগেছে, রাক্ষসী প্রমদা শশিভূষণকে শেষ সহায়তা পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে, শশিভূষণ ম্যানেজারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, প্রমদা ঝঞ্ঝাপ্লাবনে গহনার বাক্স হারিয়েছে, শশাঙ্ক নিজের কুঠারাঘাতে নিজেই মরেছে, রমেশ ও গদাধরের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, গোপাল আকস্মিকভাবে স্বর্ণলতার সন্ধান পেয়েছে এবং উপসংহারে Poetic Justice সকলের প্রতি সমভাবে বিতরিত হয়েছে। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ ঘটনার দ্বারা রুদ্ধশ্বাস—এক একটি পরিচ্ছেদে একাধিক ঘটনার উপর্যুপরি অভিঘাত। কোনো পরিচ্ছেদ নিরর্থক বা ভারহীন নয়, যেন ত্রিশ-বত্রিশ পরিচ্ছেদ অকৃপণভাবে ব্যয় করবার পর লেখক অকস্মাৎ 'সময় আমার নাই যে বাকী' ভেবে উচ্চকিত হয়ে উঠেছেন এবং অসংযত অমিতব্যয়ীর মতো প্রতি পরিচ্ছেদের মধ্য থেকে ঘটনার চূড়ান্ত উত্তেজনা নিংড়ে নেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। নইলে গ্রন্থের একেবারে শেষ দিকে এত আশাতিরিক্ত ঘটনাসম্পাত কেন? একেই কি Edwin Muir বলেছেন,..."a fantasy of desire rather than a picture of life"? উপন্যাসের প্রথমদিকের সঙ্গে শেষদিকের কি আশ্চর্য বিসদৃশতা! সেখানে একটি পরিচ্ছেদে [পঞ্চম] দেখি, পাড়ার যাত্রার আসরে শ্যামার বিধুভূষণকে ডাকতে যাওয়া এবং সরলার নিদ্রা—এ ছাড়া আর কোনো ঘটনাই ঘটছে না; আর কে না স্বীকার করবেন যে এ দুটি ঘটনার একটিও রোমহর্ষক নয়, এদের নিয়ে আলাদা পরিচ্ছেদ রচনার কোনো প্রয়োজনই ছিল না? কিংবা তৃতীয় পরিচ্ছেদে সরলা-গোপালের পারস্পরিক স্নেহ-সোহাগ নিয়েই কি একটি পৃথক পরিচ্ছেদ-বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল? প্রথমদিকের পরিচ্ছেদগুলিও ঘটনাবিরল, সে তুলনায় শেষদিকের পরিচ্ছেদগুলিকে অস্বাভাবিক ও অসুস্থ বেগসম্পন্ন বলে মনে হয়।

বলা যেতে পারে যে শেষদিকে ঘটনার এই যে প্রচণ্ডতা, তার জন্য প্রথম

দিকেই তো প্রস্তুতি ছিল। ছিল, কিন্তু উপন্যাসের প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশের বহু ঘটনার মধ্যে কেবলমাত্র দুটি ঘটনার জন্য দায়ী—শশিভূষণের বিপদ্‌গ্রস্ততা এবং রমেশ ও গদাধরের শাস্তি। এই দুটি ক্ষেত্রে দ্বিতীয়াংশের ঘটনা প্রথমাংশের ঘটনার পরিণাম হিসাবে এসেছে। কিন্তু বাকী ঘটনার প্রাদুর্ভাব যেমনই আকস্মিক, তেমনই অবিশ্বাস্য। প্রমদা এত নিষ্ঠুর হল কেন? সে আর তার মা পালালোই যদি তো ঝড়বৃষ্টির উত্তাল বিক্ষোভের মধ্যে পড়ল কেন? যদিই বা পড়ল, শুধু গহনার বাক্স হারিয়ে তারা অক্ষত রইল কেন? [অন্তত এই সুযোগে লেখক প্রমদার মাকে ধরাধাম থেকে বিদায় দিয়ে আমাদের সুখী করতে পারতেন!] স্বর্ণলতাকে শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি বন্দী করল কেন? হেমের হঠাৎ বসন্তের আক্রমণ ঘটল কেন? স্বর্ণের চিঠি গোপালের কাছে দেরিতে পৌছাল কেন? গোপাল যথাসময়ে ট্রেন ধরতে পারল না কেন? যে-ট্রেন ধরল তাতে ঘুমিয়ে পড়ে বর্ধমান চলে গেল কেন? শশাঙ্কের চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগল কেন? সে অমন বীভৎসভাবে মরল কেন? গোপাল স্বর্ণকে হারিয়ে আবার অকস্মাৎ পেল কীভাবে?—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর লেখক দেননি এমন নয়, কিন্তু সে উত্তরের বেশির ভাগই দুর্বল ও সন্দিগ্ধ। এইসব ঘটনার জন্য গ্রন্থের প্রথমাংশে লেখক আমাদের প্রস্তুত করেন নি, ফলে দীর্ঘ মন্থর নদীতে নৌকা স্বচ্ছন্দগতিতে ভেসে এসে হঠাৎ আবর্তের মুখে পড়লে যে-রকম দিশেহারা হয়ে যায়—এ উপন্যাসের লক্ষ্যেরও সেই রকম দশা ঘটেছে। ঘটনার ক্লাইম্যাক্স একেবারে শেষদিকে অধিষ্ঠিত হওয়ায় ভারসাম্যচ্যুতি ঘটেছে উপন্যাসের। চরিত্রের সম্মান সর্বাপেক্ষা বেশি, আধুনিক উপন্যাসে ঘটনা তার কৌলীন্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে, সুতরাং যে উপন্যাস চরিত্রপ্রাধান্য থেকে ঘটনাপ্রাধান্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাকে সহজে মার্জনা করা যায় না। উপন্যাসের শেষ দিকে ঘটনা কীভাবে চরিত্রের স্বভাববিবর্তনকে বাধা দেয়, ফর্স্টার তার চমৎকার বিবরণ দিয়ে বলেছেন—"In the losing battle that the plot fights with the characters, it often takes a cowardly revenge. Nearly all novels are feeble at the end" তার কারণ—"Incidents and people that occured at first for their own sake now have to contribute to the denouement." পালা সাঙ্গ করতে হবে, ঘটনাগুলিকে গুছিয়ে আনতে হবে, সুতরাং সহজ গতিকে নষ্ট করে

প্লটের অন্তিম প্রাধান্য শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয় অনেক লেখককেই তারকনাথের অপরাধের তুলনা নেই এমন নয়। গোপালের স্বর্ণলতা মিলেছে [...that bad use of marriage as a finale—Forster], এবং এই স্বর্ণপ্রাপ্তির জন্যই লেখক তার সম্মুখে নানা অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত করেছেন। বাংলা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে [১৯০৩] সর্বপ্রথম প্লট-প্রাধান্য থেকে চরিত্র-প্রাধান্যে উত্তীর্ণ হয়, এবং তার পর থেকে উপন্যাসের প্লটকে খুব কম লেখকই সমীহ করে চলেন। 'চোখের বালি'র উপসংহার সম্বন্ধে যে আমাদের ক্ষোভ আছে তারও মূলে ঐ প্লটের প্রতিশোধ। 'চোখের বালি' প্রকাশের চল্লিশ বছর আগে 'স্বর্ণলতা'র প্রকাশ—তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্লটের নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য চলছে। তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পৃথক হওয়ার চেষ্টা করে যতখানি সফল হয়েছিলেন ততখানির জন্য তিনি অবশ্যই অভিনন্দনীয়।

তা ছাড়া, দশম, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, চতুর্বিংশ ইত্যাদি পরিচ্ছেদে, ভ্রাম্যমাণ বিধুভূষণ ও নীলকমলের অভিজ্ঞতায় কিছু picaresque লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। দশম পরিচ্ছেদের টীকা-টীপ্পনী দ্রষ্টব্য।

তবে একথাও ঠিক যে তত্ত্বের খাতিরে চরিত্রপ্রধান ও ঘটনাপ্রধান উপন্যাসকে যত সহজে আলাদা করা সম্ভব, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। প্রায়ই এ দুধরনের উপন্যাস মিশে যায়। বহু ঘটনা আছে—একটি ঘটনা থেকে আরেকটিতে উত্তরণ ঘটছে, সুখময় পরিসমাপ্তির জন্য লেখক মহোল্লাসে ছুটে চলেছেন,—কিন্তু দেখা গেল, কয়েকটি বৃহৎ চরিত্র ঘটনাপ্রবাহ থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তারা ঘটনার দ্বারা পরাভূত হচ্ছে না—স্ব স্ব ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে সরলা বা নীলকমল এমন কি শ্যামা এই ধরনের চরিত্র। শেষদিকের ঘটনাবর্তে সরলার মতো একটি স্বমহিম নারীকে রাখা লেখকের পক্ষে মুশকিল হত, কেন না সে জোর করে ঘটনার উপর থেকে পাঠকের মনোযোগ নিজের উপর ফিরিয়ে আনত, তাই লেখক তাকে উপন্যাসের মাঝামাঝি এসে সকরুণচিত্তে বিদায় দিয়েছেন। নীলকমলকে মূল ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়ানই নি, আর শ্যামাও যাতে আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ঐ ঘটনাস্রোতের মধ্যে একটি বিরোধী আকর্ষণ না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য লেখক তার উপস্থিতি শেষদিকে ম্লান করে রেখেছেন। যাই হোক, চরিত্রাত্মকতা থেকে ঘটনাবহুলতায় উপন্যাসের পরিণাম লেখকের পক্ষে

প্রশংসনীয় কিছু নয়। তারকনাথ তাঁর 'হরিষে বিষাদ' উপন্যাসেও যে এইরকম ঘটনার অভিভব এনেছিলেন আগে তার উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে ঘটনা-প্রাধান্যই তখনকার উপন্যাসের চারিত্র। তারকনাথ যে অংশে তাঁর সময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন সে অংশে তিনি সার্থক, কিন্তু যে অংশে ঐ সময়ের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন সে-অংশে তাঁকে দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির থেকে পৃথক করে চিনে নেওয়া যায় না। 'স্বর্ণলতা'য় তাঁর সময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তার কাছে আত্মনিবেদন—দুয়েরই স্মৃতি আছে।

উপন্যাসের প্রথম যুগে চরিত্রসৃষ্টি

কিন্তু প্রথম যুগের উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রটিই ছিল আসলে দুর্বল। 'স্বর্ণলতা'-প্রকাশের ষোল বৎসর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যে উপন্যাসজাতীয় রচনাটি প্রকাশিত হয় তা 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং তা উপন্যাস নয়, উপন্যাসের খসড়া মাত্র। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত শ্রীমতী হেনরি ক্যাথারিন ম্যুলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-ও তাই, এবং ঐ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' দুটি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। তার কারণ, উপরিউল্লিখিত রচনাগুলিতে নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাসংস্থান বা 'প্লট'-এর আভাস নেই, যদিও সেখানে গল্প বা Story—ফর্স্টার যাকে বলেছেন, 'a narrative of events arranged in their time sequence'—তা আছে। প্লট নেই, বাংলা উপন্যাসে প্লট 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগে আসেই নি। গল্পের সঙ্গে প্লটের তফাৎ কোথায়? গল্পে একটা ঘটনার পর আরেকটা ঘটনা ঘটে, ফর্স্টার চমৎকার করে বলেছেন, —প্রাতঃরাশের পরে যেমন মধ্যাহ্ন ভোজন ; আর প্লটে একটা ঘটনার জন্যই আরেকটা ঘটনা ঘটে—আগের ঘটনার সঙ্গে পরের ঘটনার কার্যকারণ যোগ থাকে। কিন্তু প্রাক্-দুর্গেশনন্দিনী পর্বের উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে লেখকের নিশ্চেতনার আরও কারণ এই ছিল যে, তখন মূল লক্ষ্যই ছিল গল্পের উপর এবং গল্পের উদ্দেশ্যের উপর। ম্যুলেন্স মহোদয়ার ঐ উপন্যাসাখ্য রচনায় খ্রীষ্টধর্মের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লেখিকাকে বেশি ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল ; 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কী উপায়', 'অভেদী'র লেখক এবং 'মাসিক পত্রিকা'র সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র সমাজের দুষ্কৃতি ও অনাচার দূরীকরণে

যতটা মনোযোগী ছিলেন, চরিত্র অঙ্কনে ততটা সমাহিত ছিলেন না। এঁরা অভিজ্ঞতার মধ্যে যে উপাদান পেয়েছেন তাকে বিশ্বাস্য সম্ভবপরতার ('Probable impossibilities') সাহায্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা চরিত্রগুলির আচরণ অনুধাবন করেছেন, কিন্তু মানসমর্মটিকে অনুসরণ করেন নি, ফলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সাহসে-সংশয়ে মিলিয়ে যে বিচিত্র মানবচরিত্র—সে সম্বন্ধে এই লেখকদের অবগতি দুর্বল ছিল বলে মনে হয়। অথচ প্রায় তিনশো বছর আগে ফরাসী লেখক মঁতেইন মানুষ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে গেছেন,[১] তাতে তো সমগ্রতার অভাব নেই। এই যুগের লেখকেরা সেই দৃষ্টি থেকে যদি সামান্য অনুপ্রাণনা গ্রহণ করতেন! রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'মানুষের আঁতের কথা বার করে দেখানো'—সে কাজে এঁদের কারও উৎসাহ দেখা গেল না। এর কারণ কি এই যে নবজাগরণের এই বিভ্রান্ত যুগে তখনও পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তিত্বের উপর আস্থা জন্মায় নি,—ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় নি? কেবল ভালো বা মন্দ—এই দুটি স্পষ্ট বিবেচনার বাইরে মানুষের যে নানা বিরোধী প্রবণতায় সংমিশ্রিত সত্তা—তার কথা বলার সময়ই কি তখনও হয় নি? সেজন্য এ সময়ের নাটকের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের নানামুখী আভাসন দেখি না, দেখি নীতি ও ন্যায়বোধের তুলাদণ্ডে মানুষের পরিমাপ এবং সেই অনুযায়ী তাকে চিহ্নিত করা। চরিত্রগুলি প্রায়ই দ্বন্দ্বহীন এবং একমুখী, নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তারা যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো রূপান্তরিত হয় না। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে এই যুগের রচনায় পাপী শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে পুণ্যাত্মা হয়ে পড়ে—যেমন দেখা গেছে 'আলালের, ঘরের দুলাল'-এ মতিলালের ক্ষেত্রে—কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকের নৈতিক উদ্দেশ্যই চরিত্রকে ওভাবে বিবর্তিত করেছে। চরিত্রের স্বাভাবিক গতি অনুসারে তা হয় নি। বারাণসীধামে পৌঁছে মতিলাল 'গঙ্গাতীরস্থ নির্জন স্থানে' বসে 'দেহের অসারত্ব আত্মার সারত্ব এবং আপন চরিত্র ও কর্মাদি পুনঃ২ চিন্তা করিতে' লাগল এবং তার পরেই তার 'আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মিল'—জীবনে এমন ঘটনা ঘটতে

১. Varginia Woolf তাঁর 'The Common Reader' গ্রন্থে [1st Series] মঁতেইনের এই মানবমূল্যায়নের উল্লেখ করেছেন। সে মতে মানুষ নামে জীবটি "bashful, insolent; chaste, lustful; parting, silent; laborious, delicate; ingenious, heavy; melancholic, pleasant; lying, true; knowing, ignorant; liberal, covetous and prodigal."

পারে, কিন্তু উপন্যাসে—যেখানে চরিত্রগুলির জৈব প্রকৃতি অন্যরকম সেখানে—এরকম ঘটা উচিত নয়। ঘটনাপরম্পরায় কার্যকারণযোগের অভাব, চরিত্রগুলির নির্দ্বন্দ্ব রূপ ও তাদের সম্ভাব্য মানসিকতা সম্বন্ধে লেখকের নিঃস্পৃহ মনোভাব এবং নীতিপরায়ণতা এই যুগের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রটিকে অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। তাই 'পাপী'র চরিত্র অঙ্কনে লেখকেরা শক্তিমত্তা দেখিয়েছেন, কিন্তু তাদের আঁকা সৎ চরিত্রগুলি প্রায় দারুনির্মিত বলে মনে হয়। বরদাবাবুর চেয়ে ঠকচাচা কত বেশি আকর্ষণীয়, কালকেতুর চেয়ে যেমন আকর্ষণীয় ভাঁড়ুদত্ত! তার কারণ, লেখকের ইচ্ছা অনুযায়ী অসৎ চরিত্র কখনও কখনও সৎ হয়েছে, কিন্তু সৎ চরিত্রেরা আনুপূর্বিক সচ্চরিত্রই থেকে গেছে—লেখক তাদের আর বদলাবেন কেমন করে? তাহলে তাঁর নৈতিক উদ্দেশ্যই যে ব্যাহত হয়!

বাংলা উপন্যাসজাতীয় রচনাতে প্রথমে প্লট সংযোগ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চরিত্রায়ণও তাঁর হাতে অনেকাংশ সম্পূর্ণতা লাভ করল। কিন্তু অন্ততপক্ষে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' বা 'মৃণালিনী'তে ['স্বর্ণলতা, প্রকাশের আগে বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিনটি রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল] তাঁর চরিত্রসৃষ্টি ক্ষমতার যথাযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায় নি। রচনাগুলিকে আধুনিক পরিভাষায় উপন্যাসও বলা চলে না—প্রথম ও তৃতীয়টি ঐতিহাসিক রোমান্স, দ্বিতীয়টি কাব্য-রোমান্স বলে স্বীকৃত হয়েছে। রোমান্স আমাদের সৌন্দর্য-লোকে নিয়ে যায়, দূরাশ্রিত মহিমায় মুগ্ধ করে রাখে, কিন্তু প্রতিদিনের অব্যবহিত সত্যের লবণাক্ত স্বাদ দেয় না। জগৎসিংহ, আয়েষা, তিলোত্তমা, নবকুমার, হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, মাধবাচার্য,—এরা হয় মহৎ ভাব না হয় বিপুল সৌন্দর্যের দ্বারা আমাদের অভিভূত করে, প্রাণোত্তাপের দ্বারা আমাদের ঘনিষ্ঠ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রেও পুরুষচরিত্রগুলি নিরতিশয় দুর্বল। যে কয়টি চরিত্রকে এই তিনটি রোমান্সের মধ্য থেকে নিজেদের জন্য নির্বাচন করতে ইচ্ছা হয় তারা—অর্থাৎ বিমলা, কপালকুণ্ডলা, শ্যামা, পদ্মাবতী, গিরিজায়া, পশুপতি, মনোরমা প্রভৃতি উপরিউল্লিখিত চলিত্রগুলির চেয়ে অনেক বেশি সবল, কিন্তু এদের মধ্যেও স্তরবিভাগ আছে। কপালকুণ্ডলা, বিমলা, পশুপতি, মনোরমা, পদ্মাবতী—এই সম্প্রদায়টির প্রত্যেকের শরীরে রোমান্সসুলভ কল্পনার চিহ্ন স্পষ্ট। গিরিজায়ার আচার-আচরণ শ্যামার তুলনায় অস্বাভাবিক —কিন্তু এ দুটিকেই তবু নিকটবর্তী মানুষ বলে মনে হয়। ঘটনার বৃহৎ

পটভূমিকায় এদের স্থান যৎসামান্য। এই তিনটি রোমান্সে প্রায় সমস্ত বৃহৎ চরিত্রগুলি কল্পজগৎ থেকে আহৃত—যতখানি সুন্দর ততখানি সত্য নয়। কিন্তু সুন্দরকেই মাঝে মাঝে সত্য বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। আর এরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্লটের অনুগত, প্লটের নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী আচরণ করে। এখানেও প্লট তার স্বভাবমতো চরিত্রকে তার সহজ প্রবণতা অনুযায়ী বর্ধিত বা বিস্তারিত হবার সুযোগ দেয় নি। তাকে সে বিনষ্ট করেছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কাঁচপোকা যেমন করে তেলাপোকাকে মারে' তেমনি করে। 'চরিত্রের প্রাণগত রূপ' প্লট এবং লেখকের নানা উদ্দেশ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন থেকেছে—কিন্তু এ যুগে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নীতি-প্রণোদিত হয় নি তাঁর উপন্যাস-রচনার পরবর্তী যুগের মতো—একথা মনে রাখতে হবে।

এই সময় 'স্বর্ণলতা' প্রকাশিত হল। তারকনাথ রোমান্স-পরিচ্ছদমুক্ত বাস্তবজগতে তাঁর উপন্যাসের উপাদান খুঁজে পেলেন। তাঁর পূর্বে আর কেউ সরলা, বিধুভূষণ, শশিভূষণ, প্রমদা, নীলকমল—এদের কথা বলে নি। বিশ্বাস্য ও বাস্তব চরিত্রসৃষ্টির জন্য যাদের প্রথম প্রয়োজন, সেই আমাদের নিত্য-পরিচিত মানুষের দলকে প্রথম তারকনাথ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সম্মান দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সে যারা গৌণচরিত্র ধূসরতায় আচ্ছন্ন ছিল, তারকনাথ তাদেরই মুখ্য পাত্রপাত্রীরূপে নির্বাচন করলেন। সুতরাং চরিত্র-সৃজনের প্রথম শর্ত—বাস্তব মানুষ—তারকনাথের উপন্যাসে গৃহীত হল।

কিন্তু এই বাস্তব মানুষের বহুধাবিভক্ত রূপ—তার হৃদয়গহনের অতল রহস্য, তার পাপপুণ্যের অন্তর্লীন সংঘর্ষ—সমস্ত মিলিয়ে গোটা মানুষের ছবি তারকনাথও অঙ্কন করতে পারেন নি। প্রথম ভূমিকাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এরা এক-একজন এক-একটি বিশিষ্ট গুণ বা দোষের প্রতিনিধি। এরা ফর্স্টার-কথিত flat চরিত্র। বস্তুত 'স্বর্ণলতা'র' সমস্ত চরিত্রগুলিকে ভালো ও মন্দ—এই স্পষ্ট দুটি পক্ষে ভাগ করে ফেলা যায়—আমরা যার নাম দিয়েছি 'শুক্ল' পক্ষ ও 'কৃষ্ণ' পক্ষ। এরা প্রায়ই একমুখী ও সংশয়হীন। এমন-কি শশিভূষণ—যার মধ্যে আমরা ভালোমন্দের মিশ্রণ দেখতে পাই—সেখানেও ভালোমন্দ পাশাপাশি অবস্থান করে প্রতিমুহূর্তে তার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করছে না। সে যখন ভালো তখন মন্দ নয়, আবার যখন মন্দ তখন তার মধ্যে ভালোত্বের কোনো চিহ্ন নেই। অর্থাৎ ভালো থেকে মন্দে এবং মন্দ থেকে আবার ভালোয়—এই সরল পথ ধরে তার চরিত্রটি অগ্রসর

হয়েছে।-এর মধ্যে কোনো অভাবনীয়ের চমক নেই। কোনো চরিত্রই আকস্মিক রূপান্তরের দ্বারা আমাদের চমকে দেয় না বলেই তারা একরঙা বা flat চরিত্র। কিন্তু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিধুভূষণ-শ্যামা যখন রসিকতা করে, শ্যামা যখন দরজায় আড়ি পাতে বা উচ্চকণ্ঠে প্রমদার সঙ্গে কলহে মত্ত হয় [১৩শ পরিচ্ছেদ], নীলকমল যখন কর্ম্মসূত্রের আখ্যান বলে অগোচরে নিজের দুর্ভাগ্যের ভূমিকা রচনা করে—তখন ঐ চরিত্রগুলির কিছু গোপন আভাস হঠাৎ যেন আমাদের কাছে ধরা পড়ে যায়। তখন তাদের একরঙা কাঠামোর মধ্য থেকে আরো দু-একটি রঙের অস্থায়ী বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তবু তাদের মধ্যে বিপজ্জনক দোটানা নেই, সুতরাং 'কৃষ্ণ' আর 'শুক্ল' এই দুটি পক্ষে তাদের বিভাজন অনায়াসে সম্ভব। এও স্পষ্ট যে 'শুক্ল' পক্ষে যেমন কোনো বিভীষণ নেই, তেমনি 'কৃষ্ণ' পক্ষেও কোনো বিবেকবান ব্যক্তি নেই। মাঝখানে সুস্পষ্ট ব্যবধান। 'মানুষের আঁতের কথা'—যার সঙ্গে আমাদের চিরাচরিত নীতিবোধের সব-সময় মিল হয় না এবং অধিকাংশ সময়েই সংঘর্ষ বাধে তাকে—রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ উদ্ধার করতে পারেন নি। এর আগে মানুষকে সমাজ-পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভবই ছিল না এবং সে-ভাবে না দেখলে সম্পূর্ণ মানুষের ধারণা কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব কি না কে জানে? তবে তারকনাথের বৈশিষ্ট্য কোথায়? তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং মহত্ত্ব তাঁর পর্যবেক্ষণের সততায়, তাঁর সহানুভূতিতে, তাঁর জীবনঘনিষ্ঠতায়, তাঁর হাস্যমণ্ডিত প্রসন্নতায় ও মর্মবেদনা-স্নিগ্ধ বিষাদে। [ভূমিকা ১৫ পৃষ্ঠা এবং টীকা-টীপ্পনীর ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

'স্বর্ণলতা'র জনপ্রিয়তা—অনন্যতা

বিস্ময়কর এই যে, 'স্বর্ণলতা'র জনপ্রিয়তা স্বরূপত 'দুর্গেশনন্দিনী'র জনপ্রিয়তা থেকে আলাদা নয়। 'প্রথম', 'নূতন' বা 'অভিনব' হওয়ার জন্যই সর্বাগ্রে এই জনপ্রিয়তা। যুগের প্রচলিত ধারার মধ্যে একটি বিরোধী স্রোত, বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন দৃশ্যসম্ভারের মধ্য থেকে পৃথক হয়ে ওঠা একটি উজ্জ্বল দৃশ্যখণ্ড যেমন সকলের আগে চোখে পড়ে এবং মানুষ নূতন কিছুর প্রত্যাশায় ধাবিত হয়—তেমনই এই জনপ্রিয়তা। স্বাতন্ত্র্যের জন্য, অভিনব কিছুর প্রত্যাশা-জাগিয়ে-তোলা স্বভাবের জন্য এই জনপ্রিয়তা। 'দুর্গেশনন্দিনী'

বা 'স্বর্ণলতা' দুটি গ্রন্থই যেমন সে-প্রত্যাশা জাগিয়েছে, তেমনই তার সন্তর্পণও করেছে। কিন্তু দুটি গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণ এক হলেও, তাদের উৎসের মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান।

'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের কল্পনা ও অভীপ্সাকে দেশকালের সুদূরতায় বিস্তীর্ণ করে দিয়েছে। যা আমাদের অভিজ্ঞতা লোকের অতীত, যা আমাদের বাসনা লোকবাসী, যে-চিত্রলতা ও সৌন্দর্য আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহারের মধ্যে অধরা হয়ে থাকে এবং যা আমাদের স্বপ্নে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণভাবে আভাসিত হয় মাত্র—সেই অনির্দেশ্য অমলিন রূপ ও অনুভবের জগৎকে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আশ্রয় দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জন্য দুর্গম রহস্যলোকের দ্বার খুলে দিলেন। সেখানে আমাদের বাসনা পৌছায় কিন্তু সামর্থ্য পৌছায় না। রূপকথাই যেন আধুনিক মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার মিশ্রণে নূতন রূপ নিল রোমান্সে। 'দুর্গেশনন্দিনী' সেই রোমান্স। "৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন"—এই পংক্তিটি রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম রোমান্সের পদধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু তারপর? অন্তত ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐ রোমান্সের 'আলোক আলোক'—The light that never was on land or sea—বাস্তব সংসারে আলোকবর্তিকা হতে পারল না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র [১৮৬৫] পর 'কপালকুণ্ডলা' [১৮৬৬], তারপর 'মৃণালিনী' [১৮৬৯] এবং 'বিষবৃক্ষ' [বঙ্গদর্শনে ১৮৭২ থেকে ধারাবাহিকভাবে]—'স্বর্ণলতা' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বিষবৃক্ষ'কে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বাদ দিলে বাকী দুটি গ্রন্থ অব্যাহতভাবে রোমান্স। দুটিই আলাদাভাবে অসামান্য সৃষ্টি, রোমান্স হওয়া এ গ্রন্থ দুটির পক্ষে নিন্দার কথাও নয়, কিন্তু বাস্তব সংসারের কোন্ তৃষ্ণা এদের দ্বারা মিটবে? অবশ্য রোমান্স ব্যাপারটা শুধু উপন্যাসের চেহারায় থাকে না, তা তার অন্তর্লীন স্বভাবের মধ্যে অনুস্যূত থাকে। গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের চেহারাটা রোমান্সের, কিন্তু তার সমস্যাগুলি বাস্তব মানুষের, সেজন্য তা বাস্তব। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপরিউক্ত উপন্যাসগুলির সমস্যাও তো আমাদের প্রতিদিন-পরাভূত সমকালীন মানুষের সমস্যা নয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'র জনপ্রিয়তার কথা বোঝা যায় 'নববাবুবিলাস' 'নববিবিবিলাস' 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' ইত্যাদি বইয়ে, হুতোম ও

আরো অনেকের নকশায়, এবং তৎকালীন নাটকগুলিতে যে অনিবার্য সামাজিক পঙ্কোদ্ধার চলছিল তার মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব যেমন অভাবনীয় তেমনি আকাঙ্ক্ষিত, নিদাঘদ্বিপ্রহরে স্নিগ্ধ দীর্ঘ বৃষ্টিপাতের মতো। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর চিত্তকে তার ক্লিষ্ট ভূম্যাকর্ষণ থেকে টেনে নিয়ে উদার মুক্ত কল্পনার আকাশে তাকে দিলেন অবাধ গতি, স্বচ্ছন্দচারী স্বাধীনতা। কিন্তু তাকে শান্ত নীড়ে ফিরিয়ে আনার ব্যগ্রতা তাঁর দেখা গেল না, কেন না আদর্শের তিনি যতটা সন্ধানী, প্রত্যক্ষকে নিয়ে ততটা ব্যাপৃত নন। এদিকে বাঙালীমানস অনেকটা ওয়ার্ডস্বার্থীয় স্কাইলার্ক পক্ষীর মতো - True to the kindred points of heaven and home, উর্ধ্বচারণ তাকে একসময় ক্লান্ত করে এবং তখন সে নীড়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিপুল কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণের জোর না কমতেই, বাংলা উপন্যাসে একটি কেন্দ্রাভিগ অসন্তোষ দেখা দিল। তারকনাথের নানা উক্তির মধ্যে তারই আভাস ফুটে উঠেছে দেখতে পাই।

'স্বর্ণলতা' আমাদের ফিরিয়ে-পাওয়া গৃহমমতার আলেখ্য। 'স্বর্ণলতা'ই হয় তো প্রথম যথার্থ 'উপন্যাস'— যদি আর্নল্ড কেট্‌ল প্রদত্ত উপন্যাসের সংজ্ঞা আমরা গ্রহণ করি— "The novel...is a realistic prose fiction, complete in itself and of a certain length.[১]" ক্যালকাটা রেভিউর সমালোচকও এই অর্থেই 'স্বর্ণলতা'কে প্রথম বাংলা উপন্যাসের সম্মান দিয়েছিলেন। রোমান্স-যবনিকার অন্তরালস্থিত বাঙালী গৃহের প্রতিদিনকার সুখদুঃখের কাহিনী আছে 'স্বর্ণলতা'য় একান্নবর্তী পরিবারে ভ্রাতৃকলহ, তাদের পৃথগন্ন হওয়া, নারীচরিত্রের ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও অসামান্য দুঃখসহন, চুরি, প্রবঞ্চনা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, শহর-পরিবেশে গ্রাম্যলোকের দুর্গতি— এইসব উপাদান নিয়ে মহাকাব্য হয় না, রোমান্স নির্মাণ করাও সহজসাধ্য নয়। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র এবং 'স্বর্ণলতা'র ভ্রাতৃকলহ এক নয়, আবার সরলার আত্মক্ষয়ের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর আত্মক্ষয়েরও কোনো সুদূর সম্পর্ক নেই। 'স্বর্ণলতা'র সমস্যাগুলির দিকে চোখ ফেললে তাদের সংসারঘনিষ্ঠতা সহজেই চোখে পড়ে। প্রমদার ঈর্ষা, সরলার মৃত্যু, শশিভূষণের বিপন্নতা, বিধুভূষণের প্রবাসযাপন, গদাধর-রমেশের ষড়যন্ত্র, গোপালের ভীরু বাসনার অঞ্জলি,

---

1. An Introduction to English Novel. 1. Page 29.

শশাঙ্কের পৈশাচিকতা—সমস্ত কিছুর মূলে কেন্দ্রগত শক্তিটি হচ্ছে অর্থের—অর্থাৎ 'স্বর্ণলতা'র সমস্যাগুলি মূলত অর্থনৈতিক। প্রমদার ঈর্ষার কারণটি প্রথমত অধিকারবোধ, কিন্তু ঐ অধিকারবোধের নির্ভরও তো সাংসারিক অর্থনীতির উপর। বাঙালী গৃহিণীর আঁচলে-বাঁধা চাবির গুচ্ছটি এই আর্থনীতিক অধিকারের প্রতীক। অবশ্য প্রমদা চরিত্রটিতে অকারণ ক্ষুদ্রতা, হিংস্রতা ও ঈর্ষা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু পরিবারের অর্থনীতি-নির্ভর চরিত্র, ঐ দোষগুলিকে আরো তীব্র করেছে। বিধুভূষণ যদি দরিদ্র না হত তা হলে নিশ্চয়ই দু ভাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব থাকত, সরলাকে মরতে হত না, তার নিজেকে অর্থ-সন্ধানে প্রবাসে যেতে হত না, গদাধর-রমেশ ষড়যন্ত্রে সাহসী হত না, গোপালের বাসনামুকুলে কুণ্ঠা ও আত্মলাঘব আসত না, তার জীবনে হেমচন্দ্র তথা স্বর্ণলতার অভ্যাগমই ঘটত না। অন্যপক্ষে অর্থলোভের motif না থাকলে শশাঙ্ক স্বর্ণলতা-অপহরণ করে গোপালের স্বর্ণলতা-লাভে বাধাসৃষ্টি করত না। কিন্তু রোমান্সের সমস্যা নিঃসন্দেহে অন্য। দারিদ্র্য দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা বা জগৎসিংহের জগৎ থেকে বহু দূরে, নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীর জগৎ থেকেও দূরবর্তী। 'দুর্গেশনন্দিনী'র চরিত্রগুলি রাজা, রাজন্য-স্থানীয় বা রাজকুলসমুদ্ভব, 'বিষবৃক্ষ'-এর চরিত্রগুলিও সম্পন্ন কুলের। বলা বাহুল্য অর্থচিন্তা এদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। এদের সমস্যাগুলি অন্য চাওয়া-পাওয়ার, অন্য প্রার্থনা ও তার সম্পূরণের সমস্যা।

শুধু 'স্বর্ণলতার' সমস্যা নয়, তার জীবন পরিবেশও আমাদের ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গণের অশ্রুসজল আকর্ষণ দিয়ে নির্মিত। সরলা-বিধুভূষণের দাম্পত্যপ্রেম রোমান্সের বৃহদায়তন পায়নি বলেই আমাদের আবহমানকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত—তার মধ্যে আমরা নিজেদেরই পুনরাবিষ্কার করি। স্বর্ণলতা বা শ্যামার স্নেহে ও আত্মোৎসর্গে, বিধুভূষণের অনুচ্চারিত চিন্তায়, প্রমদার ঈর্ষায়, শশিভূষণের দুর্বলতায়, গদাধরের লোভে আমরা আমাদের চিরাগত সংসার-ছবিটিকে স্পষ্ট করে ফিরে পাই—যার চাওয়া যৎসামান্য, প্রাপ্তি তার তুলনায় আরো কম। এতে নূতন করে পাই আমাদের আজন্ম পরিচিত সত্যকে—চেনা মানুষগুলির সুখদুঃখের বিচিত্র লীলার মধ্যে। এই সুখদুঃখগুলির নাগাল পাওয়া যায় আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে, আমাদের সহজ বোধ দিয়ে এগুলির ব্যাখ্যা করা যায়—অসামান্য বাসনার অসামান্য দুঃখের স্মৃতি এগুলির সঙ্গে মিশে নেই।

তাই 'স্বর্ণলতা' বঙ্কিমচন্দ্রের সুদূরান্বেষণের পাশাপাশি আমাদের জন্য একটুখানি গৃহমমতা বিছিয়ে রেখেছে,—তুলসী-মঞ্চের সঙ্গে, নিকানো-উঠানের সঙ্গে যার যোগ।

সেই সঙ্গে আছে আমাদের প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত তথ্যচয়—চেনা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলির সজীবতা প্রাপ্তি, উপন্যাসের formal realism-এর জন্য অপরিহার্য আয়ান ওয়াট কথিত private 'experience'[১] —প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতম তথ্যগুলি বাংলা সাহিত্যে 'স্বর্ণলতা'তেই প্রথম সবচেয়ে সার্থকভাবে এসেছে। মনোহারী ফেরিওলার আগমনে 'পাড়ার যাবতীয় ছেলেপিলে ও বউঝি'র একত্র হওয়া, বিত্তবান্-গৃহিণীর প্রতি জনপদ-মহিলাদের তোষামুদে মনোভাব [২য় পরিচ্ছেদ], 'একখানি নূতন গহনা বা একখান ভাল কাপড় লইতে হইলেই' প্রমদার স্বামী-বিমুখতার ভান [৪র্থ পরিচ্ছেদ], শ্যামার আড়িপাতা, বিধুভূষণের যাত্রাগানে বিভোরতা, বাপের বাড়ি কাছে বলে 'চালটে ডালটে, কখন টাকাটাসিকেটা' চুরি করে প্রমদার রামদেব চক্রবর্তীর পরিবারের ভরণ-পোষণ, 'ছোটবাবুর কাপড় ময়লা হয়েছে, তাই বেরুতে' না-পারা—ইত্যাদি প্রতিটি ঘটনা আমাদের সহজ অধিকারের অন্তর্গত, সমাজের বাস্তব ঘটনার নিখুঁত প্রতিবিম্বন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমার রূপবর্ণনার [প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ], 'স্বর্ণলতা'র নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা পাঠ করলেই এই বাস্তবতার স্বরূপটি স্পষ্ট হবে—

> "দূর হইতে পথিকের বয়স চল্লিশ বৎসরের ন্যূন বোধ হইত না, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলে তদপেক্ষা অন্ততঃ দশ-বার বৎসর কম নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হইত। মস্তকে দুটি-একটি পক্ক কেশ দেখা যাইত, কিন্তু তাহা বয়োবৃদ্ধি হেতু নহে। মুখশ্রী ম্লান ও চিন্তাকুল। দেখিবামাত্রই জানিতে পারা যাইত, চিন্তায় পথিককে যৌবনেই বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথিকের পায়ে এক জোড়া পাঁচ সাত জায়গায় তালি দেওয়া জুতা। তাহাও ধূলায় আবৃত। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ধূলি। পরিধানে একখানি অর্ধমলিন থানের ধুতি, গায়ে একটি তালি-দেওয়া জামা। জামাটি পূর্বে পশমীকাপড়ের ছিল, কিন্তু কালে দুর্দশাবশতঃ লোমহীন হইয়াছে। জামার উপর একখানা তেহাতা মাকিনের চাদর। পথিকের দক্ষিণ পার্শ্বে

---

১. The Rise of the Novel, Ch. 6. 'Private Experience and the Novel'. by Ian Watt.

একটি জলশূন্য হুকা, একটি কলিকা ও একগাছি বাঁশের ছড়ি ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে।"

অতিরঞ্জনহীন এই ইন্দ্রিয়গোচর সত্য ছবি 'স্বর্ণলতা'র অন্যতম আকর্ষণ।

এ গ্রন্থ আমাদের গৃহাঙ্গণের আহ্বান বলেই এত জনপ্রিয়। তাই বলা হয়েছে যে, যে-সাহিত্যে সমাজের নিখুঁত নিপুণ বাস্তব ছবি ফুটেছে সে যদি শিল্পমূল্যের সম্পদে একেবারে কানাকড়িহীন না হয়, তবে অন্তত জনসমাদরের ব্যাপারে তার মার নেই। 'স্বর্ণলতা' শিল্পমূল্যের সম্পদেও যে কানাকড়িহীন নয় তা আমরা ভাষার আলোচনায় লক্ষ্য করব। আর এর জনপ্রিয়তার সাক্ষী শুধু ইতিহাস নয়, আমরাও। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পরেও 'স্বর্ণলতা'র সমাদর হ্রাস পায় নি।

এই জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর স্বর্ণলতার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা চলে। এ উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে রচিত 'সরলা' নাটক স্টার থিয়েটারে এক বৎসর ধরে অভিনীত হয়েছিল। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে এই তথ্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে 'সরলা'র সাফল্য দেখে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে একটি সামাজিক নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করেন। তারই ফলে 'প্রফুল্ল'-এর রচনা—এ কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা, রস, নামকরণ—সবই 'সরলা'র সঙ্গে স্পষ্ট সাদৃশ্যসূত্রে যুক্ত[১]। টীকা-টীপ্পনী অংশে বাংলা নাটকে ভ্রাতৃকলহ-আখ্যানের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর 'স্বর্ণলতা'র পরোক্ষ প্রভাব সন্দেহ নাই।

'সরলা' নাট্যরূপ প্রস্তুত করেছিলেন অমৃতলাল বসু। 'সরলা'র প্রভাবে লেখা অন্তত আরেকটি নাটকের কথা আমাদের মনে আসে—সেটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'বঙ্গনারী'। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে সর্বপ্রথম 'সরলা'র অভিনয় হয়। সেকালের পাক্ষিক পত্র 'অনুসন্ধান' প্রথম অভিনয় দেখে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মন্তব্য করেছিলেন—"আমরা প্রার্থনা করি, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই যে বঙ্গবাসীর মূলমন্ত্র, সেই অধঃপতিত বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে যেন এক একবার সরলার অভিনয় দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনের কঠোর কর্তব্য বুঝিয়া আসেন।"[২]

---

১. এই সাদৃশ্য অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে লক্ষ্য করেছেন। ১ম সংস্করণ, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

২. 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়', সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৫৭

'স্বর্ণলতা'র নামকরণ

মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র 'What is ih a name?' বলে নামকরণের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে মানুষের মনে সংশয় জন্মিয়ে দিয়েছেন। একথা সত্য যে, গোলাপের নামকরণে তার সৌগন্ধের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না – তবু সাহিত্যে নামকরণ-প্রসঙ্গ চিরকাল লেখক এবং সমালোচককে বিব্রত করে এসেছে। বাস্তবজীবনে একচক্ষুবিশিষ্ট সন্তানের নাম পদ্মলোচন হতে পারে; এই দৃষ্টান্তে সাধারণভাবে নামকরণের অসঙ্গতিই চোখে পড়ে, কিন্তু এ নামেরও একটি সার্থকতা আছে—তা পিতামাতার মমতাধিক্যের পরিচয় দেয়। সাহিত্যে নামকরণের সমস্যা বাস্তবজীবনের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। গ্রন্থের নামকরণ-বিষয়ে বর্তমান পাঠক বা সমালোচকের দাবি অনেক বেশি শক্তিশালী। নামকরণের মধ্যে আমরা দেখতে চাই কোন্ চরিত্রটি প্রধান হয়ে উঠছে লেখকের কাছে; উপন্যাসে তিনি কিছু প্রতিপাদন করতে চান কি না; তাঁর কোনো বিশিষ্ট জীবনবোধের ইঙ্গিত আছে কি না ঐ নামে। বহু সম্ভাব্য নামের মধ্য থেকে একটি অনিবার্য নামকে লেখকের নির্বাচন করতে হয়, যে-নাম পাঠক বা সমালোচকের কাছে একটি বর্তিকাস্বরূপ, যা উপন্যাসটিকে আলোকিত করে তুলবে। একটি নামের মধ্যে থাকে হাজার স্মৃতি হাজার অনুষঙ্গ, লেখক তাকে বেছে নিয়ে সচেতনভাবে সেই স্মৃতি ও অনুষঙ্গগুলিকে উপন্যাসেও চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ ও বক্তব্যের পিছন থেকে আভা বিকিরণের জন্য নিয়োগ করেন। অর্থাৎ নামকরণ এখন গভীর চিন্তা ও সজ্ঞান পরিকল্পনার ব্যাপার। অবশ্য সব সময় যে নামকরণের পিছনে দীর্ঘস্থায়ী ভাবনাচিন্তা থাকে তা নয়। অনেক লেখক উপন্যাস রচনার শেষে ক্লান্ত হয়ে যেমন-তেমন একটি নাম গ্রহণ করেন। Percy Lubbock প্রথমে ভেবেছিলেন টলস্টয়ের মহাকাব্যপ্রতিম উপন্যাস 'War and Peace'-এর নামকরণে এই রকম অনবধানতার পরিচয় আছে, পরে অবশ্য তাঁর ভুল তিনি শুধরে নিয়েছেন।[১] তাঁর ঐ উক্তির মধ্যেই উল্লেখ আছে যে বড়ো বড়ো উপন্যাস লেখকেরাও অনেক সময় নামকরণ ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না।

---

১. "I have been supposing that his named he book carelessly (he would not be alone among great novelist for that)...but there are things in the drama which suggest that his title really represented the book he projected." The Craft of Fiction, Page 31.

নাটকে অবশ্য নামকরণের একটি বিশেষ রীতি মানা হয়। ট্রাজেডির নাম দেওয়া হয় সচরাচর ট্রাজেডির নায়ক বা প্রধান চরিত্রের নাম থেকে, কমেডির নাম নির্ভর করে ঘটনার নির্বাসিত মেজাজটির উপর। যেমন 'রাজা ঈডিপাস' [ওয়েদিপাউস], 'আন্তিগোনে', 'ম্যাকবেথ', 'কেটো' ; অন্যপক্ষে 'কমেডি অব এররস', 'এ মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রীম', 'দি রাইভ্যাল্‌স' ইত্যাদি। উপন্যাসলেখক নামকরণে অনেকটা স্বাধীন, কিন্তু সেই স্বাধীনতার মধ্যেও অনেকখানি দায়িত্ব আছে। তিনি নায়ক বা মুখ্যচরিত্রের নামে গ্রন্থের নামকরণ করতে পারেন—উপন্যাসের প্রথম যুগে নামকরণের এটাই একমাত্র রীতি ছিল। প্রথমে এ নাম ছিল গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের মতো অনেকটা, যেমন—'The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders', 'The History of Tom Joneis' ইত্যাদি। এ গ্রন্থগুলি 'মল ফ্ল্যাণ্ডার্স' বা 'টম জোন্‌স' নামেই পরিচিত, যেমন পরিচিত রিচার্ডসনের Pamela। অনেক সময় প্রধানচরিত্রের নামে উপন্যাসের নামকরণ করেও লেখকেরা একটি বিকল্প নাম যোগ করতেন, 'Madame Bovery'-র আর একটি নাম [ইংরেজী অনুবাদ] যেমন 'Provincial Manners'. বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে এই প্রবণতাটি কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। সমস্যা বা ভাববীজের আভাসে অনেক সময় উপন্যাসের নামকরণ হয়ে থাকে—যেমন জেন অস্টেনের 'Pride and Prejudice', আলবেঅর কামুর 'The Fall', কোনো নামে থাকে রচয়িতার জীবনবোধের ব্যঞ্জনা—'Ulysis' বা 'পথের পাচালী'। কিংবা চরিত্র-ঘটনা-সমস্যা জীবনবোধ—সবকিছুর সম্মিলিত আভাসগ্রহণ করেও নামকরণ করা চলে, যেমন করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহু উপন্যাসে। ঔপন্যাসিকের সামনে নামকরণের অনেকগুলি পথ খোলা—যে-কোনো একটি তিনি গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু একথা তাঁকে মনে রাখতেই হবে যে, ঐ নাম যেন পাঠক বা সমালোচককে গ্রন্থের গভীরে নিয়ে পৌঁছে দেয়। ঘটনার অন্তরালবর্তী রহস্যে, চরিত্রের হৃদয়তলের গোপন অলিন্দে, অথবা জীবনানুভবের 'গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ' অনুধ্যানে—কোথাও, বা সর্বত্র, পৌঁছানোর জন্য নামটির সহায়তা দরকার। রবীন্দ্রনাথ সরল নামকরণের চেয়ে ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণই বেশি পছন্দ করতেন।

'স্বর্ণলতা' বাংলা উপন্যাসের যে কালপর্বের রচনা, তখন সচরাচর একটি চরিত্রের নামেই উপন্যাসের নামকরণ বিধেয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে প্রধান চরিত্রের [প্রায়ই নায়ক বা নায়িকা] নামে উপন্যাসের নামকরণ করেছেন, কখনও নামটি ব্যবহার না করে তার বিকল্প পরিচয়টি কাজে লাগিয়েছেন—যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী'তে। 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'আনন্দমঠ' ইত্যাদিতে তিনি নামকরণের অন্য পন্থা গ্রহণ করেন। তবে উপন্যাসে চরিত্রের নাম দিয়ে ফেলাটাই সবচেয়ে আদিম রীতি, সবচেয়ে সহজ রীতিও বটে। চরিত্রটি প্রধান হলে লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়, কিন্তু যখন একটি অপ্রধান চরিত্রের নামে নামকরণ হয় তখনই নানা জিজ্ঞাসা আসে। 'স্বর্ণলতা'র ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এ উপন্যাসে নামকরণের সর্বাপেক্ষা অনায়াসসাধ্য রীতিটি লেখক গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র স্বর্ণলতার নাম প্রয়োগ করে আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছেন। চরিত্রের নামেই যদি উপন্যাসের নাম দেবেন তাহলে তিনি অন্ততপক্ষে সরলার দাবি অগ্রাহ্য করলেন কেন? স্বর্ণলতা কখনোই প্রধান চরিত্র নয়, এমন-কি, সে উপন্যাসের নায়িকাও নয়। গ্রন্থের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাংশের ঘটনাগুলি অতিবাহিত হওয়ার পরই আমরা তাকে একটি পূর্ণাবয়ব চরিত্ররূপে দেখতে পাই। তাকে আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু সরলার মতো সে আমাদের আলোড়িত করে না। উপন্যাসের শেষাংশের ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণে তার প্রভাব যৎসামান্য। সে তার সৌন্দর্য, অনুরাগ ও সতেজ ইচ্ছার দ্বারা আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু সরলার আত্মক্ষয়ের করুণ বেদনার স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছিয়ে দিতে পারে না। তবে তারকনাথ তার মধ্যে এমন কি মহিমা দেখলেন যে গ্রন্থের নামকরণে তাকেই সর্বাগ্রে স্বীকার করে নিলেন? কোন্‌খানে সে অসামান্য, কোথায় অন্য সব চরিত্রের চেয়ে সে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট?

স্বর্ণলতা তারকনাথের হৃদয়ের সমস্ত স্নেহমমতা দিয়ে নির্মিত প্রাণ-পুত্তলিকা। সরলা বাস্তব, কিন্তু স্বর্ণলতা কমনীয় আদর্শ। সরলার জন্য লেখকের করুণার শেষ নেই, কিন্তু স্বর্ণলতা তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ মিশিয়ে তৈরী। যে পৌরুষ বিনয়ে ত্যাগে সেবায় চেষ্টায় এবং শক্তিতে অসামান্য হয়ে ওঠে স্বর্ণলতার মতো সর্বগুণশালিনী সুষমার প্রতিমা তারই 'ভাগ্যে জোটে। 'গোপালের মতো হও, পরিণামে স্বর্ণলতা পাইবে'—উপন্যাসের

শেষার্ধের প্রতিটি পংক্তি থেকে যেন লেখকের এই বক্তব্য বিকীর্ণ হয়েছে। সরলার আত্মদান, বিধুভূষণের পথভ্রান্ততা, রমেশ—গদাধর—শশিভূষণ—প্রমদার শাস্তি—সমস্তই এ সংসারে স্বর্ণলতার আবির্ভাবের ভূমিকা মাত্র। সরলা খণ্ডিত বিক্ষত গৃহসুখের প্রতিনিধি, স্বর্ণলতা সর্বাঙ্গসুন্দর আনন্দময় গৃহসুখের। যা আমরা পাই তার ছবি সরলাতে, যা আমরা চিরকাল প্রার্থনা করি তারই রূপ স্বর্ণলতাতে। শিক্ষায়, সৌন্দর্যে, নম্রতায় তেজে গরীয়সী এই নন্দনপ্রতিমা সৌভাগ্যের সম্পূর্ণতার কায়া, গোপালের মতো ধীরোদাত্ত সেবা ও প্রয়াস দিয়ে তাকে অর্জন করে নিতে হয়। সংসারে তার প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের সুখ অন্তহীন হয়, প্রমদার ঈর্ষা বা ষড়যন্ত্র সসঙ্কোচে পলায়ন করে, শশিভূষণের লোভ নিবৃত্ত হয়, বিধুভূষণের পথচারিতা বিশ্রাম লাভ করে। গোপালের সঙ্গে স্বর্ণলতার পরিণয় আর কিছুই নয়—সেবানম্র শৌর্যের সঙ্গে কল্যাণস্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মিলন। তারকনাথের উপন্যাসের মর্মসত্যটি এই। এই অন্তর্লীন theme-এর পরিপোষিকতার জন্যই সরলার আত্মোৎসর্গে উজ্জ্বল হয়েছে, হেমচন্দ্র স্নেহে ও করুণায় প্রসন্ন থেকেছে, প্রমদা ইত্যাদির ষড়যন্ত্রজাল বিস্তারিত হয়েছে। উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার সর্বসুখকর উপসংহার ঘটেছে গোপালের স্বর্ণলতা-লাভে। পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে তো স্পষ্টই বোঝা যায়—'গোপাল ও স্বর্ণলতার বিবাহ হইয়াছে' এই সংবাদটি দিয়ে লেখক তারপরে যে-সমস্ত তথ্য পরিবেষণ করেছেন সবই তার অনুষঙ্গী—অর্থাৎ গোপাল-স্বর্ণলতার বিবাহ থেকেই কার্যকারণসূত্রে যেন উপসংহারের সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে। শশিভূষণের মামলা নিষ্পত্তি, প্রমদার নিঃসঙ্গ নির্বাসন, বিধুভূষণের পৌত্রসুখ, হেমচন্দ্রের শান্তি, শ্যামার স্নেহের চরিতার্থতা, সমস্তই সংসারে স্বর্ণলতা-প্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সুতরাং উপন্যাসের মর্মের বিচারে স্বর্ণলতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সেক্ষেত্রে এ উপন্যাসের নামকরণ নিরর্থক হয় নি।

স্বর্ণলতার হাস্যরস

রচনায় হাস্যরসের মূল উৎস লেখকের আপন চিত্তের প্রসন্নতা,—যা চরিত্রে, ঘটনায়, বর্ণনায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে প্রকাশ লাভ করে। যদি লেখক এমন চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টি করেন যা স্বতই হাস্যকর, তাকে গ্রন্থনিবদ্ধ করে অসঙ্গতির আনন্দময় আলোড়নে শুভ্র নির্মল humour জাতীয় হাস্যরস পরিবেষণ করা সম্ভবপর হয়। আবার এমনও হতে পারে যে, ঘটনা বা

চরিত্রে কোথাও হাস্যকরতা নেই, কিন্তু লেখকের ভাষাটিই এমন প্রসন্ন কৌতুকমণ্ডিত যে তাঁর হৃদ্‌গত ঐ প্রসন্নতা পাঠকের চিত্তেও সঞ্চারিত হয়। 'স্বর্ণলতা' হাস্যরসের মূল আশ্রয় চরিত্র, ঘটনা এবং সর্বোপরি ভাষার মধ্য দিয়ে বিকীর্ণ লেখকের সর্বাঙ্গীণ জীবনদৃষ্টি।

কিন্তু হাস্যরসেরও নানা জাতিভেদ আছে। Humour, wit, satire, sarcasm, jest, buffoonery, lampoon ইত্যাদি নানা স্তরভেদ আছে হাস্যরসের। 'হিউমার'কে যদি বলি সহানুভূতিসিক্ত হৃদয়াবেগনির্ভর হাস্যরস, 'উইট' হল নির্মম বুদ্ধিশাণিত বক্রোক্তি। 'স্যাটায়ার' সাধারণত তীব্র বিদ্রূপ ও প্রখর ব্যঙ্গ—যার মধ্যে ক্ষমাহীনতার সুরটিই প্রবল। 'জেস্ট্' কথাটির সার্থক বাংলা প্রতিশব্দ ঠাট্টা। 'বাফুনারি' কথাটির তাৎপর্যকে 'ভাঁড়ামো' শব্দটির দ্বারা প্রকাশ করা যায়। 'ল্যাম্পুন' বলতে সচরাচর বোঝায় কুৎসিত ও উন্মত্ত বিদ্রূপ, যার মধ্যে অসংযত বাড়াবাড়িটাই বেশি। 'স্বর্ণলতা'র হাস্যরস উপরিউক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে কোন্‌গুলির অন্তর্ভুক্ত, এই প্রশ্ন দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

'হিউমার'—যার মূল আমাদের চিত্তের অসঙ্গতিবোধে,—তা-ই 'স্বর্ণলতা'র হাস্যরসের প্রধান আশ্রয়। অর্থাৎ হাস্যরসসৃষ্টির ব্যাপারেও তারকনাথ প্রধানত তাঁর গুরু ডিকেন্সকেই অনুসরণ করেছেন। মৃদু কৌতুকময় প্রসন্নতা ডিকেন্সের রচনার প্রধান লক্ষণ। তা ছাড়া, ডিকেন্স উদ্ভট ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের অনুকরণ করে (mimicry) হাস্যরসসৃষ্টিতে নিপুণ ছিলেন এবং তাঁর ঐ হাস্যরসে করুণার অশ্রুসজলতা জড়িত করে দিতেন। 'ডেভিড কপারফিল্ডে' মিঃ মিকোবরের সুদিনের আশা নিয়ে তিনি যথেষ্ট ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু অকৃত্রিম করুণারস ঐ ঠাট্টাগুলিকে নির্মল হাস্যের পবিত্র সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। আঘাতবিহীন আক্রমণহীন এই হাস্যরস তারকনাথেরও আরাধ্য ছিল।

প্রধানত দুটি চরিত্রের দ্বারা 'স্বর্ণলতা'য় হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে—গদাধর ও নীলকমল। এ দুটি চরিত্র এমনিতেই যথেষ্ট উদ্ভট—তাদের আচরণের অসঙ্গতিই হাস্যোদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট। এদের চেহারা, আচরণ, ভাষা সমস্ত কিছুই আমাদের সঙ্গতিবোধকে আঘাত করে আমাদের হাস্যমুখর করে তোলে। গদাধরের ক্ষেত্রে লেখকের কৃতিত্ব এই যে, গদাধর তথাকথিত villain চরিত্র, যদিও প্রবৃত্তিগতভাবে সে villain নয়—

নির্বুদ্ধিতা ও স্বার্থপরতা তার মূল অপরাধ—সে এ কাহিনীর 'কৃষ্ণ' পক্ষের অন্তর্গত। কিন্তু সে কখনোই লেখকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় নি। তাঁর প্রথম আবির্ভাবে লেখক এইভাবে তাকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন:

"গদাধর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অন্নাভাবে কৃশকলেবর। মস্তকটি ক্ষুদ্র, নাসিকা পর্যন্ত কেশে আবৃত, গলাটি লম্বা, পা দুখানি কুলার মত, লেখাপড়া সম্বন্ধে মা-সরস্বতীর বরপুত্র বলিলেই হয়।......

আর একটি কথা বলিলেই গদাধরের রূপ-গুণের সমুদায় পরিচয় দেওয়া হয় অর্থাৎ তিনি "ত"-বর্গ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং তৎপরিবর্তে "ট"-বর্গ প্রয়োগ করিতেন।"

তারপর তার আচার-আচরণের বিচিত্র অভ্যাসগুলিও ক্রমে ক্রমে বিকশিত করলেন লেখক: তার মা তাকে তামাক সেজে খাওয়ায়, সে যে-বাড়িতে থাকে সে বাড়ীর খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা ঘটে, নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে সে একটি গাম্ভীর্যসম্পন্ন আস্থা রাখে এবং শ্যামা তার নাক-কান কাটতে চায় বলে তাই নিয়ে দারোগার কাছে নালিশ জানাতে ছোটে। শেষকালে যখন লেখক সমস্ত পাপীদের শাস্তি বিধান করছেন—'ঐ চরূলে ডিডি' আর্তনাদের পর গদাধর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এবং তার চৌদ্দ বছর কারাবাস হয়েছে, কিন্তু রচয়িতার আনুপূর্বিক প্রশ্রয় থেকে সে কখনও বঞ্চিত হয় নি। এখানেই তারকনাথের হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য। তিনি জানেন, মানুষের দৈহিক বা আচরণগত অসঙ্গতি নিয়ে বিদ্রূপ করা সহজ, কিন্তু অনুকম্পার দ্বারা সেই বিদ্রূপকে কোমল হাস্যে রূপান্তরিত করা কঠিন। ঐ কঠিন পন্থাই তিনি নির্বাচন করলেন—গদাধর চরিত্রটিকে নির্মম অবজ্ঞার মধ্যে ঠেলে দিলেন না।

নীলকমল অবশ্য অপরাধী চরিত্র নয়। আসলে সে মিঃ মিকোবারের মতোই স্বল্পবুদ্ধি আইডিয়ালিস্ট্। এই চরিত্রেই তারকনাথ হাসি এবং অশ্রুকে বিস্ময়কররূপে সন্নিহিত করেছেন। স্টীফেন লীকক হাসি ও অশ্রু-বিন্দুর যে আত্মীয়তার কথা বলেছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই নীলকমল চরিত্র, তার মধ্যেই শেলীর সেই বিখ্যাত পংক্তিটি যেন মূর্তিলাভ করেছে—Our Sincerest laughter with some pain is fraught. তার অহংবোধ ও আত্মগরিমা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, 'পদ্ম-আঁখি' সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক মস্তকসঞ্চালন,

'বেশি-কথা-কথা রোগ', ইত্যাদি অভ্যাস অচিরেই তাকে আমাদের প্রিয় চরিত্র করে তোলে। নিজের সঙ্গীতক্ষমতা সম্বন্ধে তার অবস্থার পাশাপাশি লেখকের দেওয়া এই সংবাদটি উদ্ধার করা চলে:

"প্রথম প্রথম নীলকমলের বেহালার হাত মন্দ ছিল না। গোবিন্দ অধিকারী মনে করিয়াছিল, ভাল শিক্ষা পাইলে নীলকমল ভাল হইতে পারে; এ জন্য পাঁচ টাকা বেতন দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। নীলকমল তদবধি মনে করিল, সে একজন তানসান হইয়াছে। আর কাহাকেও তৃণজ্ঞান করিত না। যে সকল বোল শিখিয়াছিল, তাহার মধ্যে নিজের টিপ্‌নি প্রবেশ করাইল, মাথা কাঁপান ধরিল, মুদ্রাদোষ সংগ্রহ করিল এবং অন্যান্য নানা কারণপ্রযুক্ত অল্পদিনের মধ্যেই সে একজন অসহনীয় বাদ্যকর হইয়া উঠিল।"

কিন্তু তার আচরণের এই উদ্ভট অসঙ্গতিগুলি নয়, তার কথাবার্তা নয়, তার চিত্তের দু-একটি প্রচ্ছন্ন আভাসই তার সম্বন্ধে প্রথম আমাদের বিশেষ করে সচেতন করে তোলে। তার নির্বুদ্ধিতা, কালীঘাটে পাণ্ডাদের হাতে পড়ে তার দুর্গতি—সবই হয় তো আমরা সহজ হাসির সঙ্গে গ্রহণ করি—কেন না অন্যের বিড়ম্বনা আমাদের হাসির অন্যতম উপাদান—কিন্তু সে যখন কর্মসূত্রের আখ্যান বলে, কিংবা শেষ দিকে গ্রামবালকের 'বাছা হনুমান'—প্রতিধ্বনিত উল্লাসে তাড়িত, আহত, হৃতবল, বিপর্যস্ত আনন্দহীন নীলকমলকে যখন দেখা যায়, তখন তার হাস্যশ্রীর অন্তরাল থেকে কারুণ্যের মর্মস্পর্শী বিধ্বস্ত মুখটি বেরিয়ে আসে—ঐ মুখে একই সঙ্গে হাসি এবং বেদনাময় নৈঃশব্দ্য লেখা। তাই নীলকমল শেষ পর্যন্ত হাস্যকর চরিত্র থাকে নি। আমার এই চরিত্রটিকে একান্তভাবে চেখভীয় চরিত্র বলে মনে হয়—নীলকমলে আমাদের হাসি ও অশ্রু পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে।

অন্য চরিত্রগুলির মধ্যেও হাস্যময়তা আছে। বিধুভূষণের দায়িত্ববোধহীন গান-বাজনার নেশা, শ্যামার কঠিন রিয়ালিজ্‌ম ['আজ আর একখানা গয়না হবে'], প্রমদার স্বার্থপর স্বাচ্ছন্দ্যলোভ ['আমার যদি ব্যামো না থাকতো, তাহলে এ কাজ দেখতে দেখতে করে ফেলতে পারতাম'], শশিভূষণের স্ত্রৈণতা ও ক্রোধ ['রাগ হইলেই তাহার কাপড় খসিয়া যাইত'], ঠাকরুণ-দিদির রূপগুণ, প্রমদার মায়ের নির্বোধ লোলুপতা, রমেশের অতিবুদ্ধি, বাবু ও তাঁর অতুলনীয় চাকর রামা, সেই নেশাচ্ছন্ন দারোগাবাবুটি, ঢাকাই চালের

মহাজন, মুদিনী, দুটি ব্রাহ্ম যুবক, হরিদাসের পুত্র—প্রভৃতি প্রায় সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই তারকনাথের সর্বাঙ্গীণ হাস্যরস সংক্রামিত হয়েছে। সুতরাং কেবল দুটি চরিত্রকে বেছে নিয়ে হাস্যরসের পরিমাপ করা অর্থহীন। আসলে লেখকের হৃদয়াগত 'Sweetness and light'-এ গ্রন্থের সমস্ত চরিত্র এবং ঘটনায় বিচ্ছুরিত হয়েছে।

ঘটনাগত হাস্যরসের সূত্রসন্ধান করতে গিয়ে মুদি দোকানের আখ্যান, কালীঘাটে পাণ্ডাদের অত্যাচার, ঢাকাই চালওয়ালা মহাজনের প্রশ্নোত্তরদানের বিচিত্র রীতি, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার আসরে নীলকমলের ব্যাকুলতা, নীলকমলের পাঁচালির আসর পণ্ড করা, গদাধরের ধরা-পড়া, দারোগাবাবুর মোহনিদ্রা, ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। সংলাপের মধ্যেও হাস্যের ছটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে প্রায়ই। এর মূলে আছে লেখকের চিত্তের সর্বময় প্রসন্নতা—যা উনবিংশ শতাব্দীর লেখকমাত্রেরই ছিল। এই প্রসাদগুণ এ কালের সাহিত্যের ভাষা থেকে অন্তর্ধান করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় সমস্ত লেখকই বিষণ্ণতম ট্রাজেডি রচনা করতে গিয়েও ভাষার মধ্যে একটি সহজ প্রসন্নতা বজায় রেখেছেন। মনে হয় এটি গত শতাব্দীর লেখকদের সহজাত জীবনদৃষ্টির সঙ্গেই জড়িত ছিল। অবশ্য ভাষার এই আনন্দরসটি ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও ছিল এবং প্রথম বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা ভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। স্কটে তত না হোক, কিন্তু রিচার্ডসন, হেনরি ফিল্ডিং, থ্যাকারে বা ডিকেন্সে এই সদাহাস্যময় কৌতুকের অভাব নেই। ডিকেন্সের প্রভাব স্বীকরণের সঙ্গে সঙ্গে তারকনাথ নিশ্চয়ই তাঁর ভাষার এই নির্মল হাস্যমুখরতাকেও গ্রহণ করেছিলেন। ফলে কোথাও কোথাও ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকলেও [যেমন, 'বোধ হয়, বেতন না থাকিলেও অনেকে জমিদারের সরকারে কার্য করিতে অসম্মত হন না' ইত্যাদি মন্তব্যে এবং মাঝিটির 'বড়মানুষ পেতল পরলে লোকে বলে সোনা' ইত্যাদি উক্তিতে] সর্বব্যাপ্ত স্বচ্ছ কৌতুকহাস্যই 'স্বর্ণলতা'র প্রধান রস। তাঁর স্যাটায়ারকে টনি সাহেব good-natured বলেছেন, হিউমারকেও বলেছেন quite।[১] এই দুটি বিশেষণপ্রয়োগ সার্থক। আক্রমণাত্মক না হওয়ার ফলে তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপও কৌতুকহাস্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে।

---

১. D. C. Roy-র স্বর্ণলতা-অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

'স্বর্ণলতা'র সমাদরসূচক নানা মতামত

দক্ষিণাচরণ রায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ঐ গ্রন্থ নানা পত্রপত্রিকায় প্রশংসিত সংবর্ধনা লাভ করে। এখানে Charles H. Tawney-রচিত ঐ অনুবাদের ভূমিকা এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকা থেকে সমালোচনার অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। এতে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নানামুখী সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

১. Charles Tawney-র ভূমিকা : ২য় সংস্করণে

"I am not surprised to find that the book has proved a success. The picture which it gives of Bengali village life is obviously faithful and correct. The author does not extenuate the faults of his countrymen and country-women, but he has an eye for their good qualities also. One cannot help feeling that if Pramada and Gadadhar have their counterparts in many a Bengali village, the self-sacrificing of the maid-servant, Shyama, perhaps the most interesting character in the book, is no merely ideal picture. ………

To me Svarnalata, apart from its value as a description of Bengali manners, seems to contain a fair allowance of quite humour and good-natured satire."

২. অনুবাদের প্রথম সংস্করণের নানা সমালোচনা ও প্রশংসা

The Englishman

"The 'Englishman' will find here the Bengali as he is with all his virtues and vices and as an insight into the inner home of the Indian the book deserves to be carefully read."

The Statesman

"The story is an accurate representation of modern Hindu domestic life in Bengal"...

The Amrita Bazar Patrika

…"The story is an accurate representation of modern Hindu domestic life in Bengal—the unhappy life of a people who have lost the high ideal of the past, and who

have fallen from this 'high state' and have learnt to worship the Sanctuary of their hearts' petty self and Mammon. ...Brothers have given place to brothers-in-law in the modern Hindu household; they cannot tolerate the loving, faithful and devoted brother, but can be a toy the whims and caprices of the worthy brothers-in-law. The wife is now a dictator in the household, and the result is that the seed of dissention is sown only to reap the harvest of disquietitude. Gadadhar chander is a familiar word—an expressive name. What a sad contrast is Sarala to Promada! The idea of a Hindu wife in the past is Sarala; and Promada is a picture of modern Hindu wife. The maid-servant, Shama, again, is an embodiment of faithfulness."

The Madras Mail

..."The author sets for his Western brother (and sister) novelists a good example by never stopping to moralise."

The Times of India

"The story is avowedly a picture of Hindu domestic life, and though the scenes and characters are those of Bengal, the sentiments, motives and actuating ideas are common to Hindu life from the Himalayas to Cape Comorine...The joint family living in harmony so long as the aged parents are alive, the introduction of dissention subsequent to their death through the incompatibility of the two brothers' wives and all the rest of it belong to all Hindu India."

The Civil and Military Gazette

"...There is much that is moral, sentimental and emotional...The jealousies and bickerings in a Hindu joint family where discordant relations exist are well portrayed."

The Hindu Patriot

"...Postrays with vivid colours the picture of Hindu domestic life."

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে কোন গ্রামে চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শশিভূষণ ও কনিষ্ঠের নাম বিধুভূষণ।

বিধুভূষণের বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এজন্য তিনি তাঁহার মাতার বড় স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহা অপেক্ষা সাত আট বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং শশিভূষণ যৎকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তখন বিধুভূষণ কেবল খেলা করিয়া কাল কাটাইতেন।

শশিভূষণ যেমন বয়সে বড় তেমনি বুদ্ধিতেও তদীয় ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তিনি পাঠশালার লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া ঐ গ্রামের জমিদারের সরকারে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের একটি কর্ম পাইয়াছিলেন। জমিদারের সরকারে কার্যের বেতন নামমাত্র। বোধ হয়, বেতন না থাকিলেও অনেকে জমিদারের সরকারে কর্ম করিতে অসম্মত হন না। ফলতঃ শশিভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠিলেন।

শশিভূষণের চাকরি ও বিধুভূষণের বিদ্যারম্ভ এক সময়েই হইয়াছিল। ভালবাসা কখনই অপ্রতিশোধিত থাকে না। হয়, যে তোমাকে ভালবাসে তুমি তাহাকে ভালবাসিবে, নতুবা তাহাকে ঘৃণা করিবে। অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ প্রতিশোধ আছে, কিন্তু ভালবাসার প্রতিশোধ এই দুইটি মাত্র। এ দুয়ের মাঝামাঝি আর কিছুই নাই। বিধুভূষণের মাতা বিধুকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতেন, মা সরস্বতীও যে, তাঁহার উপর কুপিত ছিলেন এরূপ বলা যায় না। কারণ, প্রথম প্রথম অনেকেই বলিয়াছিল, বিধু ভাল লেখাপড়া শিখিবে, কিন্তু শিখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। বিধুভূষণ পার্থিব মাতার ভালবাসা, ভালবাসার দ্বারা পরিশোধ করিতেন, কিন্তু মা সরস্বতীর যে কিঞ্চিৎ ভালবাসা ছিল, তাহা ঘৃণার দ্বারা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মা সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সমর উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে প্রথমতঃ গুরুমহাশয় পরে প্রতিবাসিবর্গ একে একে সকলেই বিধুভূষণের সহিত মা সরস্বতীর সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারেন

নাই। তাঁহারা বিধুভূষণকে যতই তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন, বিধুর ততই আমোদ-প্রমোদে অনুরক্তি ও বিদ্যাভ্যাসে বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। মূর্খতাবশতঃ কখনও কুলীনের বিবাহ বন্ধ থাকে না। এজন্য ১৫ বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পরে বউও ঘরে এলেন, এদিকে মা সরস্বতীও চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন।

বিধুর বিবাহের পর তাঁহার মাতা পাঁচ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। এ পাঁচ বৎসরের মধ্যে শশিভূষণের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ও বিধুভূষণের একটি ছেলের জন্ম ভিন্ন, এ স্থানে উল্লেখের যোগ্য আর কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই। এজন্য আমরা এইখানেই এ অধ্যায়ের শেষ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনোহারীর দোকান

গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন ; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর বঙ্কিমবাবুই বা কিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া ওস্মান ও আয়েশার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন ? ইহা ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। বিষ্ণুশর্মা তো একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটি ছিল বলিয়াই, লঘুপতনক ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেছে এবং চিত্র-গ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিমবাবু আড়াই শত বৎসর পূর্বে এক যবনতনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন। এ কথা আমাদিগের বলিবার প্রয়োজন এই যে, এই গ্রন্থে উত্তরোত্তর যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিব তাহা, হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের পার্থিব কর্ণ ও চর্মচক্ষুর অগোচর হইলেও অমূলক নহে। আমরা আপনাদিগের অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ দেখিতে ও শুনিতে পাই। অতএব সে সমুদয় অবিশ্বাস করিবেন না।

এ অধ্যায়টি পাঠ করিবার সময় পাঠকবর্গকে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, শশী ও বিধুভূষণের মাতার কাল হওয়া অবধি চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; এবং বালক-বালিকাগুলিও পাঁচ সাত বৎসরের হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায় ও ইচ্ছামত নানাবিধ পুতুল গড়াইয়া খেলা করে। দাস-দাসীর সঙ্গে হাটে বাজারে যায়; এবং প্রয়োজনমত পাড়ার অন্যান্য বালকবালিকা-দিগের সহিত দ্বন্দ্ব-বিবাদাদিও করিয়া থাকে।

যতদিন শশীভূষণ ও বিধুভূষণের মাতা জীবিত ছিলেন, ততদিন দুটি ভাইতে যৎপরোনাস্তি সদ্ভাব ছিল। ছোটটির, বড়টির প্রতি হিংসা ছিল না, বড়টিও ছোটটির প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের মাতার পরলোকগমনের পর শশিভূষণের স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক সংসারে আর অধিক কাল থাকা আয়-ব্যয় সম্বন্ধে সুবিধার বিষয় নহে। শশিভূষণ তথাচ হঠাৎ কোন অসদ্ভাব প্রকাশ করেন নাই। হাজার হউক, তবু দুই ভাই। উভয়েই এক মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছেন, এক মায়ের স্তন্য পান করিয়াছেন, এক মায়ের ক্রোড়ে পরিবর্ধিত হইয়াছেন। সহস্র বিবাদ হইলেও একজন আর একজনের প্রতি একেবারে স্নেহশূন্য হয় না। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে তো আর সে রক্তের টান নাই। মাঝে মাঝে তাঁহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু স্বামীর পোষকতা কেহই পান না, এজন্য এ পর্যন্ত গৃহবিচ্ছেদ ঘটে নাই।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত, এমন সময়ে এক দিবস বৈকালে নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ দোকান লইয়া একজন মনোহারী ঐ পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে পাড়ার যাবতীয় ছেলেপিলে ও বউ-ঝি তথায় একত্র হইল। কেহ কেহ কিনিতে লাগিল, কেহ কেহ (অর্থাৎ যাহাদের পয়সার অপ্রতুল তাহারা) জিনিসের দর জানিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যে সকল ছেলেপিলে খেলনা পাইল, তাহারা আহ্লাদে নৃত্য আরম্ভ করিল। যাহারা কিছু পাইল না তাহারা কান্না ধরিল। প্রমদা (শশীর স্ত্রী) নিজের মেয়েকে ও ছেলেটিকে এক একটি বাঁশী কিনিয়া দিলেন, কিন্তু বিধুর ছেলের জন্য কিছু কিনিলেন না। সরলাও (বিধুর স্ত্রী) সেইখানে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট পয়সা ছিল না বলিয়া পুত্রের জন্য কিছু কিনিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্রও তৎকালে সে স্থানে ছিল না। এজন্য সরলা ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় দূর হইতে 'মা, মা' করিয়া গোপাল আসিয়া কহিতে লাগিল,—"মা ওখানে কি, চল আমরা গিয়ে দেখি।"

সরলা কহিলেন, "ওখানে সব ঝগড়া করছে। আমরা ওখানে যাব না, গেলে আমাদের মারবে।"

"কেমন করে ঝগড়া কচ্ছে, কে মারবে আমি দেখব।"

"না, দেখতে নেই ; চল আমরা শীগ্‌গির পালাই।"

"না, আমি যাব।"

প্রমদা, সরলা ও তদীয় পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া, তাঁহার পুত্র-কন্যাকে বলিলেন, "যা না বিপিন, এখানে কি করিস, যা গোপালকে তোর কেমন বাঁশী হয়েছে দেখাগে। যা কামিনী, তুইও যা।"

মাতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র উভয়ে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গোপালের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল তদ্দর্শনে "আমায় একটা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরলা বলিলেন, "আজ আর নেই, কাল যখন নিয়ে আসবে তখন তোরে একটা দেব।"

গোপাল "না আছে, আজই দিতে হবে" বলিয়া ক্রন্দন ও মাতার অঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল।

সরলা কি করেন, অগত্যা মনোহারীর দোকানের নিকট গমন করিলেন।

গোপাল দোকান দেখিবামাত্রই একটি বাঁশী লইয়া যেখানে বিপিন ও কামিনী খেলিতেছিল, সেইখানে চলিয়া গেল। সরলার নিকট একটিও পয়সা ছিল না, এজন্য তিনি প্রমদাকে কহিলেন,—

"দিদি, একটা পয়সা ধার দেবে ?"

দিদি অন্য সময়ে তিন ক্রোশের কথা শুনিতে পান, ঘরের দেয়ালে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া অভ্যন্তরস্থ শিশুর স্বপ্নের কথা বলিয়া দিতে পারেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সরলা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলেন না। সরলা এজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, একটা পয়সা ধার দেবে ?"

দিদি যেন সে দেশেও নাই।

সরলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার কাছে একজন দাঁড়াইয়াছিল ; সে কহিল, "শুনতে পাও না, ছোট বউ কি বলছে, উত্তর দাও না ?"

অনেকক্ষণ নিদ্রার পর জাগ্রত হইলে যেমন চেহারা হয়, প্রমদা তেমনি মুখভঙ্গী করিয়া, এক চক্ষু দ্বারা সরলার পানে তাকাইয়া কহিলেন—"কি, কি বলছ ?"

সরলা কহিলেন, "একটা পয়সা ধার দিতে পার দিদি ?"

প্রমদা। দিদি তো মহাজন নয় যে ধার দেবে ?

"যদি ধার না দাও তো গোপালকে এই বাঁশীটা কিনে দাও।"

প্রমদা। আমি তো আর কল্পতরু হয়ে বসি নি যে, যে যা চাবে তাই দেব।

সরলা কহিলেন, "এ তো তোমার দান করা হচ্ছে না। গোপাল তোমার পর

নয়। যেমন বিপিন, কামিনী, তেমনি গোপালও তোমার একটি মনে কর না কেন?”

“লোকে যা মনে করে, তাই যদি হত, তবে কি আর দুঃখ থাকত? আমি যদি মনে কল্লেই রাজরানী হতে পাত্তাম, তা হলে কি আর আমি এমন করে বেড়াই?”

সরলা প্রমদার এই সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন।

প্রমদা বলিতে লাগিলেন, “কেমনই পৃথিবীর লোক, এদের যতই দাও, ততই এদের আশা বৃদ্ধি হয়। আমার যাহা মাসে মাসে আসে, আমি যদি তা রেখে চলতে পারতাম, তবে আমার ভাবনা কি? কিন্তু তা তো হবার জো নাই। একজন মাথায় মোট করে আনবে, আর পাঁচজন তাই ঘরে বসে উড়াবে। উনি যে বোকা, কিছুই বুঝেন না। ওঁর বুদ্ধি যদি থাকত তা হলে কি আজও ওঁর খেটে খেটে মাথার ঘাম পায়ে পড়ত? এতদিন টাকার বস্তার উপর বসে থাকতেন?” প্রমদা আরও বলিতেন, কিন্তু তাঁর স্বামী বোকা এই দুঃখে একেবারে সহস্রধারে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

পাড়ার কোন কোন গিন্নী যাঁরা সময়ে সময়ে প্রমদা বড়ঘরের মেয়ে, কেমন শান্ত, কেমন সুন্দর মুখখানি, কেমন পটলচেরা চক্ষু দুটি, কেমন বাঁশীর মত নাকটি, ইত্যাদি সত্য কথা অপক্ষপাতে বলিয়া দরকারমত নুনটুকু তেলটুকু লইয়া যান, তাঁহারা প্রমদার রোদনে একবারে গলিয়া গেলেন। কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, দুই এক জন সরলাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এক জন বেঁটে স্থূলকায় বিধবা ছিলেন। তাঁহার বিশেষ বাজিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, “ঠিক কথা বলব, তার আর ভয় কি? সরলার বড় লম্বা কথা; প্রমদার সোয়ামী রোজগার করে, তবু প্রমদার মুখে একটু উঁচু কথা কেহ শুনতে পায় না।”

একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিলে জঙ্গলের সব শৃগাল যেমন ডাকিয়া উঠে, তেমনি তথায় যত বিধবা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দিগম্বরীর মতে মত দিয়া সরলার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কথার প্রসঙ্গে কথা উঠে। সরলার কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিলেন। পরিশেষে স্থির হইল যে, একেলে মেয়ে একটিও ভাল নয় (প্রমদা ছাড়া)। মানব-প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন বৃদ্ধেরা যদিও যুবকদিগকে ‘ছেলেমানুষ’ বলিয়া তুচ্ছ করেন, তথাপি তাঁহারা পুনরায় যুবা হইতে পারিলে তিলার্ধও গৌণ করিতেন না। ফলতঃ যৌবনকালের তুল্য কাল নাই। সকলেই যুবা হইবার নিমিত্ত শশব্যস্ত। বালকেরা কামাইয়া গোঁফ তোলে, বৃদ্ধেরা কলপ দিয়া চুল কালো করে।

তবে যে প্রাচীনেরা 'ছেলেমানুষ' এই কথাটি গালিস্বরূপ প্রয়োগ করেন, সেটি বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রকৃত ভাব নয়।

সরলা সজলনয়নে কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন। মনোহারী আর তথায় অপেক্ষা করা বৃথা মনে করিয়া দোকান বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সরলা অধিকতর ভীতা হইলেন। এদিকে গোপাল কাছে নাই যে বাঁশীটি ফিরাইয়া দেন, অথচ মূল্যদানেরও শক্তি নাই। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মনোহারী গমনোন্মুখ হইল। দিগম্বরী, সেই বেঁটে স্থূলকায় বিধবাটি কহিলেন, "তোমার পয়সা নে গেলে না?" মনোহারী উত্তর করিল, "আমি ও বাঁশীটির দাম চাই না, অনেক ব্যাপার করে থাকি, ভাল, একটা নয় অমনি দিলাম।" সরলা এই কথা শুনিয়া পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর দুঃখিত হইলেন। সুবুদ্ধি মনোহারী তাঁহার মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিতে পারিল বিনামূল্যে দানের কথা বলা ভাল হয় নাই। এজন্য পুনরায় কহিল, "আমি তো প্রায়ই এ পাড়ায় আসি, এবার যে দিন আসব, সেই দিন পয়সা নিয়ে যাব।" সরলা এই কথা শুনিয়া যারপরনাই শান্তি লাভ করিলেন। প্রমদা যারপরনাই দুঃখিতা হইলেন। আর উপস্থিত গিন্নিরা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোনার গাছে মুক্তার ফল

সরলা মনোদুঃখে বাটী আসিলেন এবং নিয়মিত গৃহকর্ম সমাপন করিয়া বিরলে বসিয়া মনে মনে বৈকালের ঘটনার পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের বল-বুদ্ধি সমুদয়ই স্বামী, কিন্তু সরলার সে বল-বুদ্ধি না থাকার মধ্যে। বিধুভূষণ সমস্ত দিনই পাড়ায় থাকিতেন। আহারের সময় কেবল বাটীতে পদার্পণ করিতেন। গৃহ-কার্য দেখিতেন না; এক পয়সা উপার্জনের ক্ষমতা ছিল না। গীত, বাদ্য এবং তাস-পাশাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু তিনি যৎপরোনাস্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। দাদার সহিত বিবাদ করা আর পিতার সহিত বিবাদ করা, তিনি এক কথাই মনে করিতেন। লেখাপড়া দ্বারা যাহাদের স্বভাব পরিমার্জিত হয় নাই, তাহারা অত্যন্ত রাগী হইয়া উঠে। বিধুরও এ দোষটি ছিল। তিনি সামান্য কারণে রাগ করিতেন না বটে, কিন্তু একবার করিলে আর সে রাগ সহজে দূর হইত না।

সরলা ভাবিতে লাগিলেন, বৈকালের ঘটনা তাঁহাকে বলা কর্তব্য কি না। বলিলে যে কোন বিশেষ উপকার হইবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আবার মনের দুঃখ ব্যক্ত না করিলেও চিত্তের স্বচ্ছন্দতা জন্মে না। এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র সরলা অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুই কাঁদচিস্ কেন?"

সরলা কহিলেন, "কৈ কাঁদচি?"

"ঐ যে তোর চোক দিয়ে জল পড়ছে?"

সরলা কহিলেন, "আমার পেট ব্যথা কচ্ছে।"

গোপাল উত্তর করিল, "আমার পেট কামড়ালে শ্যামা যে ওষুদ দেয়, সেই ওষুদ খাস না কেন? যাই, আমি শ্যামাকে ডেকে দি, তার ওষুদ খেলে সেরে যাবে।"

সরলা কহিলেন, "না না, শ্যামাকে ডাকতে হবে না; আমার পেট ব্যথা কচ্ছে না; আমার চোকে কি পড়েছে, তাই চোক দিয়ে জল বেরুচ্ছে।"

"তবে আয় তোর চোকে ফুঁ দিয়ে দি, তা হলে বেরিয়ে যাবে এখন।" এই বলিয়া গোপাল নিকটে আসিল। সরলা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

স্নেহের কি অনির্বচনীয় গুণ! সরলা কাঁদিতেছিলেন কেন, গোপাল তাহার কিছুমাত্র অবগত ছিল না, কিন্তু মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটিও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সরলা গোপালের ছলছল নেত্র নিরীক্ষণ করিয়া সমুদয় দুঃখ বিস্মৃত হইলেন এবং তাহাকে কোলে লইয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিলেন। গোপাল মাতার স্কন্ধে শিরঃস্থাপন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তদ্দর্শনে সরলা তাহাকে কথা কহাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে হাসাইবার জন্য নিজেও হাসিতে লাগিলেন।

সুন্দরী যুবতীর সাশ্রুনয়নে হাসি যে একবার দেখিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। সোনার গাছে মুক্তাফল, এর সহিত কি তুলনা হইতে পারে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সোনার চন্দ্রহার

পিতামাতার সদ্‌গুণ সন্তানে সর্বদা বর্তে না বটে, কিন্তু তাহারা দোষের ভাগ সচরাচর সুদসমেত প্রাপ্ত হয়। পিতা পুত্র উভয়েই পণ্ডিত অতি বিরল, কিন্তু উভয়েই চোর এরূপ প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। প্রমদা তাহার এক উদাহরণস্থল। তাঁহার পিতার নাম রামদেব চক্রবর্তী। বাটী শশিভূষণের বাটীর অতি নিকটে। দ্বেষ, হিংসা, কলহপ্রিয়তা ইত্যাদি কতকগুলি দোষ রামদেব চক্রবর্তীর বংশানুক্রমিক; তাঁহার বংশের কন্যা যে পরিবারে গিয়াছে, সেই পরিবারই দ্বন্দ্ব-কলহের ভদ্রাসন হইয়াছে। প্রমদা এই পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার যে সরলতা একটি গুণ ছিল, তাহার লেশমাত্রও পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। বিবাহ হওয়া অবধি প্রমদা দুটি একটি টাকার মুখ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে যখন শাশুড়ীর মৃত্যুর পর গৃহের একমাত্র কর্ত্রী হইলেন, তখন তিনি আর পৃথিবীকে তৃণজ্ঞানও করিতেন না।

পূর্বে বলা গিয়াছে, বিধুভূষণ কোন কাজকর্ম করিতেন না। কিন্তু সরলার নিকট হইতে প্রমদা তাহার বিলক্ষণরূপে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেন। প্রমদা নিজ গৃহ হইতে কখনই বাহির হইতেন না। রন্ধনাদি এবং গৃহকার্য সমুদয়ই সরলাকে করিতে হইত। যদি কেহ কখনও এ বিষয় লইয়া প্রমদাকে কিছু বলিত, প্রমদা অমনি বলিতেন, "কিই বা কাজ, যে তা নিয়ে এত কথা হয়, আমার যদি ব্যামো না থাকত, তা হলে এ কাজ দেখতে দেখতে করে ফেলতে পারতাম।" প্রমদা যখন তখন এই পীড়ার কথা কহিতেন। পীড়া কি, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কারণ সে পীড়াবশতঃ প্রমদাকে একদিনও উপবাস করিতে দেখা যায় নাই, শরীর কখন ক্ষীণ হয় নাই, বরঞ্চ উত্তরোত্তর পুষ্টি দেখা যাইত। পীড়াটির এই এক লক্ষণমাত্র জানা আছে যে, সকালে সকালে আহার না হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত। পাঠকবর্গ এখন বুঝুন, এ কোন্ পীড়া।

বৈকালে মনোহারীর দ্রব্যাদি লইয়া প্রমদা ও সরলার যে কথোপকথন হয়, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সরলা বাটী আসিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। অতঃপর প্রমদা কি করিলেন, শ্রবণ করুন।

স্বভাবতঃ যেরূপ পদধ্বনি করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক শব্দ করিয়া

প্রমদা নিজগৃহে প্রবেশপূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। বাটীর লোকে সেই শব্দ শুনিয়া স্থির করিল, আজ একটা বিভ্রাট ঘটিবে।

প্রমদার বাক্যগুলি এমন মিষ্ট যে, একবার শুনিলে আর কেহ তাহা দুইবার শুনিতে ইচ্ছা করিত না স্তুতরাং কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কেহ অগ্রসর হইল না।

বিপিন পাঠশালা হইতে বাটী আসিয়া মাতার নিকট যাইতেছিল, কিন্তু দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া গেল। কামিনী 'মা, মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমদা তথাপি উত্তর দিলেন না।

বাটীর দাস-দাসী, কর্তা ও গৃহিণীরই বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু শশিভূষণের বাটিতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল না। শ্যামা প্রমদাকে যত ভক্তি না করিত, সরলাকে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত; তাহার কারণ উভয়কেই সমান তিরস্কার খাইতে হইত। এজন্য উভয়ের মধ্যে মিত্রতা হইয়াছিল। সরলাকে তিরস্কার করিলে শ্যামার চক্ষে জল আসিত। শ্যামাকে তিরস্কার করিলে সরলা অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না। শ্যামার এক বিশেষ গুণ ছিল যে, যে যেখানে পরামর্শ করুক না কেন, শ্যামা তাহা শুনিতে পাইত। এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সর্বস্থানে যাইত যে, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। কথাটি সমাপ্ত হইলেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সরলার নিকট আসিয়া আনুপূর্বিক সমুদয় বর্ণনা করিত। সরলাও শ্যামার নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না।

সরলা শ্যামাকে মনোহারীর দোকান সম্বন্ধীয় সমুদয় বিবরণ কহিলেন। শ্যামা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "আজ আর একখানা গহনা হবে।"

ক্রমে দিবা অবসান হইল। শশিভূষণের বাটী আসিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া, শ্যামা নিয়মিত জলগাড়ুটি, গামছাখান, ও খড়মজোড়া বারান্দায় রাখিল এবং ঠাকুরঘরে আহ্নিকের জায়গা করিয়া দিল। সরলার চিত্তে নানাবিধ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রমদা শয্যোপরি শয়ন করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন। নেত্রাসার বর্ষণ হইতে লাগিল। পাড়া হইতে খেলা করিয়া বিপিন আসিয়া 'মা, মা' করিতে লাগিল। কামিনী কান্না ধরিল। এমন সময় শশিভূষণ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রত্যহ যেরূপ প্রথমতঃ নিজগৃহে যাইতেন, অদ্যও শশিভূষণ সেইরূপ যাওয়াতে গৃহদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া 'ঘরে কে আছে' বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি কোন উত্তর

পাইলেন না। পরিশেষে শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "শ্যামা, এরা কোথায় গিয়াছে?"

শ্যামা উত্তর করিল, "ঐ ঘরের মধ্যেই আছেন।" এই বলিয়া একটি কলসী লইয়া জল আনিবার ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শশিভূষণ এবার কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, দোর খুলে দেবে, না আমি চলে যাব?"

প্রমদা বুঝিতে পারিলেন যে, আর অধিক কস্‌টাইলে লেবু তিক্ত হইবে; এজন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। শশিভূষণ তাঁহার আরক্ত নয়ন, মলিন বদন ও ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, কাণ্ডটা কি। কারণ প্রমদার পক্ষে এরূপ রাগ করা নূতন ব্যাপার নহে। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইলেই রাগ হইত। একখান নূতন গহনা কিংবা একখান ভাল কাপড় লইতে হইলেই প্রমদা রাগ করিতেন। শশিভূষণও প্রার্থিত দ্রব্যাদি দিয়া রাগ ভঙ্গ করিতে ক্রটি করিতেন না। এজন্য শশিভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আজ আবার কি?"

কোন উত্তর নাই।

"বলি, আজ আবার কি হলো?"

নিরুত্তর। যেন দেওয়ালের সহিত কথোপকথন হইতেছে।

তৃতীয়বার জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর না পাইয়া, শশিভূষণ মনে করিলেন, আজকার ব্যাপারটি বড় লঘু নহে, শ্যামাকে ডাকিয়া বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাউক। এজন্য 'শ্যামা শ্যামা' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারও উত্তর না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বিপদ, কেউ কি আমার কথার জবাব দেবে না?"

এই কথা শুনিয়া প্রমদা সকরুণ বচনে কহিলেন, "কি, কি বলছ?"

শ। এতক্ষণ পরে হুঁস হলো নাকি? তুমি কি এখানে ছিলে না? না কালা হয়েছ যে, আমার কথা এতক্ষণ শুনতে পাওনি?

প্র। আমি কালাই হই, আর কানাই হই, লোকের তাতে কি ক্ষেতি? আমাকে যদি কেউ দেখতে না পারে, তবে আমাকে বলে না কেন? তা হলে আমি চলে যাই, তাদের উৎপাত যায়।

শশিভূষণ সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর বিরক্ত হইয়া বাটী আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রোজই বল চলে যাব। কৈ যাও দেখি কোথায় যাবে?"

প্র। কেন, আমার কি আর যাবার জায়গা নেই? বাপের বাড়ী গিয়ে পড়ে থাকলে তারা চারটি না দিয়ে খেতে পারবে না।

বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই, কুলোপানা চক্র। প্রমদার বাপের বাড়ীর অবস্থা তো অন্ত ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ। নিকটে বলিয়া প্রমদা মাঝে মাঝে চালটে ডালটে, কখন টাকাটা সিকেটা চুরি করিয়া পাঠাইয়া দিতেন; এবং তাহার জোরেই রামদেবের প্রত্যহ আহার চলিত।

শশিভূষণ টের পাইয়াও সে সকল দেখিতেন না। এজন্য প্রমদার বাপের বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া তাঁহার হাসি আসিল। বলিলেন, "যাও, এক্ষণেই যাও, কিন্তু আমি চাল ডাল পাঠাতে পারব না।"

বাপের বাড়ীর নিন্দা কখনই স্ত্রীলোকের সহ্য হয় না। বিশেষতঃ প্রমদা রাগ করিয়াছিলেন, এজন্য শশিভূষণের ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া একেবারে মর্মে বেদনা পাইলেন এবং অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শশিভূষণ বুঝিতে পারিলেন, প্রমদাকে গুরুতর বেদনা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তখনই কোন সান্ত্বনার কথা কহিলে বেদনার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্থানান্তরে গিয়াও অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। এজন্য অর্ধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, প্রমদা শয়ন করিয়াই আছেন। কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? কি হয়েছে?" প্রমদা উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তথাপি কোনও উত্তর পাইলেন না।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শশিভূষণ আরম্ভ করিলেন, "অদৃষ্টে যার যা লেখা থাকে, কার সাধ্য তাহার খণ্ডন করে। মনে করে আসতেছিলাম, যে চন্দ্রহারের জন্য এক বৎসরের দরবার হচ্ছে, আজ তার বায়না দিলাম; আজ বাড়ী গিয়ে বড় আদর পাব। কিন্তু অদৃষ্টে তা তো নেই, সুতরাং কি প্রকারে তা ঘটবে? আদর পড়ে মরুক, আজ কথাটিও শুনতে পাই না।"

শশিভূষণ পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "বিধু কহিত, 'এখন চন্দ্রহার স্থগিত রেখে বরঞ্চ বৈঠকখানাঘরটি সম্পূর্ণ করুন।' আমি মনে করলাম বৈঠকখানা তো হবেই, যেখানে অর্ধেক হয়েছে আর অর্ধেক বাকি থাকবে না।"

প্রমদা আর থাকিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ, সোনার চন্দ্রহারের কথা, দ্বিতীয়তঃ, তদ্বিষয়ে বিধুভূষণের প্রতিবন্ধক হওয়া, ইহা শুনিলে মৃত হইলেও প্রমদার চৈতন্য হইত। তিনি কহিলেন, "ওদের দুইজনের জ্বালাতেই তো চিরকালটা জ্বালাতন হলাম। আমাদের এত অনিষ্ট করেও কি ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না?"

শশিভূষণ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা কারা, আর তোমাকেই বা কি জ্বালাতন কল্লে?"

প্র। কি জ্বালাতন কল্লে আবার জিজ্ঞাসা করছো? কেন, বাকি রয়েছে কি?

শ। স্পষ্ট করে না বল্লে তো আমি বুঝতে পারি না। আমি তো জান্ নই যে, এক কথার অর্ধেক না শুনিয়াই সম্পূর্ণ বুঝতে পারব? তুমি তো একা বিধুর নাম কর নাই, 'ওরা' বললে, সে কে কে, তা কি প্রকারে জানব?

প্র। কে কে? আবার কে হতে পারে? কর্তা আর গিন্নী। কর্তাটি আমার পাছে লেগেছেন; আমার কিছু হলেই যেন তাঁর সর্বনাশ হয়। তিনি যেন নিজের টাকা ভেঙ্গে দিচ্ছেন। আর গিন্নীটি, যাতে পাঁচজনের কাছে অপদস্থ হই, তারই চেষ্টায় থাকেন।

শ। কেন, বিধু তোমাকে তো না দেবার কথা বলে নি, সে বলেছিল লোক-জনটা এলে স্থানাভাবে কষ্ট হয়, এজন্য বৈঠকখানা আগে হলেই ভাল হয়।

প্র। ইচ্ছায় বলি কি তোমার বুদ্ধি কম? তুমি ভালমানুষ, ওসব তো বুঝতে পার না। বিধুটিকে বড় সহজ লোক জ্ঞান করো না। বৈঠকখানার উপর ওর এত যত্ন কেন, তা তো জান না। ও কি বৈঠকখানা হলে তোমার যে ভাল হবে, তার জন্য বলে? তা নয়। ও তো এখনও পাড়ায় থাকে, তখনও পাড়ায় থাকবে। তবে কিনা বৈঠকখানা হলে তার ভাগ পাবে; আমার গয়না হলে তো পৃথক হবার সময় তার অংশ পাবে না।

প্রমদা যে শশিভূষণকে বোকা বলিতেন, সেটি বড় মিথ্যা কথা নয়; বস্তুতঃ এসব বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি তাদৃশ খেলিত না। কি প্রকারে প্রজাদিকে কষ্ট দিয়া পয়সা আদায় করিতে হয়, এবং উহার জমা-খরচ করিতে হয় তাহাই বুঝিতেন। এক্ষণে প্রমদা যাহা বলিলেন, তাহা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সত্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, হাঁ, এতদিনের পর বুঝতে পারলাম। এইজন্যই ভায়া আমাদের যখন তখন সর্ব-কার্যের আগে বাড়ীটি সম্পূর্ণ করা ও বিষয়আশয় করার পরামর্শ দেন; আর স্ত্রীর গয়না দেওয়া আর টাকা জলে ফেলে দেওয়া সমান বলে থাকেন।

এতদূর পর্যন্ত মনে মনে করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমি যদি আগে জানতে পারতাম, তবে একখানিও ইট প্রস্তুত করতাম না।"

প্র। তুমি তো আমার কথা শুন না, জিজ্ঞাসাও কর না। তুমি মনে মনে ভাব, তোমার ভাইটি যেন রামের ভাই লক্ষ্মণ। কিন্তু ওটি যে ভরত, তা তো জান না।

শ। বৈঠকখানা ঐ পর্যন্তই থাকল, দেখি কে করে? আর কি বলছিলে? গিন্নীর কথা কি বলছিলে?

প্র। বলতেছিলাম গিন্নীটি কর্তাকে হারান, তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্যি? তাঁর সর্বতোভাবে যত্ন, কিসে আমাকে আর তোমাকে অপমান করতে পারেন!

শ। কি, আমাকে অপমান? যারই খাবেন, তারই বদনাম করবেন?

প্র। সে কথা বলে কে?

শ। কি কি অপমানের কথা বলেছে বল তো?

প্র। বাকিই বা কি রেখেছে? তুমি শুনলে প্রত্যয় করবে না; আজ একজন মনোহারী দোকান নিয়ে এসেছিল। বিপিন, কামিনী ছাড়ে না, তাই ওপাড়ার দিগম্বরী ঠাকুরুণদিদির কাছ থেকে দুটি পয়সা ধার করে ওদের দুটি বাঁশী কিনে দিলাম। ছোটগিন্নী তাই দেখে রাগ করে, সেখান থেকে চলে এসে, গোপালকে ডেকে নিয়ে একটা বাঁশী দিলেন। দাম দেবার সময় বললেন, "দিদি, আমাকে একটা পয়সা ধার দাও, আমি সুদ দেব।" আমি বললাম, "এক পয়সার আবার সুদ কি ভাই, আমি তো জানি না।" ছোট বউ বল্লেন, "চিরকাল মহাজনী করছ, জান না কেন?" আমি শুনে অবাক হয়ে থাকলাম। ছোট বউ তারপর যা মুখে এলো তাই বললে।

শ। কি কি কথা বললে?

প্র। আমার তত মনে নাই, আমি সাদা মানুষ, অত কথার প্যাঁচ বুঝি না; ও পাড়ার সকলে ছিল, শুনেছে। তোমার যদি শুনবার ইচ্ছা থাকে কাল দিগম্বরী ঠাকুরুণদিদিকে ডেকে আনব; সেই সমস্ত বলবে।

শ। হাঁ, এ শোনা উচিত। কাল অবশ্য করে দিগম্বরীকে ডেকে আনা হয় যেন।

প্র। তা তো হবে, কালকের কথা কাল হবে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বলবে?

শ। কেন বলব না, অবশ্য বলব।

প্র। যথার্থ কি চন্দ্রহারের বায়না দেওয়া হয়েছে?

শশিভূষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ হয়েছে; কেন?"

প্র। তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে হয় নাই।

শ। তবে হয় নাই।

প্র। কেন তবে মিথ্যা কথাটি বললে?

শ। মিথ্যা বলেছি বটে, কিন্তু কাল সত্য হবে। কালই সেক্‌রা ডেকে বায়না দেব। ভেবেছিলাম আগে বৈঠকখানাটাই সমাধা করব, কিন্তু তোমার মুখে

যেসব কথা শুনলাম, তাতে আর বাড়ী প্রস্তুত করতে আমার ইচ্ছা নাই। নিজে পরিশ্রম করে কে কোথায় পরকে অংশ দিয়ে থাকে ?

প্রমদা আর কথা কহিলেন না।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে শ্যামা দাসীর গুপ্তকথা শোনা একটা রোগ ছিল। দ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া উল্লিখিত কথোপকথনের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সরলার নিকটে গিয়া কহিল, "কেমন খুড়িমা, আমি যা বলেছিলাম, তা সত্য হলো কিনা ?"

সরলাও কি কথোপকথন হইয়াছে, শুনিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। শ্যামাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি শ্যামা ? কি সত্য হলো ?"

শ্যা। আমি তো বলেছিলাম, যেদিন রাগ করবেন সেই দিনই একখানা গয়না হবে। আজ সোনার চন্দ্রহার।

শ্যামা চন্দ্রহার হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ সরলাকে কহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সরলার উৎকণ্ঠা

যে রাত্রিতে প্রমদা ও শশিভূষণ পূর্বাধ্যায়োল্লিখিত কথোপকথন করেন বিধু সে রাত্রি বাটীতে আইসেন নাই। পাড়ায় এক বাটীতে যাত্রা হইতেছিল, তিনি সেইখানেই ছিলেন। স্ত্রীলোকের সকল বল স্বামী; সরলা এসমস্ত বৃত্তান্ত স্বামীকে কিছুই জানাইতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। কি করা কর্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে করিলেন, আজ নিদ্রা যাই। শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না। শয্যায় উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে নিদ্রা হইবে। কিন্তু বসিয়া থাকিয়াও কোন ফল দর্শিল না। নানাবিধ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনা কর্তব্য। 'শ্যামা' 'শ্যামা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্যামা উঠিল। সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তুই একবার গিয়ে ওকে ডেকে আনতে পারিস।"

শ্যা। কোথা থেকে ডেকে আনব ? তিনি কোথায়, কেউ কি জানে ?

স। সে যাত্রার কাছে আছে। আমাকে বলে গিয়েছিল, আজ যাত্রা শুনতে যাবে।

রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কাহাকে কোন কাজ করান বড় সহজ নহে। নিদ্রা তন্দ্রা ইত্যাদিতে পুরুষকেই জড়ীভূত করিয়া ফেলে—শ্যামা তো দূরে থাকুক।

আপাততঃ দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জন করিয়া শ্যামা কহিল,—

"আমি কেমন করে সেখানে যাব, আর অত লোকের মধ্যে আমাকে যেতেই বা দেবে কেন?"

স। শ্যামা, তুই আজ নূতন যাত্রার কাছে যাচ্ছিস না কি? আর কখন কি বেশী লোকের কাছে যাস নি?

"তোমাকে তো আর কথায় পারব না। এই চললাম"—এই বলিয়া শ্যামা প্রস্থান করিল।

শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া সরলার চিত্তচাঞ্চল্যের কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইল। ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন। প্রত্যূষের সুস্নিগ্ধ সমীরণ সঞ্চালনে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। সরলা নিদ্রিত হইলেন।

শ্যামা যাত্রার নিকটে গিয়া ক্ষণকাল এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান করিল, বিধুকে দেখিতে পাইল না। তখন যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ যে বাজাইতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল; শ্যামা দেখিল, বিধুভূষণ বাজাইতেছেন। কিন্তু কেন যে তিনি যাত্রার দলে বসিয়া বাজাইতেছেন বুঝিতে পারিল না। শ্যামা তাহার সহিত চক্ষে চক্ষে দেখা হইবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া আবার একাগ্রমনে যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে সরলা নিদ্রিত আছেন। নিদ্রা কি মনোহর। লোকে নিদ্রিত হইলে রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, সকলই বিস্মৃত হয়। নিদ্রার কি মোহিনী শক্তি! এরূপ শক্তি আর কাহার আছে? দিবসে সংসার-কোলাহলে চিত্তে যে সমস্ত উদ্বেগ জন্মে, রজনীতে নিদ্রাকর্ষণ হইলে সে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়। নিদ্রার ন্যায় শান্তিদায়িনী সংসারে আর কিছুই নাই। নিদ্রা মনের প্রিয়তমা সহচরী। চিন্তাদগ্ধ হৃদয়কে নিদ্রা সখীর ন্যায় সুস্থ করে। কিন্তু দুঃখীর সুখ কোথাও নাই। চিরদুঃখিনীর ভাগ্যে কুস্বপ্ন নিদ্রার অরি হইয়া তাহাকে শান্তিসুখ হইতে বঞ্চিত করে।

সরলা পুত্রটি কোলে করিয়া শয্যায় নিদ্রিত আছেন। মস্তকের নিকট জানালার উপর একটি তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাতাসে দীপশিখা অল্প অল্প নড়িতেছে, এজন্য মুখখানি মাঝে মাঝে ভাল দেখা যাইতেছে না। বাতাস বন্ধ হইলে আবার সুন্দর দেখাইতেছে। মস্তকের বসন বাম পার্শ্বে পড়িয়াছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে। লোহিত ওষ্ঠ দুটি অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। মুখভঙ্গী চিন্তাশূন্য বোধ হইতেছে না। নিদ্রিত হইয়াও কি সরলা ভাবিতেছেন?

নিদ্রাভঙ্গ হইলে সরলা দেখিলেন, রজনী শেষ হইয়াছে। সুতরাং তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া গোপালের হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকৃরুণদিদি

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্বে দিগম্বরী ঠাকৃরুণদিদির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সহিত আপনাদিগের বিশেষ পরিচয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। শশিভূষণের বাটীর দশ-বার রশি পশ্চিমে তাঁহার বাটী। ঠাকৃরুণ-দিদির দুইখানি ঘর। একখানি থাকিবার ও আর একখানি রন্ধনশালা। সম্মুখে ছোট একটু উঠান, উঠানের দক্ষিণে ছোট একটু বাগান। বাগানের মধ্যে গুটিকতক ফুল-গাছ, একটি কি দুটি পেঁপের গাছ, আর একটি নারিকেল গাছ। বাড়ীখানি এমনি পরিষ্কার যে, সিন্দুরটুকু পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। এই বাটীতে ঠাকৃরুণদিদি 'বিকল্পে' একাকিনী বাস করেন।

ঠাকৃণদিদির রূপগুণের পরিচয় দেওয়া বড় সহজ নয়। তাঁহার বর্ণটি জবাফুলের মত নয়, গোলাপ ফুলের মত নয়, মল্লিকা ফুলের মত নয়, আয়েশার মত নয়, আশ্-মানির মত নয়, প্রদীপের আলোকের মত নয়, মোমবাতির মত নয়। এ সমস্ত মিশ্রিত করিলে যেমন হয়, তাহার মতও নয়। কেমন পাঠকবর্গ! বুঝেছেন তো এখন ঠাকৃরুণদিদির বর্ণটি কেমন? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে পুস্তকখানি এইখানেই বন্ধ করুন। 'নভেল' পড়া আপনার কাজ নয়। গ্রন্থকারদিগের ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করিবার নিয়ম নাই। আর যদিও ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কি ক্ষতি? আপনাদেরই বুদ্ধির স্থূলত্ব প্রকাশ পায়। অতএব যদি আপনারা 'অল্পবুদ্ধি' এই গালটি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন, তবে আমি কেবলমাত্র বর্ণ কেন, ঠাকৃরুণদিদির সম্বন্ধে যাহা কিছু আমি সমুদয়ের বর্ণনা করিতে পারি।

ঠাকৃরুণদিদির বর্ণ কোন্ কোন্ জিনিসের মত নয়, তাহা বলা হইয়াছে; কোন্ কোন্ জিনিসের মত, তাহা এক্ষণে বলা কর্তব্য। অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তার কালি, রান্নাঘরের ঝুল, আলকাতরা ইত্যাদির ন্যায়। ঠাকৃরুণদিদি বেঁটে স্থূলকলেবরা; মস্তকটি প্রায় কেশশূন্য, দাঁতগুলি মাঘ মাসের মূলার মতন, চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, পদদ্বয় স্তম্ভাকার, পায়ের অঙ্গুলিগুলি এখানে একটি ওখানে একটি, যেন পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়াছে। ঠাকৃরুণদিদি তাঁহার পিতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন, এজন্য দশ-বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তাঁহাকে ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরাইয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে

সর্বত্রই লইয়া যাইতেন। ঠাকুরুণদিদিকে না চিনিত এমন লোকই ছিল না; ঠাকুরুণদিদিও সকলকেই চিনিতেন। আপাততঃ তাঁহার প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। জন্মাবধি বিধবা বলিলেই হয়। বিবাহ হইয়া এত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বামীর পরলোক-প্রাপ্তি হয় যে, তিনি ক'দিন সধবা ছিলেন, বলা বড় দুঃসাধ্য। ঠাকুরুণদিদি বৈধব্যাবস্থায় একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন। তিন-চারি দিবসের মধ্যেই কলহ-বিবাদ করিয়া তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার পিতার কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহাতে জীবিকানির্বাহ হয়। ঠাকুরুণদিদির এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে তাঁহার বাটীতে যে কেহ যাউক না কেন, কাহাকেও অনাদর করিতেন না। সকলকেই সমভাবে যত্ন করিতেন।

প্রত্যূষে যেমন সরলা গোপালের হস্ত ধারণ করিয়া বাহির হইবেন, সম্মুখে ঠাকুরুণদিদিকে দেখিতে পাইয়া অমনি গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরুণদিদি অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রমদার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অবিলম্বেই সরলা বাহির হইয়া দেখিলেন, ঠাকুরুণদিদি প্রমদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলার গৃহ হইতে প্রমদার গৃহ একপ্রাচীর মাত্র ব্যবধান; এজন্য তিনি নিজগৃহে থাকিয়া কি কথোপকথন হয় শুনিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই শুনিতে না পাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া সংসারের কাজকর্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল পর্যন্ত পরামর্শ করিয়া ঠাকুরুণদিদি প্রমদার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সরলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "একটা কথা শুনে যাও।"

সরলা শঙ্কিতা হইয়া ঠাকুরুণদিদির নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "কি?" ঠাকুরুণদিদি কিঞ্চিৎ কৃত্রিম দুঃখ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "কথা এই ভাই—আমার দোষ নাই—আমি কি করব ভাই—আমাকে তুমি এক কথা বলে পাঠালে, প্রমদার কাছে বলতে হবে, আর তিনি এক কথা বলে পাঠালে তোমার কাছে বলতে হবে। আমাকে ভাই গালি দিও না, আমি হয়েছি সীতাহরণে মারীচ—"

সরলা ভূমিকা শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। ঠাকুরুণদিদির উপমা শেষ হইতে না হইতেই কহিলেন, "সে সব তুলনায় আর কাজ কি? তোমাকে যা বলতে বলেছেন, তাই বল, তোমার কথার বাঁধুনি শুনে আমার প্রাণ চমকে যাচ্ছে।"

ঠা। কতকটা চমকাবার কথাই বটে। তা যেখানে বলতে হবে, একেবারে বলে ফেলাই ভাল। প্রমদা বললেন কি, একত্র থাকলে ক্রমাগত বিবাদ-বিসংবাদ হয়। অতএব এ ঝগড়া-বিবাদে কাজ কি? আজ অবধি তুমিও পৃথক হয়ে খাও, আর তিনিও পৃথক হউন। আমার কি ভাই, আমি বলে খালাস।

কথা শুনিয়া সরলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। যে ভয়ে তিনি কখনও মুখ

তুলিয়া প্রমদার নিকট কথা কহেন নাই, যে ভয়ে তিনি এত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ সেই বিপদ উপস্থিত! বিধুভূষণও বাড়ী নাই। এ ঝগড়ার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না। হয়ত তিনি সমুদয় দোষ সরলারই মনে করিবেন।

কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে থাকিয়া সরলা সজলনয়নে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরও কি এই কথা বললেন ?"

ঠাকুরুণদিদি একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "শিব কি কখন শক্তি ছাড়া থাকেন!"

ঠাকুরুণদিদির এই পৌরাণিক শাস্ত্র-সংবলিত উত্তর শুনিয়া এত দুঃখেও সরলার মুখে হাসি আসিল। কিন্তু অবিলম্বেই সে হাসি সংবরণ করিয়া সকরুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরুণদিদি, এখন উপায় কি ?"

ঠা। উপায়ের কথা আমি কি বলব, সে তুমিই জান। শশিভূষণ আমাকে বললেন, "ঠাকুরুণদিদি, আজ তুমি চারিটি ভাত না দিলে আমায় অনাহারে থাকতে হয় ; ওর ব্যামো, ও তো কোন কর্ম করতে পারবে না, কাল নাগাদ অন্য কোন একটা সুবিধা করব।" তাই আমি আজ চারটি রেঁদে দিয়ে যাব। আমার কি ভাই, আমাকে তুমি ডাকলেও আসতে হবে, আর তিনি ডাকলেও আসতে হবে।

ঠাকুরুণদিদি এই কথা বলিয়া রন্ধনশালায় গমন করিলেন, সরলাও আপনার ঘরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ বাহির হইয়া যাইবার সময় ঠাকুরুণদিদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরুণদিদি, ওদের রান্না আজকার মতন ঐ গোয়ালের পাশে হোক, তারপর কাল একখান ঘর ঠিক করে দেওয়া যাবে।"

বিধুভূষণ পূর্ব্বদিবস আহারান্তে পাড়ায় গিয়া শুনিলেন, মুখুয্যেদের বাড়ী যাত্রা হইবে, আর তাঁহাকে পায় কে? শুনিবামাত্রই তিনি মুখুজ্যেদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যাত্রা সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিলেন। কখন ফরাস তদারক করিতেছেন, কখন সকলে আসিয়া কোথায় বসিবে, তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। কখন এর কানে কানে কথা কহিতেছেন, কখন আর এক জনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন—অর্থাৎ যেন তিনিই বাড়ীর কর্তা। ক্রমে যত সন্ধ্যা সমাগত হইতে লাগিল, তাঁহার ততই আমোদ বাড়িতে লাগিল। সকালে সকালে চারিটি আহার করিতে বাটী আসিলেন, কিন্তু রান্না হয় নাই দেখিয়া, "আজ আমি যাত্রা শুনব," এই মাত্র সরলাকে বলিয়া ফিরিয়া গেলেন। বাটীতে যে গোলযোগ হইয়া গিয়াছে, সরলা সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছুমাত্র বলিবার অবকাশ পাইলেন না।

বাটী হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, যাত্রাদলের প্রধান বাদ্যকরের ওলাউঠা হইয়াছে, এজন্য যাত্রাওয়ালারা সে রাত্রে গান বন্ধ করিয়া রাখিবার প্রস্তাব

করিতেছে। কিন্তু এদিকে সমস্ত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। উপায় কি, কেহ স্থির করিতে পারিতেছে না। বিধু কহিলেন, "বাজনার জন্য ভয় নাই, আমি নয় বাজাব।" উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন, সকলেই এই প্রস্তাবে মত দিলেন। বিধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

নিয়মিত সময়ে যাত্রা আরম্ভ হইল। যাত্রাওয়ালারা মনে করিয়াছিল, বাদ্যের দোষবশতঃ প্রাপ্তি দূরে থাকুক, লজ্জা পাইতে হইবে, কিন্তু দুই একটা গান সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা অকারণ ভয় পাইয়াছিল। বিধুর বাজনা তাহাদের নিজ বাদ্যকরের অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, সুতরাং তাহাদের ভয় ঘুচিয়া উৎসাহ হইল। এবং যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিল, প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার দশগুণ ফল লাভ হইল।

যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে যাত্রাওয়ালারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ লাভের অংশ দিতে চাহিল। কিন্তু বিধুভূষণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। হৃষ্টচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় শ্যামার সহিত দেখা হইল। শ্যামা গান শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা তুই কোথায় গিয়াছিলি ?"

শ্যা। আপনাকে ডাকতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি যে গোলের মধ্যে বসে বাজাচ্ছিলেন দেখলাম, আমার সেখানে যেতে ভরসা হল না।

"ভয়ই বা কি ?"

"সেখানে যে লোক।"

"লোকে কি তোকে ধরে খেত ? তুই তো আঁর পাকা আঁবটি নোস্ যে তোকে পেলেই ধরবে ?"

"আপনার ঐ এক রকম কথা। আমি কি বলছি আমি পাকা আঁব ?"

বিধু। আমার এই রকম কথা। আমি রোজই তাই বলি, কিন্তু তুই তো তার জবাব আজও দিলি নে।

"যাও, আমি তোমার ওসব কথা শুনতে চাই না। (উভয়েই বাটীর কাছে আসিয়াছে) যে চায় তাকে গিয়া বল।"

"সে কে শ্যামা ?"

"বাটীর ভিতর গিয়া দেখ, যে আমাকে ঘুম থেকে তুলে তোমাকে ডাকতে পাঠালে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যেখানে ভাই ভাই সেখানে ঠাঁই ঠাঁই

শ্যামা যে যথার্থই বিধুভূষণকে ডাকিতে গিয়াছিল, বিধুর তাহা প্রত্যয় হয় নাই। তিনি মনে করিলেন শ্যামা যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, পথে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে বলিয়া ওকথা কহিল। আস্তেব্যস্তে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বাহিরবাটীতে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কেহই নাই। রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, ঠাকৃরুণদিদি পাক করিতেছেন। বিধু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আজ কি সুপ্রভাত! স্বয়ং লক্ষ্মী ঘরে বিরাজমান।" বিধু ঠাকৃরুণদিদিকে এইরূপেই সম্ভাষণ করিতেন। ঠাকৃরুণদিদিও তাহাতে কখন তুষ্ট বই রুষ্ট হইতেন না।

আপাততঃ ঠাকৃরুণদিদি কথা কহিলেন না। বিধু কহিলেন, "তৃষিত চাতক বাক্যসুধা যাচ্ঞা করিতেছে; কথা কহিয়া তৃষ্ণা দূর করো।" ঠাকৃরুণদিদি তথাপি কথা কহিলেন না, মুখ ভারি করিয়া রহিলেন। বিধু যাত্রার দলে বাজাইয়া পরম আহ্লাদিত ছিলেন। ঠাকৃরুণদিদির মুখভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া করপুটে কহিলেন, "দীনজনকে কষ্ট দেওয়া মহতের উচিত নহে। তবে যদি আমার কোন দোষ হয়ে থাকে, ব্যবস্থা তো পড়েই আছে। 'অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড'।"

ঠাকৃরুণদিদি তথাপি কথা না কহায় বিধুর মনে সন্দেহ জন্মিল। শ্যামা তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিল, তাহাও স্মরণ হইল। মনে করিলেন, শ্যামার কথা কাল্পনিক নহে। অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলা তাঁহার কথা শুনিয়াই দুঃখে ও ভয়ে অশ্রুপাত করিতেছিলেন। সরলাকে তদবস্থ দেখিয়া বিধুর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মুহূর্ত পূর্বে হাসিতেছিলেন, হাসি দূর হইল, সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল কোথায়? সে ভাল আছে তো?"

সরলা কহিলেন, "গোপাল পাঠশালায় গিয়াছে; ভয় নাই, গোপাল ভালই আছে।"

বিধু। বিপিন, কামিনী?

সর। বিপিনও পাঠশালায় গিয়াছে। কামিনী কোথায় খেলা করছে।

বিধু। তবে তুমি কাঁদছ কেন?

সর। ঠাকুর আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন।

বিধু। এই কথা? এরই জন্যে এত কাণ্ড? কি বলে দাদা আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন?

বিধুর বোধ হইল যেন, ইহা অপেক্ষা আর কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না।

সরলা কহিলেন, "প্রথমে ঠাকুরুণদিদিকে দিয়ে বলে পাঠালেন, পরে কাছারি যাবার সময় ঠাকুর নিজে বলে গেলেন।"

"কি বললেন?"

"কাছারি যাবার সময় আমাদের আজকার মতন গোয়ালে রাঁধতে বললেন, পরে কাল একটা ঘর দেখে দেবেন।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পৃথক করে দিলেন কেন?"

সরলা উত্তর করিলেন, "আমি তো আর কিছুই জানি না। বোধ হয় সেই মনোহারীর দোকানের কাছে যে কথা হয়েছিল, তাতেই ত্যাগ করেছেন!" এই বলিয়া সরলা আনুপূর্বিক সমুদয় বর্ণনা করিলেন। বিধুভূষণ শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন, "এর জন্যে আর ভয় কি? দাদা বাড়ী এলেই চুকে যাবে। বোধ হয় তিনি সমুদয় শুনতে পান নাই। শুনতে পেলে তিনি এমন কাজ কখনই করিতেন না। এর জন্যে আর ভাবনা কি?"

সরলা স্বামীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "মা দুর্গা করুন, যেন তাই হয়। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

বিধু। ফুলচন্দন পরে পড়বে, আপাততঃ আমার মাথায় একটু তেল পড়ুক। কাল রাত জেগে বড় অসুখ হয়েছে। তেল দাও, স্নান করে আসি।

বিধুভূষণ স্নান করিতে গেলেন। সরলা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ঠাকুরুণদিদিকে রন্ধনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিলেন। প্রমদা সরলাকে রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শ্যামাকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, সকলে মিলে আবার রান্নাঘরে কেন গেলেন? আমাদের রান্নাঘরে আর কারুর গিয়ে কাজ নেই।" শ্যামা তৎকালে বাটী ছিল না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? প্রমদা যাহার উপর রাগ করিতেন, তাহার সহিত কথা কহিতেন না, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিতে হইলে, শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, শ্যামা তথায় থাকুক আর নাই থাকুক।

প্রমদার কথা শুনিয়া সরলা রান্নাঘর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজগৃহে আসিলেন। শ্যামা বাটী আসিল এবং রান্নাঘরে ঠাকুরুণদিদিকে দেখিয়া সরলার

নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি আজ কি তোমার ছুটি? ঠাক্‌রুণদিদিকে একটিন্ দিয়াছ না কি?"

শ্যামার মুখে সদাই হাসি। হাসিতে হাসিতে সরলাকে উল্লিখিত প্রশ্ন করায় সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তোর কি আর সময় অসময় নেই, সদাই হাসি।"

"হাসব না কি তোমার মত বসে কাঁদব? কার জন্যে আমি কাঁদব?" এই কথা কহিতে কহিতে শ্যামার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল এবং চক্ষে একবিন্দু বারিও দেখা দিল। শ্যামা যেন লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন; ঠাক্‌রুণদিদি ওঁদের জন্যে রাঁধছেন। আমাদের আজ কি হবে ভাবছি।"

শ্যামা। পৃথক করে দিয়েছেন?

সর। 'হাঁ', এই বলিয়া সরলা শ্যামার নিকট প্রাতঃকালের ঘটনার পরিচয় দিলেন।

শ্যামা পুনরায় হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি কোন্ দিকে যাবো? ভাগ্‌গি আমি বাবুদের মা নই। তা হলে তো আমার গঙ্গা পাওয়া ভার হতো। কিন্তু সাজার দাসীর কি হয় তা তো জানি নে। হাঁ খুড়িমা, কি হয় জান কি?"

সরলা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোর আর হাসি আমার ভাল লাগে না। দুদণ্ডকাল কি তুই না হেসে থাকতে পারিস না?"

সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই, বিপিন ও গোপাল পাঠশালা হইতে বাটী আসিল। গোপাল আসিয়া সরলার নিকট "মা কি খাব" বলিয়া উপস্থিত হইল। সরলা অঞ্চল দিয়া গোপালের মুখের কালি পুঁছিয়া দিয়া কহিলেন, "একটু দেরী কর, খাবার দেব এখন।" বিপিন মায়ের নিকট একটি সন্দেশ পাইল। প্রমদা সন্দেশটি বিপিনের হাতে দিয়া কহিলেন, "এইখানে বসে খাও। না খেয়ে বাইরে যেও না।" বিপিন তা শুনিবে কেন? সন্দেশটি পাইবামাত্রই ঘরের বাহিরে আসিয়া গোপালকে ডাকিল; গোপাল বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিপিন সন্দেশ খাইতেছে। দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, আমারে একটু দেবে?"

বিপিন উত্তর করিল, "না ভাই, দিলে মা বকবে।"

গো। মা কেন বকবে? আমি যখন যা পাই, তোমাকে দিই, তাতে তো আমার মা কিছু বলে না।

বি। আমি ভাই এখন দিতে পারব না। আমি বড় হলে দেব।

গো। আমিই কি চিরকাল ছোট থাকব? বড় হলে আমি আর তোমার

কাছে চাব না। এই কথা কহিতে কহিতে উভয়েই রান্নাঘরের নিকটে গেল। বিপিন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোনখান হইতে দেখিতেছে কি না, তখন সন্দেশটি ভাঙ্গিয়া একটু গোপালের হাতে দিতে গেল। ঠাকুরুণদিদি রান্নাঘর হইতে দেখিতে পাইয়া কহিয়া উঠিলেন, "বিপিন থাক। আমি দেখতে পাচ্ছি; মাকে বলে দেব এখন।"

বি। তুমি কি বলে দেবে? আমি তো কারুকে সন্দেশ দিই নি। এই বলিয়া গোপালকে না দিয়া সন্দেশটুকু আপনার মুখে নিক্ষেপ করিল। গোপাল ম্লানমুখে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। শ্যামা ইত্যবসরে দোকান হইতে একটি সন্দেশ আনিয়াছিল। গোপাল আসিবামাত্রই তাহার হাতে দিল। গোপাল হৃষ্টচিত্তে সন্দেশ খাইতে খাইতে বিপিনের সঙ্গে গিয়া মিশিল।

বিধুভূষণ স্নান করিয়া বাটী আসিলেন। শশিভূষণও কাছারি হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া বিধু আপাততঃ তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। শশিভূষণ স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। পাকশাক প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরুণদিদি স্নান করিয়া শশিভূষণকে আহার করিতে ডাকিলেন। অন্যান্য দিবস আহার করিতে যাইবার সময় শশিভূষণ বিধুকে ডাকিয়া যাইতেন, অদ্য একাকী গম্ভীরভাবে আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে নিজগৃহে পান তামাক খাইতেছেন, এমন সময় বিধুভূষণ তথায় গিয়া বসিলেন। মনে করিলেন দাদাই অগ্রে কথা কহিবেন। এই ভরসায় ক্ষণেক বসিয়া রহিলেন। কিন্তু দাদার মুখ হইতে বাক্য-নিঃসরণ হইল না। তখন বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, আমাকে নাকি পৃথক হতে বলেছেন?"

শশিভূষণ কহিলেন, "হাঁ, আর একত্রে থেকে কলহ-বিবাদ বরদাস্ত হয় না। যদি পৃথক হলে ঝগড়ার শেষ হয়, এই ভেবেই পৃথক হতে বলেছি।"

বিধু। কার দোষে ঝগড়া হয়, সেটা অনুসন্ধান করে দেখলে ভাল হয় নাকি?

শশি। তা না দেখেই কি আমি পৃথক হবার কথা বলেছি?

বিধু। তুমি কি শুনেছ, আমি কি শুনতে পাই?

শশি। পাবে না কেন? কাল একজন মনোহারী দোকান নিয়ে এসেছিল, ঠাকুরুণদিদির কাছ থেকে দুটি পয়সা ধার করে বিপিনকে আর কামিনীকে দুটী বাঁশী কিনে দেয়। ছোট বৌ মা তাতে বললেন, "দিদি, একটি পয়সা ধার দেবে, আমি সুদ দেব।" এটা কি ভাল কথা হয়েছে? আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি?

বিধু। আগে ভালো—

শশি। চুপ কর, আগে আমার কথা শেষ হোক্, পরে যা বলবার থাকে বলো।

পয়সা ধার চাওয়ায় ওদের কাছে পয়সা ছিল না, কিন্তু তা না বলে ও বললে—'একটা পয়সা ধার তার আর সুদ কি?' তার উত্তর হলো এই, 'কেন, তুমি তো মহাজনি করে থাক।" "আমি একটা কথা বলি—আমি যে কারুকে লক্ষ্য করে বলছি তা নয়—আমি দুইজনকেই বলছি—এই যে ধার-কর্জ করা হয়, এর শোধ কি কেউ বাপের বাড়ী থেকে পয়সা এনে দেন?"

বিধুভূষণের এতক্ষণ পুনর্মিলনের আশা ছিল, কিন্তু শশিভূষণের শেষ কথা শুনিয়া সে আশা দূর হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তুমি যা বললে তা মিথ্যা নয়, কেউ বাপের বাড়ী থেকে কিছু পয়সা আনে না। কিন্তু ঘটনাটি তুমি যেরূপ শুনেছ, তা সত্য নয়।" এই বলিয়া সরলার নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিলেন এবং কহিলেন, ইহাই সত্য।

শশি। তার প্রমাণ কি?

বিধু। প্রমাণ আবার কি? এ তো মোকদ্দমা নয়। তবে সেখানে যারা ছিল সকলেই জানে।

শশি। সেখানে ঠাকুরুণদিদি ছিলেন। আমি তাঁর কাছে সমুদয় শুনেছি। তোমারই কথা মিথ্যা, তাতে টের পাওয়া গেল।

বিধু। কে বললে, আমার কথা মিথ্যা?

শশি। ঠাকুরুণদিদি। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ঠাকুরুণদিদি তো আর দুমাস ছমাসের পথ তফাত নয়। রান্নাঘরে আছেন ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

বিধু। আর আমার জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঠাকুরুণদিদি যা বলেছেন, তা তো মিথ্যা হবার নয়!

এই বলিয়া বিধু উঠিয়া গেলেন। দুয়ার পর্যন্ত না যাইতে না যাইতেই শশিভূষণ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন, "আজ তো পৃথক খাওয়া গেল। কাল তোমাদের একটা রান্নাঘর দেব, আর বিষয়আশয় পাঁচজন লোক ডেকে ভাগ করে দেব।"

বিধু। লোক ডেকে দরকার কি? আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করব না। তুমি তো সব জান! যা আমাকে দেবে, আমি তাই নেব। এই বলিয়া বিধুভূষণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। বিধুভূষণ চলিয়া গেলে বলিলেন, "দেখছ একবার অহঙ্কারটা? তুমি এক কথা বলেছ, তা নয় দুটি মিষ্টি করে তোমার অনুনয়-বিনয় করুক; তা নয়।"

শশিভূষণ উত্তর করিলেন, "ও অহঙ্কার আর কদিন থাকবে, শীঘ্রই সব সেরে যাবে।" এই বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চিরদিন কখন সমান না যায়

ইং ১৮—সালের পৌষ মাসের—তারিখে ঠিক দুই প্রহরের সময় যদি কেহ কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় হাঁসখালির নিকট উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের নিকটবর্তী এক বৃক্ষমূলে একটি পথশ্রান্ত পথিককে দেখিতে পাইতেন। দূর হইতে পথিকের বয়স চল্লিশ বৎসরের ন্যূন বোধ হইতেছে না, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলে তদপেক্ষা অন্ততঃ দশ বার বৎসর কম নিশ্চয় বিবেচনা হইত। মস্তকে দুটি একটি পক্ক কেশ দেখা যাইত, কিন্তু তাহা বয়োবৃদ্ধিহেতু নহে। মুখশ্রী ম্লান ও চিন্তাকুল। দেখিবামাত্রই জানিতে পারা যাইত, চিন্তায় পথিককে যৌবনেই বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথিকের পায়ে এক জোড়া পাঁচ সাত জায়গায় তালি-দেওয়া জুতা। তাহাও ধূলায় আবৃত। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ধূলি। পরিধানে একখানি অর্ধমলিন থানের ধুতি, গায়ে একখানা তালি-দেওয়া জামা। জামাটি পূর্বে পশমী কাপড়ের ছিল, কিন্তু কালে দুর্দশাবশতঃ লোমহীন হইয়াছে। জামার উপর একখানা তেহারা মার্কিনের চাদর। পথিকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি জলশূন্য হুকা, একটি কলিকা ও একগাছি বাঁশের ছড়ি ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে।

"চিরদিন কখন সমান না যায়।" বিধুভূষণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, তিনি কখন এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইবেন। পাঠকবর্গ! বৃক্ষমূলে আমাদিগের পূর্বপরিচিত বিধুভূষণ, তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে? কিন্তু আপনারা যদি তাঁহাকে পূর্বে দেখিতেন, তাহা হইলে এ ব্যক্তি যে সে-ই, তাহা কখনই বুঝিতে পারিতেন না। বিধুভূষণের আর পূর্বের মতন বেশভূষা নাই, পূর্বের ভাবভঙ্গী নাই; পূর্বের সে প্রফুল্ল মুখমণ্ডল নাই; সে মুহুর্মুহুঃ হাসি নাই; পূর্বের কিছুই নাই। সকলই গিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা বিধুকে ঘৃণা করিবেন না। এখনও বিধুর যাহা আছে, বোধ করি তাঁহার ন্যায় দুরবস্থায় পড়িলে অনেকের থাকে না। বিধুর অন্তঃকরণের সারল্য কোথাও যায় নাই। এত দুঃখেও তাঁহার নির্মল চরিত্রে কোন মলিনতা স্পর্শ করে নাই।

বিধুভূষণ বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, "কোথায় যাই? কার কাছে আমার দুঃখ জানাই? কেই বা আমার কথায় বিশ্বাস করবে?"

বিধু শশিভূষণের সহিত পৃথক হইয়া দিনকতক স্বচ্ছন্দে ছিলেন। পরে যখন

দোকানে ধার বন্ধ হইল, তখন বন্ধুবর্গের নিকট কর্জ ধরিলেন। দিনকতক পরে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইল। তখন আজ ঘটিটি, কাল গহনাখানি, পরদিবস ভাল জামাটি বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ দুসন্ধ্যা আহার বন্ধ হইল। পরিবার চারিটি ;—নিজে, সরলা, গোপাল ও শ্যামা। পৃথক হইবার সময় শ্যামা বিধুভূষণের দিকে আসিয়াছিল। একসন্ধ্যা আহার করিয়াও তাহার সরলার সহিত থাকিবার স্পৃহা নিবৃত্তি হয় নাই। একদিবস মলিন বসন প্রযুক্ত বিধুভূষণ বাহির হইতে পারেন না। শ্যামাকে ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কাপড় আসিলে পরিয়া আহারের অন্বেষণে যাইবেন। ধোপা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রমদাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামধন, কার কাপড় ?" রজকের নাম রামধন।

রজক উত্তর করিল, "ছোটবাবুর কাপড় ময়লা হয়েছে, বেরুতে পারেন না, তাই তাড়াতাড়ি এই একখান ধুতি, আর একখানা চাদর সাঁজ করে আনলাম।"

প্রমদা কহিলেন, "কাপড় অভাবে বেরুতে পারেন না, তবু বাবু, আর বেশী থাকলে না জানি আরও কি পদবি হত।"

রজক। সে সব আপনারা জানেন, আমি তার কি বলব ?

প্র। রামধন কত করে মাইনে পাও ?

রজক। পাঁচ টাকা হিসাবে দেবার কথা আছে।

প্র। দেবার কথা আছে। আজও পাওনি ?

রজক। কৈ আর পেলাম। আজ কাল করে এই এক বছর হলো! এই সময়ে ধান চাল সস্তা ছিল, টাকাকড়ি পেলে কিছু কিনে রাখতাম। যাই, আজ আবার চাইগে, দেখি কি বলেন।

প্র। চাবি, না আদায় করবি ?

রজক। না দিলে কেমন করে আদায় করব ?

প্র। যদি আমার পরামর্শ শুনিস, তবে আদায় হয়।

রজক। শুনব বলুন।

প্র। তুই কাপড় হাতে করে রেখে গিয়ে বল্, "আজ টাকা না পেলে কাপড় দেব না। যদি দেয় ভালই, নইলে বলিস, "যে কাপড় ধোয়াবার পয়সা দিতে পারে না, তার এত বাবুয়ানা কেন ?"

রজক। তা বললে যদি রাগ করেন ?

প্র। ওর রাগে তোর ভয় কি ? যদি তাতে টাকা না পাস্ যাবার বেলা আমার কাছ দিয়া যাস্, আমি তোকে আপাততঃ দু টাকা ধার দেব এখন।

রজক প্রথমতঃ শঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রমদার উৎসাহবাক্যে তাহার শঙ্কা দূর হইল। একে ছোটলোক, তাতে নগদ দু টাকা ধার পাইবার আশা রহিল। রজক বাটীর ভিতর গিয়া দেখিল, সরলা দ্বারে বসিয়া আছেন।

রামধন কহিল, "এই কাপড় তো আনলাম, কিন্তু আমাকে কিছু খরচা না দিলে চলে না।"

সরলা কাতর স্বরে কহিলেন, "রামধন, তুমি আজ যাও, রাজবাটীতে উনি আজ যাবেন, সেখানে নিশ্চয় কিছু পাবেন। কাল তুমি এলে কিছু খরচ পাবে।"

রামধন। আজ আমার নৈলে নয়।

সরলা। রামধন, আজ হাতে কিছু ছিল না বলে আমাদের সকালে খাওয়া হয় নাই, থাকলে কি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কই?

সরলার হাতে দু গাছা পিতলের বালা ছিল। রজক তাহা সুবর্ণ মনে করিয়া কহিল, "যার পয়সা অভাবে খাওয়া চলে না, তার হাতে আবার সোনার গহনা কেন?"

রজকের কথা শুনিয়া সরলার মুখ চোখ লাল হইল, কিন্তু তখনই ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রামধন? সেই আশীর্বাদ কর যে হাতের বালা সোনার হউক। সোনা কি আর আছে? একে একে সকল বিক্রি হয়েছে। এ দু গাছি পিতলের।" এই কথা কহিতে কহিতে সরলা আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না, অঞ্চল দিয়া চক্ষু পুঁছিয়া ফেলিলেন। রজক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাপড়খানি রাখিয়া তথা হইতে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যাইবার বেলা আর প্রমদার কাছে গেল না।

ধোপা চলিয়া যাইতে না যাইতে শ্যামা পাড়া হইতে "কৈ গো, ছোট গিন্নী কি করছ?" বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরলা কহিলেন, "শ্যামা তোর কি হিসেব কিতেব নেই? অত চেঁচাচ্ছিস্, এখনি গোপাল জাগবে।"

শ্যামা কহিল, "জাগলেই বা, দিনে ঘুমান কেন?

সরলা। তুই থেকে থেকে অজ্ঞান হোস, এখন জাগলে সে যখন 'খাব খাব' করবে, তখন কি দিবি?

শ্যামা। আমি তার জোগাড় করে এনিছি।—এই বলিয়া শ্যামা কতকগুলি কলা ও শশা কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিল।

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, এ কোথায় পেলি?"

শ্যামা। তাতে তোমার কাজ কি?

যখন ঘরে কিছু না থাকিত, শ্যামা পাড়ায় গিয়া কারু বাড়ী কোন কাজকর্ম করিয়া আসিবার সময় কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য আনিত। এইরূপে বিধুভূষণের ঘরে

কিছু না থাকিলেও গোপালকে কখন উপবাস করিতে হয় নাই। শ্যামা সময়ে সময়ে সকলেরই খাবার আনিত। যদি কাহারও বাটী কিছু না পাইত, তাহা হইলে শ্যামা পূর্বের সঞ্চিত বেতন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খরচ করিত।

গোপালের উপর শ্যামার স্নেহ দেখিয়া সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তুই-ই যথার্থ গোপালের মা।"

শ্যামা হাসিয়া কহিল, "তবে তুমি কি হবে? গোপালের পিসি?"

সরলা সাশ্রুনয়নে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "শ্যামা, ও আমার গর্ভে হয়েছিল বটে, কিন্তু তুই-ই ওকে বাঁচালি।"

শ্যামার সরল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। উভয়ে সজলনয়নে গোপালকে জাগাইলেন।

বিধুভূষণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজবাটী গেলেন। যে বাবু বিধুকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন, তিনি আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। যে সমস্ত ভৃত্য নিকটে ছিল, তাহাদিগকে বাবুর নিকট খবর দিতে কহিলেন। কিন্তু কেহই বাবুকে জাগাইতে ভরসা করিল না। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম রামা। বিধুভূষণ তাহাকে আর আর দু এক জন অপেক্ষা একটু ভাল মানুষ জ্ঞানে কহিলেন, "রাম, আজ আমার আহার হয় নাই। বাবুকে যদি খবর দাও, তবে উপকার হয়।"

রামা কহিল, "তুমি ঠাকুর একেবারে যে বিরক্ত করেই মারলে?"

বিধু কহিলেন, "রাম, আজ আমার আহার হয় নাই।"

রাম। "তোমার আহার হয় নাই, তা আমার কি? অমন কত লোকের আহার হয় না, আর একটি পয়সা পেলেই শুঁড়ীর দোকানে যায়।"

বিধু ঈষৎ রাগ করিয়া কহিলেন, "হাঁ রে, আমাকে দেখে কি মাতাল গুলিখোর বলে বোধ হয়?"

রামা কহিল, "তার আমি কি জানি? এখন বকাইও না ঠাকুর, গরজ থাকে ঐখানে বসে থাক। যখন বাবু উঠবেন, তখন দেখা হবে। এখানে চোখরাঙানি ভাল লাগবে না। তোমার তো কেউ চাকর এখানে নয়।"

রামার মিষ্ট কথা শুনিয়া বিধুভূষণের স্মরণ হইল আর সে-কাল নাই। ছলছল নেত্রে গৃহের এক কোণে একখানা টুলের উপর বসিয়া রহিলেন। রামা ও অন্যান্য ভৃত্যগণ নিদ্রা যাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা আগতপ্রায় হইল। রাজবাটী বিধুভূষণের বাটী হইতে নিতান্ত নিকটও নহে। রাত্রি অন্ধকার। সাত পাঁচ ভাবিয়া বিধুভূষণ চলিয়া আসিবার

উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গৃহের অভ্যন্তর হইতে "রামা রামা" শব্দ হইল। বাবু জাগিলেন। বিধুভূষণ একটু অপেক্ষা করিলেন।

রামা নিদ্রিত। কিন্তু অন্য এক জন চাকর জাগরিত ছিল। পাছে রামার উত্তর না পাইয়া বাবু তাহাকে ডাকেন, এজন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে রামার গা টিপিয়া জাগাইয়া দিল। রামা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "আজ্ঞা যাই।"

রামা যাইবার সময় বিধুভূষণ কহিলেন, "রাম, বাপু, আমার কথাটা বলো একবার।"

রামা গৃহের কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তুমি এখনও আছ ঠাকুর?"

বাবু রামাকে কহিলেন, "আজ শনিবার, মনে আছে তো? শ্যামবাবু, চন্দ্রবাবু, আর আর সকলে আসবেন, তার জোগাড় আছে তো?

রামা। "জোগাড় আর কি? ওই এক বোতল পোর্ট আছে, আর এক বোতল সেরি।"

বাবু। এক বোতল সেরি কি রে? তিন বোতল ছিল যে?

রামা তার দু বোতল পার করিয়াছে, বাবু তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

রামা। ঐ জন্যেই তো আমি ওসব জিনিস রাখতে চাই নে। সেদিন যে পাঁচ বোতল গেল, আপনি তো আর হিসাব রাখেন না?

বাবু। সে দিন পাঁ—চ বোতল গেল?

রামা। আজ্ঞা গেলই তো?

বাবু। তবু তো শ্যামবাবু বাপের ভয়ে, আর মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করার ভয়ে, বেশী খায় না। (জানালা দিয়া বৈঠকখানার দিকে দৃষ্টি করিয়া) "ও আবার কে?"

রামা। ও এক ঠাকুর এসেছে। আপনি নাকি ওকে কিছু দেবেন কথা ছিল, তাই নিতে এসেছে। বলছে ওর আজ খাওয়া হয় নাই।

বাবু। ওকে আজ যেতে বল। বল আমার ব্যারাম হয়েছে। কাল যেন বৈকালে আসে।

রামাকে আর আসিয়া বলিতে হইল না। বিধুভূষণ বাহিরে বসিয়াই সমুদয় শুনিতে পাইয়াছিলেন। শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন।

বাবু বিধুভূষণকে আপনা হইতে ভরসা দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া আসিতে হইবে, বিধু কখনই মনে করেন নাই, এজন্য বাবুর কথা শুনিয়া তিনি একেবারে ভাবনায় ম্রিয়মাণ হইলেন। কি করেন, দুঃখে বাটী ফিরিয়া আসিয়া সরলাকে সমুদয় পরিচয় দিলেন। সরলা কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রমদা কোনরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বিধুভূষণের ঘরে সে দিবস উনন জলে নাই। এজন্য সন্ধ্যার পর বারান্দায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও শ্যামা, শ্যামা, বলি আজ তোদের কি রান্না হলো?"

শ্যামা উত্তর করিল, "যা বিধি মাপিয়েছেন, তাই হলো।"

প্র। সে কি, এক দিন তো সাবেক মনিব বলে চাট্টি খেতেও বল্লি নে?

শ্যামা। আমায় বলতে হবে কেন, কপালে থাকলে আপনিই হবে।

বিধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে শ্যামা?—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্?"

শ্যামা। বড় গিন্নি আমাদের কি কি রান্না হয়েছিল জিজ্ঞাসা করছেন।

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। সরলাকে কহিলেন, "দেখলে, আচরণটা দেখলে? চণ্ডালেরও এরূপ ব্যবহার নয়। যাই দাদার কাছে, তিনি শুনে কি বলেন, তাই দেখি।"

সরলা কহিলেন, "না, আর কোনখানে গিয়ে কাজ নাই, ওঁর যা ইচ্ছা বলুন। ওসব কথায় কান না দিলেই হলো।"

ঘরে গোল শুনিয়া প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও শ্যামা, তোদের ঘরে অত গোল কিসের? বলি, কারুকে নেমন্তন্ন করেছিস নাকি?"

বিধু। (সরলার প্রতি) "শুনলে, শুনলে, আক্কেলটা শুনলে?"—বসিয়াছিলেন, এই বলিয়া উঠিলেন।

সরলা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ছি, ওসব কথা বলো না। হাজার হউক, গুরুলোক তো?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "ও কিসের গুরুলোক। আমি চললাম দাদাকে বলি গে, দেখি তিনি কি বলেন।" এই বলিয়া সরলার হস্ত হইতে নিজ হস্ত জোরে মুক্ত করিয়া উচৈঃস্বরে "দাদা, দাদা" বলিয়া বিধুভূষণ শশিভূষণের ঘরের দিকে চলিলেন। প্রমদা কৃত্রিম ভয় প্রদর্শনপূর্বক অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া গিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "ওই দেখ, তোমার ভায়া মদ খেয়ে আমাকে মারতে আসছে।"

শশিভূষণ, বিধুভূষণের কথা শুনিয়া কহিলেন, "কে ও?"

বিধু কহিলেন, "আমি। দাদা, একটা বিচার করতে হবে। বউ যা মুখে আসে তাই বলে আমাদের ঠাট্টা করছেন।"

প্রমদা। ঐ দেখ মদ খেয়েছে। মদ না খেলে অমন মাতালের মত বকবে কেন?

শশিভূষণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "ওসব মাতলামি আমার কাছে খাটবে না। যাও গে শুয়ে থাক, যদি কিছু বলবার থাকে কাল শুনব।"

বিধু। মাতলামিটা আবার কি? আমি মাতাল, না তুমি মাতাল?

শশী। কি, তুই আমাকে মাতাল বললি। বেরো আমার বাড়ী থেকে। অমন করবি তো যে ঘর দিয়েছি তাও কেড়ে নেব।

বিধু। ঘর দিয়াছি? ই—ঘর ভিক্ষা দিয়াছেন আর কি?

শশিভূষণ ক্রোধে কম্পমান হইয়া কহিলেন, "তবু ওইখানে দাঁড়িয়ে মাতলামি করতে লাগলি? হরে—এই মাতালটাকে নিয়ে থানায় দিয়ে আয় তো।"

বিধু। হরে আসবে কেন, তুমি এস না?

এই কথা শুনিবামাত্র শশিভূষণ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া কাপড় পরিতে পরিতে বাহিরে আসিলেন। রাগ হইলেই তাঁহার কাপড় খসিয়া যাইত। সরলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বিধুভূষণের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। নতুবা একটা হাতাহাতি হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিধুকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া সরলা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বিধুভূষণ ক্ষণকাল আরক্তলোচনে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "সরলা, আর এ বাটীতে থাকার প্রয়োজন নাই। আমি আর এ বাটীতে ত্রিরাত্রি বাস করব না।"

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "কপালে যা আছে, তা ভোগ করতেই হবে। আর কোথা যাবে? বাড়ী থাকলেও আমার একটা ভরসা থাকে। সে যা হোক কাল হবে, এখন কান্না ত্যাগ কর। চোখ মুছে ফেল। মিথ্যা কাঁদলে কি হবে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "একটা কথা বলব সরলা, বিশ্বাস করবে? আমি নিজের জন্য একবিন্দুও দুঃখ করি না। আমার সকল কষ্ট তোমার জন্যে, আর ঐ ছোঁড়ার জন্যে। যদি তুমি আমার হাতে না পড়তে, তা হলে তোমায় এত কষ্ট সইতে হতো না।"

এই কথা শুনিয়া সরলা পূর্বাপেক্ষা সহস্র গুণ দুঃখ পাইলেন। নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল, কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, বাক্য নিঃসরণ হইল না। নিজের অঞ্চল দ্বারা স্বামীর চক্ষু মুছাইতে লাগিলেন।

বিধুভূষণ হস্ত ধরিয়া সরলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "সরলা, আর কষ্ট বাড়াইও না। তুমি যদি অত ভাল না বাসতে, আমার দুঃখে অত দুঃখিত না হতে, যদি অন্য স্ত্রীলোকের মত আমার সহিত বিবাদ করতে, তা হলে আমার কখনই এত দুঃখ হতো না। এতদিন কিছু ব৷ল নাই, এখন বলি। তুমি আমাকে নিজে থেকে

এক একখানি গহনা যখন বিক্রি করতে দিয়েছ, তখন আমার মনে হয়েছে যেন আমার এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে গেল। কি করি? না বেচলে নয়, তাই বেচেছি। মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন, সে গহনা বেচে ভাত খাওয়া আমার পক্ষে যেন প্রতি গ্রাসে কালকূট খাওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছাপূর্বক গহনাগুলি না দিতে, তা হলে বোধ হয় আমার এত কষ্ট হতো না। এখন এক কথা বলি সরলা; তুমি বাপের বাড়ী দিনকতকের জন্য যাও। আর শ্যামাও অন্যত্র কোনখানে যাউক। এখানে থেকে সে গরীব কেন কষ্ট পায়?"

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ী গেলে যদি তোমার কষ্ট নিবারণ হতো, তা হলে বাপের বাড়ী কেন, তুমি যেখানে বল সেইখানে যেতে পারি। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি স্বর্গে গেলেও সুখী হব না। যখন মনে হবে যে, তুমি হয়ত অনাহারে আছ, তখন কেমন করে আমার মুখে অন্ন উঠবে? তবে গোপালের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু গোপাল তো আজও উপবাস করে নাই। ওর যত দিন উপবাস করতে না হয়, ততদিন আমি তোমাকে ছেড়ে কোনখানেই যাব না। কিন্তু শ্যামার কথা যা বললে, তা করা উচিত, ও কেন আমাদের সঙ্গে থেকে কষ্ট পায়, আর গঞ্জনা সহ্য করে?"

বিধুভূষণ শ্যামাকে ডাকিলেন। শ্যামা অন্য সময় এক ডাকে তিন উত্তর দিত, আজ কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে আসিল। শ্যামার চক্ষু লাল, মুখ ভার।

বিধুভূষণ কহিলেন. "শ্যামা, আমরা বিবেচনা করে স্থির করলাম, তোমার আর আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। তোমার মাইনা পাওয়া দূরে থাক্, দু'সন্ধ্যা খেতেও পাও না। অতএব তুমি অন্য কোন স্থানে যাও। যদি পরমেশ্বর দিন দেন, তখন আবার এস।" বিধুভূষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি কি মাইনে চেয়েছি, না মাইনে নেব বলে এসেছি? আমার টাকার দরকার কি? আমারে যাই বল, আমি গোপালকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আমি যদি ভারবোঝা হয়ে থাকি, তোমাদের এখানে আমি খাব না, কিন্তু গোপালকে ছেড়ে আমাকে থাকতে বলো না।"

বিধু কহিলেন, "শ্যামা, কেঁদ না, স্থির হও। আমি যা বলছি, ভাল করে বুঝে দেখ। আমাদের সঙ্গে থাকা আর উপবাস করা একই কথা। গোপালকে না দেখে তুমি থাকতে পার না সত্য, কিন্তু আর কোন বাড়ী গেলেও সেখানে ছেলেপিলে পাবে। আবার সেখানে মন বসলে আর কোন জায়গায় যেতে ইচ্ছা হবে না।"

"ছেলেপিলে পাব সত্যি, কিন্তু আমার সেটির মতন আর কোনখানে পাব না।" শ্যামা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিধু কহিলেন, "শ্যামা, স্থির হও, স্থির হও।" শ্যামা কহিল, "গোপালের মতন আমার একটি ছেলে ছিল। আদর করে আমিও তার নাম গোপাল রেখেছিলাম। এখানে থাকলে আমার গোপাল যে নেই, তা আমি ভুলে যাই। আমি এখান থেকে কোন স্থানে যাব না।"

বিধুভূষণ সাশ্রুনয়নে সরলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর উপায় কি?" সরলা অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামা কহিল, "আমার কিছু টাকা আছে। মনে করেছিলাম গোপালকে দিয়ে যাব। কিন্তু আমার কথা যদি শোন, তবে এক পরামর্শ আছে। (বিধুর প্রতি) তুমি কোন যাত্রার দলে কাজ নিতে চেষ্টা কর। পাবেই তার সন্দেহ নেই। আর ততদিন আমরা ঘরে থেকে এই টাকায় চালাই। এর পর সচ্ছল হয়, আমার টাকা দিও। দিলে গোপালেরই থাকবে।"

শ্যামার সকরুণ বচনে সরলা ও বিধু উভয়েই দ্রব হইয়া গেলেন এবং তাহারই পরামর্শে কর্তব্য স্থির করিলেন।

পরদিবস প্রাতে শ্যামার টাকা হইতে রাস্তার খরচস্বরূপ পাঁচ টাকা লইয়া বিধুভূষণ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কলিকাতা যাইবেন স্থির করিয়া কলিকাতার রাস্তা ধরিলেন এবং মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম হেতু হাঁসখালির নিকটবর্তী গাছতলায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন—বাদ্য-গীত ভাল বটে, কিন্তু যাত্রার দলে থাকাটা বড় নীচ কর্ম। বিধুভূষণ চিন্তা করিতেছেন, অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে কিনা, এমন সময় এক পথিক তথায় উপস্থিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মিত্রলাভ

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে যে পথিকের কথা বলা হইয়াছে, সে কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার ও অপেক্ষাকৃত কৃশ। বয়স ৩২।৩৩, বাম করে তামাক সাজা কলিকাসহ হুঁকা, বাম স্কন্ধে একখানি ময়লা বস্ত্রাবৃত একটি বেহালা ঝুলান, দক্ষিণ করে একগাছি তল্‌তা বাঁশের ছড়ি, পায়ে জুতা নাই, একখানি মলিন বস্ত্র পরিধানে। কটিদেশ হইতে গলা পর্যন্ত অনাবৃত, মস্তকে চাদর একখানি পাগড়ি করিয়া বাঁধা, কোমরে একটি ক্ষুদ্র বোচকা। এই অবস্থায় পথিক যখন বিধুভূষণের নিকট গিয়া ছড়িগাছি রাখিয়া বসিল, তখন তাহার কলেবর উত্তম কালিতে একটি জীবন্ত "ঙ"-য়ার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিধুভূষণ অনন্যমনে নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং পথিক অগ্রসর হইয়া যে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই কিন্তু হঠাৎ হুঁকার টান শুনিয়া সেই দিকে চাহিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন পথিক বৃক্ষ হইতে সেই দণ্ডে নামিয়া আসিল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?"

বিধুভূষণ ভয় পাইয়াছেন বুঝিয়া পথিক উত্তর করিল, "আমি মানুষ, ভয় কি? রামার মা যে বলেছিল রাত্রে নদী পার হয়, দিনের বেলায় কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, তুমি যে তাই হলে! একা বিদেশে আসতে পার, আর মানুষ দেখে ভয় পাও?"

বিধুভূষণ পথিকের কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, কিন্তু আমি তো ভয় পাই নাই। তোমার নাম কি?"

পথিক উত্তর করিল, "আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর, কালাচাঁদ ঘোষের ছেলে আমি। আমরা দেবনাথ বোসের প্রজা।"

নীলকমলের বেশী কথা কহা একটা রোগ ছিল। বিধুভূষণ তাহার কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধির দৌড় টের পাইলেন। আরও অধিক কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবনাথ বোস কে?"

নীলকমল বিস্ফারিত চক্ষে বিস্ময়ব্যঞ্জক স্বরে কহিল, "দেবনাথ বোস কে?" তাহার বিশ্বাস ছিল, দেবনাথের মতন ধনী আর দ্বিতীয় নাই।

বিধু। হাঁ, দেবনাথ কে? আমি তো জানি না।

নীল। দেবনাথেরা আগে রাজা ছিল। বর্গীর হাঙ্গামে রাজত্তি যায়, কিন্তু এখনও তাঁরা খুব বড় মানুষ। তুমি তাঁদের নাম শোন নি, এ আশ্চর্য কথা।

বিধু "হবে" বলিয়া চুপ করিলেন। নীলকমল অনেকক্ষণ হুঁকা টানিয়া, হুঁকাটির মুখ বাম হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বিধুভূষণের দিকে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা, আপনারা ?"

বিধুভূষণ হাসিয়া কলিকাটি লইয়া কহিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ।"

বিধুভূষণ তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

নীলকমল উত্তর করিল, "আর কোথায়! পয়সার চেষ্টায়! দুঃখের কথা কি কব ? আমরা তিন ভাই, আমার দাদার নাম কেষ্টকমল, আমার ছোট ভাইয়ের নাম রামকমল। তারা কিছুই করে না। সকলেই আমি যা আনব তাই খাবে। একা মানুষ, জাত-ব্যবসায়ে আর সংসার চালাতে না পেরে এখন বিদেশে বেরিয়েছি। দেখি, বিদেশে টাকা আছে কি না!"

নীলকমলের কথা শুনিয়া বিধুর পক্ষে হাস্য সংবরণ করা অতি কষ্টকর হইল। কিন্তু নীলকমল দুঃখ করিয়া যাহা বলিতেছে, তাহাতে হাসা অনুচিত মনে করিয়া কহিলেন, "বিদেশে টাকা আছে কি না দেখতে চাও, কিন্তু দেখতে পাবে যে তার প্রমাণ কি ?"

নীলকমল দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেহালাটি উঠাইয়া বিধুভূষণকে দেখাইয়া কহিল, "গুণ! গুণ না থাকলে বলি ? ওস্তাদজীর আশীর্বাদে আমার আর অন্নচিন্তা নাই। এখন বড় মানুষ হওয়াই বাকি ?"

বিধু মনে করিলেন, হতেও পারে, নীলকমল একজন ভাল বেহালাদার, কিন্তু কথাবার্তা শুনে তো তার কিছুই বোধ নয় না। একবার পরীক্ষা করা যাউক। পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "একবার বাজাও দেখি!"

নীলকমল অবিলম্বে বেহালাটি খুলিয়া দুই চারিবার তার কানমোড়া দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাথা এমনি দুলিতে লাগিল যে, বিধুর বোধ হইতে লাগিল, নীলকমলের মৃগী রোগ উপস্থিত হইল; চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, এবং সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গাইতে পার ?"

নীলকমল "হাঁ" বলিয়া বেহালার গৎ ছাড়িয়া দিয়া গান ধরিল এবং বেহালার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আরম্ভ করিল—

পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব।
আনিয়ে নীল পদ্ম সে নীল-পদ্ম চরণ-পদ্মে দিব।"

গান শুনা দূরে থাকুক, নীলকমলের হাবভাব মুখভঙ্গী দেখিয়া বিধু আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। নীলকমল তদ্দর্শনে রাগত হইয়া গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর বলেছিল, 'নীলকমল বেণাবনে মুক্তা ছড়াইও না।' তোমরা এর কি বুঝবে? যদি ওস্তাদজী কি কালীনাথ দাদা হতো তবে তারা বুঝতে পারত। ছেলেমানুষের মত হাসলে হয় না। গোবিন্দ অধিকারী আমাকে দশ টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিল, আমি যাইনি। কত খোশামোদ—তবু না।"

প্রথম প্রথম নীলকমলের বেহালার হাত মন্দ ছিল না। গোবিন্দ অধিকারী মনে করিয়াছিল, ভাল শিক্ষা পাইলে নীলকমল ভাল হইতে পারে; এজন্য পাঁচ টাকা বেতন দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। নীলকমল তদবধি মনে করিল, সে একজন তানসেন হইয়াছে। আর কাহাকেও তৃণজ্ঞান করিত না। যে সকল বোল শিখিয়াছিল, তাহার মধ্যে নিজের টিপ্পনি প্রবেশ করাইল, মাথা কাঁপান ধরিল, মুদ্রাদোষ সংগ্রহ করিল এবং অন্যান্য নানাকারণ-প্রযুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই একজন অসহনীয় বাদ্যকর হইয়া উঠিল। গোবিন্দ অধিকারী যে নীলকমলকে সঙ্গে রাখিতে চাহিয়াছিল, সেই নীলকমলের শনি হইল। নীলকমল তদবধি লেখাপড়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। "লেখা কি?" নীলকমল কহিত, কলম দিয়া আকর (অক্ষর) বের করা, আর বাজনা—কাঠের ভেতর থেকে কথা বের করা। লেখা ইচ্ছা কল্লে সকলেই শিখতে পারে, কিন্তু বাজনা শিখতে মা-সরস্বতীর বিশেষ করুণা চাই।" এই অবধি সে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিল। পূর্বে সন্ধ্যার পর একটু একটু বাজাইত, গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া অবধি সমস্ত দিন বেহালা ভিন্ন আর কিছুই নীলকমলের হাতে দেখা যাইত না। কৃষ্ণকমল পাড়ার লোকের গাভী দোহন করিত এবং প্রতি গরুতে দুই আনা বেতন পাইত। যে দিন বেতনগুলি আনিয়া বাটী রাখিত, নীলকমল অবিলম্বে চুরি করিয়া লইয়া একটি নূতন বেহালা কিনিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণকমল নীলকমলকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলকমল গমনকালে বলিয়া গেল, "তোরা মুড়ি-মিছরি সমান দর কল্লি। কিন্তু আমি যে কত বড় একটা লোক, তা তোরা টের পেলি নে, এই দুঃখ। ভাল, আমি চল্লেম, ফিরে এলে তোরা যদি আমার দুয়ারে বসে কাঁদিস্, তবু একমুট অন্ন দেব না।"

বিধুভূষণ নীলকমলকে সান্ত্বনা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিবাহ হয়েছে নীলকমল?"

নীলকমল অতি অহঙ্কার সত্ত্বেও মন্দ লোক ছিল না, এজন্য একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "না, একটা সম্বন্ধ স্থির করে দিতে পার?"

বিধু। চেষ্টা না করলে কেমন করে বলব। কিন্তু আপাততঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ?

নীল। কলিকাতায় গোবিন্দ অধিকারীর কাছে যাচ্ছি। সে চার পাঁচ বছর হলো, আমাকে দশ টাকা করে মাইনে দিতে চেয়েছিল। তারপর আমি কত শিখিছি। দু-এক সময় ওস্তাদজীও আমার কাছে এখন লজ্জা পান। এখন বিশ টাকা না হয়, পনের টাকা তো পাবই। তার পাঁচ টাকা খাব আর দশ টাকা বাঁচাব। এক বৎসরের মধ্যেই বিয়ে করতে পারব না?

বিধুভূষণ নীলকমলের প্রফুল্লতা দর্শন করিয়া প্রথমতঃ আহ্লাদিত হইলেন। মনে করিলেন, পাগলের মনে সদাই সুখ বলে, তা বড় মিথ্যা নয়। এর অবস্থা আমার মতনই দেখছি, বেশির মধ্যে আমি যথার্থই ভাল বাজাইতে পারি, এ নির্জলা মূর্খ, তবু কলিকাতায় গেলেই ১৫৲ টাকা বেতন পাইবে, ইহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। হায়! আমি যদি এর মতন চিন্তাশূন্য হইতে পারিতাম। কিন্তু আবার এই ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। নীলকমল দেখিতেছি কখনই বাটীর বাহির হয় নাই। নৈরাশ্য কাহাকে বলে জানে না। ইহার যে চাকরি হইবে, এ স্বপ্নের অগোচর। যখন জানিতে পারিবে যে, চাকরি হইল না, তখন আর এর দুঃখের সীমা থাকিবে না। ক্ষণকাল এই প্রকার চিন্তা করিয়া বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, তুমি আর কখন বিদেশে গিয়াছিলে?"

নীলকমল কহিল, "না।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করে তবে একা কলিকাতায় যাবে, কে রাস্তা বলে দেবে?"

নীল। রাস্তার লোকে রাস্তা বলে দেবে। কানের জল, জল দিলে বেরোয়।

বিধুভূষণ মনে করিলেন, আমি একাকী, ইহাকে সঙ্গে লইলে হয়, কিন্তু নিজের খরচের অপ্রতুল, ইহাকে আবার খেতে দিতে হলে তো যাতে পাঁচ দিন চলবে, তা দু-দিনে শেষ হয়েও যাবে। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, তুমি যে কলিকাতায় যাবে খরচপত্র এনেছ?"

নীল। খরচপত্রের মধ্যে এই বেহালা। সকলেই তো আর তোমার মতন বাজনা শুনে হাসে না। রাস্তায় যদি একজন গুণী লোক পাই তো এক দণ্ডে পাঁচ দিনের জোগাড় ক'রে নিতে পারব। যে পদ্ম-আঁখির গানটা শুনে তুমি হাসলে, কতলোক উহা শুনে কেঁদেছে।

বিধু। আমি তো তোমার গানে হাসি নাই। তোমার মাথা-নাড়া দেখে হাসি এলো।

নীল। যদি তুমি গানবাজনা জানতে, তবে অমন কথা বলতে না। তালের সময় তাল না দিয়ে কি কেউ থাকতে পারে? গাইয়ে-বাজিয়ে লোকের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

বিধু। তা জিজ্ঞাসা করা যাবে। কিন্তু আমি আর এক কথা ভাবছি। আমিও কলিকাতায় যাচ্ছি। চল, দু-জনে একত্র হয়ে যাই।

নীল। তা হলে তো ভালই হয়, কিন্তু একটা বন্দোবস্ত আগে করা ভাল। আমি বাজিয়ে গেয়ে যেখানে যা পাব, তুমি তার ভাগ পাবে না।

বিধুভূষণ সহজেই সম্মত হইলেন। অতঃপর নীলকমল গুন্‌গুন্ করিয়া 'পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে' গাইতে গাইতে, আর বিধুভূষণ ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উভয়েই বৃক্ষমূল হইতে প্রস্থান করিলেন।

নীলকমল পদ্ম-আঁখির গানটা বড়ই ভালবাসিত এবং এতই গাইত যে, যদি গানটি কোন জড়পদার্থ হইত, তবে পাষাণের মত কঠিন হইলেও ক্ষয় হইয়া যাইত।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রবাসে প্রথম রাত্রি

সন্ধ্যাকালে নীলকমল ও বিধুভূষণ এক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় রাত্রিকালে অবস্থিতি করিতে পারেন, এমন একটু স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেখানে যান, সেইখানেই ঘর পূর্ণ দেখিতে পান। খালি আর নাই। অনুসন্ধান করিতে করিতে বাজারের একটু দূরে একখানি ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলেন। ঘরখানির সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ গোটাকতক আম্রবৃক্ষ, এজন্য সন্ধ্যার পর হঠাৎ সে ঘরখানি দেখিতে পাওয়া যায় না ও পথিকেরা বাজারের মধ্যে স্থান পাইলে আর তথায় গমন করে না। বিধু ও নীলকমল তথায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেখানেও দু একজন পথিক আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি আরও দু একজন থাকিতে পারে, এমন স্থান আছে।

মুদী ঘরে নাই। কিছু দূরে এক হাটে গিয়াছে; তাহার স্ত্রী দোকানের কার্য করিতেছে। বিধুভূষণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"বাছা, এখানে দুজন লোকের থাকবার জায়গা হবে?"

মুদীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কি লোক ?"

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "একটি ব্রাহ্মণ, আর একটি শূদ্র।"

মুদীর স্ত্রী কহিল, "দু'জন ব্রাহ্মণ হলে হতে পারত। দোকানে আর দুটি ব্রাহ্মণ আছেন। এঁদের মধ্যে তো আর শূদ্র থাকতে পারবে না। কিন্তু যদি তোমার ঐ লোকটি গাছতলায় থাকে, তাহ'লে এখানে জায়গা হতে পারে।"

বিধু নীলকমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি বল নীলকমল ?" নীলকমল কহিল, "ঐ তো বারান্দায় জায়গা আছে, আমি ওখানে থাকতে পারব না ?"

মুদীর স্ত্রী। ওখানে গরু থাকবে।

নীল। গরুটা কেন গাছতলায় রাখ না ?

মুদীর স্ত্রী। গরুটা গাছতলায় রেখে তোমাকে ঘরে জায়গা দেব ? তুমি আমার গুরুঠাকুর এলে আর কি ? বিদেশে আসতে শিখেছ, গাছতলায় শুতে শেখ নি ?

নীলকমল বড় অভিমানী ছিল, সুতরাং মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া সহজে তাহার রাগ হইল। বিধুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "চল আমরা গাঁয়ের ভিতর গিয়া কোনখানে থাকি, এখানে থাকা হবে না।" বিধু পথশ্রান্তিতে কাতর ছিলেন, তিনি কহিলেন, "তুমি যাও, আমি এইখানে থাকি।"

নীলকমল আরও রাগত হইয়া কহিল, "থাক তবে, আজও থাক কালও থাক। আমি এই বিদায়। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।" এই বলিয়া নীলকমল প্রস্থান করিল, বিধু ঘরে উঠিয়া বসিলেন।

নীলকমল কিয়দ্দূর গিয়া থামিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, একটু রাগ করিয়া গেলেই বিধুভূষণ তাহাকে ডাকিবেন। বিধুরও ডাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নীলকমলের চরিত্র তাঁহার পূর্বে জানা ছিল, এজন্য তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন, ভাবিয়াছিলেন যে, নীলকমল আপনিই ফিরিয়া আসিবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। নীলকমল ক্ষণকাল একস্থানে স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, পুনর্বার না ডাকিলে কি প্রকারে যাই। রাত্রি অন্ধকার, অন্য কোন ভয় না থাকিলেও যে কেহ সে রাস্তায় চলিতে পারিত, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। গ্রামের লোকেরই সে রাস্তা দিয়া বিনা আলোকে চলা দুঃসাধ্য। নীলকমল ভাবিয়া চিন্তিয়া দু-এক পা করিয়া পুনর্বার দোকানের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধুকে ডাকিয়া কহিল, "রাত্রিকালে তোমাকে একা ফেলে যাওয়া অন্যায়, তাই ভেবে আমি ফিরে এলাম। তুমি ঘরে থাক, করি কি, আমি গাছতলায় থাকব।" কিন্তু নীলকমলের মনে মনে এই রহিল যে, হয় উভয়েই গাছতলায় থাকিবে, নচেৎ সমস্ত রাত্রি গান করিয়া কাটাইয়া দিবে, অর্থাৎ কাহাকেও ঘুমাইতে দিবে না।

বিধুভূষণের বস্ত্রাদি তাদৃশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়েছে। যে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূর্বে আর তুইটি ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, তাহাও বলা হইয়াছে। সে তুইটি ব্রাহ্মণের বস্ত্রাদি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কথোপকথনে টের পাইলেন, তাহারা কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন করে। শীতের বন্ধের পর পুনর্বার কলিকাতায় যাইতেছে। মুদীর স্ত্রী কায়মনোবাক্যে তাহাদের পাকশাক ইত্যাদির তদ্বির করিয়া দিতেছে। বিধুর কথা বড় শোনে না। তুবার কিংবা তিনবার না চাহিলে একটু তামাক কিংবা জল দেয় না। কোথায় পাক করিবেন, জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিল, "ঐ খোন্তা আছে, ঘরের ঐ কোণে একটা উন্থন কাট, ঐ মাচার উপর হাঁড়ি আছে একটা নেও, ঐ বারান্দায় কাঠ আছে, এনে রাঁদাবাড়া কর।" এই বলিয়া মুদীর স্ত্রী অপর তুজন ব্রাহ্মণের জন্য হাঁড়ি, জল, কাঠ ইত্যাদি আনিয়া দিল।

মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিধুভূষণের সর্বাঙ্গ রাগে জলিয়া উঠিল। ক্রোধব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন, "আমি যদি সব করব, তবে এখানে এসে আমার লাভ কি?"

মুদীর স্ত্রী মিষ্টি করিয়া কহিল, "এখানে কোন লাভ না হয়, যেখানে হয় সেইখানে যাও। আমি তো তোমায় বাড়ী থেকে ডেকে আনতে যাই নি।"

বিধুভূষণ দেখিলেন, এ তাঁহার নিজের বাটী নহে। রাগ করিলে এখানে কেহই তাঁহার রাগ গ্রাহ্য করিবে না। মনের আগুন মনে রাখিয়াএকটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া রসিকতা ছলে কহিলেন, "অত চটলে চলবে কেন! তুমি চটলে আমরা দাঁড়াই কোথা?"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মুদীর স্ত্রী তাঁহার রসিকতায় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "আর তোমার পিরীতে কাজ নাই, খোন্তা নিয়ে উন্থন কেটে রেঁধে খেতে হয় খাও, না হয় এইবেলা জায়গা দেখ।"

বিধুর আর বরদাস্ত হইল না। রাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তুই ভেবেছিস্, এই দোকান ছাড়া বুঝি আর দোকান নাই। চললাম তোর এখান থেকে।" এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহির হইবেন, এমন সময় মুদী বাটী আসিল, এবং মাথার মোট নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কিসের গোলমাল করছ?" মুদীর স্ত্রী কহিল, "ঐ দেখ, কোথাকার এক খদ্দের এসেছে, যেন নবাব আর কি, আপনার উন্থন আপনি কেটে রেঁধে খেতে পারবে না।"

মুদী বিধুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা, আপনারা?"

বিধু কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

মুদী। ব্রাহ্মণ, প্রণাম। আচ্ছা, আমি উন্থন কেটে দেব এখন। বসো, ঠাকুর বসো।

বিধুভূষণ বসিলেন।

গোলমাল থামিলে নীলকমল বলিয়া উঠিল, "মুদীনীর আবার জাঁক দেখ। না দেয় জায়গা, না দেয় আসন, এখনি আমরা অন্য দোকানে যাব।" কিন্তু এ কথা পূর্বে বলিতে ভরসা হয় নাই।

যে দুটি ব্রাহ্মণের জন্য মুদীর স্ত্রী এত ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল, তাঁহারা অল্পবয়স্ক; ১৯।২০ বৎসরের বেশী নহে। উভয়েই ব্রাহ্ম। এই গোলযোগের সময় তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন। অর্থাৎ একজন অতি মৃদুস্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। তাঁহার মুদিত নেত্র হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল। আর একজন হেঁট মুণ্ডে একবার মুদীনীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে, আর একবার নিজ সঙ্গীর দিকে সভয় নেত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেঁদে কেঁদে চক্ষের জল দ্বারা সে অগ্নিটুকু সত্বরই নির্বাণ করিয়া ফেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিঞ্চিৎ পূর্বে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; আড়াই বৎসর মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিয়া পরে চক্ষের জলে নিবিয়া যায়।

মুদীর প্রবেশমাত্রেই যে ব্রাহ্মণটির চক্ষু বাতাসে বিলোড়িত দীপশিখার ন্যায় একবার এদিক্ একবার ওদিক যাইতেছিল, তিনি একাগ্রচিত্তে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। মুদী তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এরা কারা?" তাহার সহধর্মিণী উত্তর করিল, "এরা ব্রাহ্মণ, কলেজে পড়ে। এখন ওদের কিছু বলো না, ওরা পরমেশ্বরের নাম করছে!"

মুদী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রীকে কহিল, "ওদের আমার ঘরে কে জায়গা দিলে? ওরা ব্রাহ্মণ তোকে কে বললে, দেখতে পাচ্ছিসনে, সব ধর্মঘট করছে? ওদের কি জাত আছে?" পরে ব্রাহ্মদ্বয়ের প্রতি, "ওগো, আপনারা ব্রাহ্মণই হও, আর যাই হও, এখন ওটো। আমার ঘরে রান্নার জায়গা হবে না, আমি হিন্দু মানুষ ধর্মঘট-টট্ কিছু বুঝিনে। ওটো ওটো।"

মুদীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদ্বয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে পাঁচ হাত লম্বা এক প্রকাণ্ড মুদীর মূর্তি রাগত হইয়া তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইতে কহিতেছে। অন্ধকার রাত, অজ্ঞাত স্থান! কোথায় যান?

উভয়েই সকরুণ স্বরে কহিলেন, "আমরা ধর্মঘট করছি তোমাকে কে বললে আমাদের কলেজের পড়া মুখস্ত করিতেছিলাম।"

"পড়াই পড়, আর ধর্মঘটই কর, আমার এখানে তোমাদের জায়গা হবে না।" যে ব্রাহ্মটি উপাসনার সময় একাগ্রচিত্তে এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহার

মনে হইল, মুদীর রাগ যেন তাঁহারই উপর বেশী—কথা কহিবার সময় যেন তাঁহারই দিকে চাহিয়া কহিতেছে, এজন্য তিনি নয়নদ্বয় উত্তোলন করিলেন না। উভয়ের উঠিতে অনিচ্ছা দেখিয়া মুদী অগ্রে তাঁহারই হাত ধরিয়া কহিল, "আমি ভাল-তরে বলছি, এই বেলা ওটো, না ওটো যদি তবে একটা গোলযোগ হবে।" এই বলিয়া মুদী ঘরের কোণের দিকে চাহিল। কোণে একগাছি স্থূলকলেবরা তালযষ্টি ছিল।

ব্রাহ্মদ্বয়ও সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন।

ঘর পরিষ্কার হইলে মুদী তাহার সহধর্মিণীকে কহিল, "বড় ধুম, যেন বাড়ীতে কুটুম এসেছে, না? ওরা কে? তোর ভাই নাকি যে তুই দোকানের কাজ ফেলে, ছুটো ভাল খদ্দের তাড়িয়ে ইষ্টদেবতার মতন ওদের সেবা কচ্ছিস্?"

মুদীপত্নী চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় তাহার সহিত কথা কহিবার সময়ও মুদী গৃহের কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

এইরূপে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গেলে মুদী তামাক খাইতে আরম্ভ করিল, বিধু পাকশাকের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ও নীলকমল গুনগুন করিয়া "পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে" ধরিল। ব্রাহ্মদ্বয় আস্তে আস্তে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মদ্বয় চলিয়া গেলে, নীলকমলেরও ঘরের মধ্যে স্থান হইল। বিধুভূষণ রন্ধন করিলেন। উভয়ে আহারাদি করিয়া শুইলেন।

বিধুভূষণ আর কখন বাটীর বাহির হন নাই। নূতন স্থান ও বাটীর ভাবনা প্রযুক্ত তাঁহার ঘুম হইল না। নীলকমল শয্যায় শয়ন করিবামাত্রই নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। একে দোকান-ঘর; চারিদিকে খোলা, তাহাতে সম্মুখে কতকগুলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, আবার রাত্রিকাল, সমুদয় নিস্তব্ধ। গাছের পাতার একটু একটু শব্দ হইলেই যেন দশগুণ হইয়া বিধুর কানে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঘরের মধ্যে ইন্দুরগুলা কিচ্‌কিচ্ করিয়া এ কোণ ও কোণ করিতে লাগিল। চাম্‌চিকাগুলা উড়িতে আরম্ভ করিল। বিধুর কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল— "নীলকমল" "নীলকমল" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে নীলকমল কহিল, "তুমি যে আমাকে বিরক্তই কল্লে।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, একবার তামাক খাও। অত ঘুমুচ্ছ কেন? বিদেশে, বিশেষ রাস্তায়, বেশী ঘুমান ভাল নয়।"

"বিদেশে রাস্তায় অত ঘুমান ভাল নয়। কেন, মন্দই বা কি? আমার কি আছে যে চোরে নিয়ে যাবে?"

বিধু কহিলেন, "তা নয় নীলকমল। আমিও বিদেশে এসেছি। কিন্তু তোমার

একটা গুণ আছে, অনায়াসে দু-টাকা করতে পারবে কিন্তু আমার তো কোন গুণ নাই। যদি তুমি বেহালাটা আমাকে শেখাও, তোমার কাছে চিরকাল কেনা রবো।"

নীলকমল বেহালা ও গানের নামে জল হইয়া যাইত। প্রফুল্লচিত্তে কহিল, "হাঁ শেখাব, তার ভাবনা কি? আজ কি আরম্ভ করব।"

"শুভস্য শীঘ্রং।" বিধুভূষণ কহিলেন, "যা শেখা উচিত, তা এখন আরম্ভই ভাল।"

নীলকমল বেহালাটি লইয়া দুই-চারিবার তাহার কানমোড়া দিয়া আরম্ভ করিল। কহিল, "আমি, যেমন বাজাই ও গাই, তুমি আগে স্থির হয়ে শোন; পরে তুমি শিখতে পারবে।" এই বলিয়া নীলকমল "পদ্ম-আঁখি" ইত্যাদি আরম্ভ করিল, বিধুভূষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হেম ও স্বর্ণলতা

বর্ধমান জেলায় বিপ্রদাস চক্রবর্তী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক ছিল না বটে, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি কমিসারিয়েটে কর্ম করিতেন। এই কার্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূল। নূতন বড়-মানুষ হইলে প্রায়ই কৃপণ হয়; কিন্তু বিপ্রদাসের সে দোষটি ছিল না। তাঁহার সদ্ব্যয় যথেষ্ট ছিল। দেবসেবায় ও অতিথিসেবায় তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইত। বাটীতে কোন পার্বণ ফাঁক যাইত না। দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি আস্থা ছিল। সংক্ষেপে তিনি একজন যথার্থ "সেকেলে" ধার্মিক ছিলেন। অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের সময় কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতেন না। এ টাকা লওয়া উচিত নয়, এ টাকা লইলে ক্ষতি নাই, এরূপ কোন চিন্তা করিতেন না। টাকা পাইলেই গ্রহণ করিতেন, এবং ঐ অর্থ দেবসেবা ইত্যাদিতে ব্যয় করিতে পারিলেই সার্থক উপার্জন জ্ঞান করিতেন। তাঁহার সহধর্মিণীর পরলোক হওয়া অবধি বিপ্রদাস কার্য পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই থাকিতেন। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা, পুত্রটির নাম হেমচন্দ্র, কন্যাটির নাম স্বর্ণলতা। তাঁহার ন্যায় অপত্যবৎসল লোক সচরাচর দেখা যায় না।

পূজার সময় যাহারা বিদেশে থাকে, সকলেই বাটী আসিয়াছে।

হেম বাড়ী আসিয়াছে। মা নাই বলিয়া পাছে আদরের ত্রুটি হয়, এজন্য

বিপ্রদাস নিজে দুবেলা আহারের সময় হেমের কাছে বসিয়া থাকেন। তাঁহার মাতাকে কহেন—বিপ্রদাসের মাতা অদ্যাপি জীবিত আছেন—"মা, আমি তোমার যেমন আদরের জিনিস, হেমও আমার কাছে তেমনি। যখন যা চায়, হেমকে তখনই তাই দিও।"

এক দিবস বিপ্রদাস স্বর্ণকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আজ আমার স্বর্ণ কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?"

স্বর্ণ পাশের ঘরে ছিল। পিতার মুখে তাহার নাম শুনিয়া দৌড়িয়া হস্ত প্রসারণ-পূর্বক তাঁহার নিকটে আসিল। কহিল, "এই যে বাবা! আমরা মাঝের ঘরে ছিলাম।"

বিপ্র। এস, মা এস। আমার লক্ষ্মী মা এস। এ কি মা, সমস্ত হাতে মুখে কালি মেখেছ কোথা থেকে?

স্বর্ণ। আমি দাদার কাছে লিখতে শিখছিলাম, দাদা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

বিপ্র। তুমি লিখতে শিখছ। তোমার লেখায় দরকার কি?—এই বলিতে বলিতে হেমও তথায় আসিল।

হেম কহিল, তাতে দোষ কি? এখন সকল মেয়েই লেখাপড়া করে। কলিকাতায় কত স্কুল হয়েছে, সেখানে কেবল মেয়েরাই পড়ে।"

বিপ্রদাস কহিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু তুমি ক'দিনই বা বাড়ী থাকবে? তুমি কলিকাতায় গেলে তখন কে শেখাবে?"

হেম। স্বর্ণ তখন আপনিই শিখতে পারবে। এই তিন চার দিনের মধ্যেই ক, খ লিখতে শিখেছে। আমি কলিকাতায় যাবার আগে ওর ফলা-বানান শেষ হবে।

বিপ্র। বটে? আমার লক্ষ্মী যে মা সরস্বতী হয়েছেন। (ক্রোড়স্থিত স্বর্ণের প্রতি) স্বর্ণ মা, তুমি আমার মা লক্ষ্মী হবে, না মা সরস্বতী হবে?

স্বর্ণ। আমি দুই হবো বাবা।

বিপ্রদাস সস্নেহ নয়নে স্বর্ণলতার প্রতি ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত হইল। পরে শিরশ্চুম্বন করিয়া স্বর্ণলতাকে ভূমে নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাও, তোমার দাদার কাছে গিয়া লেখাপড়া শেখ।" হেম স্বর্ণের হাত ধরিয়া লইয়া যে গৃহে তাহাকে শিখাইতেছিলেন, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিপ্রদাস বহির্দ্বারে আসিলেন।

পূজা সমাগত হইল। মহোৎসবে তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যতই কেন আমোদ হউক না, যতই গোলযোগ হউক না, বিপ্রদাস এক মুহূর্তের

জন্মেও হেম ও স্বর্ণলতার নাম বিস্মৃত হন না। পূজার পর স্কুল খোলা হইলেই হেম পুনর্বার কলিকাতায় গেলেন। স্বর্ণ যথার্থই অতি অল্প দিনের মধ্যে ফলা-বানান শেষ করিল। হেম কহিয়া গেলেন, "স্বর্ণ, আমি কলিকাতায় গিয়াই তোমার জন্য একখানা বই পাঠাইয়া দিব। আর যদি তুমি আমাকে লিখতে পার, তবে চৈত্র মাসে যখন বাড়ী আসব, তোমার জন্যে দিব্বি একটি খোঁপার ফুল আনব।"

স্বর্ণ সহাস্য বদনে কহিলেন, "এই কথা তো দাদা! যেন মনে থাকে।"

হেম। তা থাকবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রমদা গৃহকার্যের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—শশিভূষণের সেজন্য ভাবনা নাই

বিধুভূষণকে পৃথক করিয়া দিয়া প্রমদা তিন চারি দিবস বিনা কলহে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু যেমন অঙ্গারের মলিনত্ব শতবার ধৌত করিলেও যায় না, তেমান স্বভাবের কখন পরিবর্তন হয় না। প্রমদা ঠাকুরুণদিদির প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরুণদিদি না কি তেল নুন চুরি করেন, ঠাকুরুণদিদি কালো, ঠাকুরুণদিদি অপরিষ্কার। প্রমদা এ সকল কথা কি ঠাকুরুণদিদির মুখের উপর বলিতেন? তা নয়, মুখের উপর বলিলেই ঠাকুরুণদিদি হাঁড়িকুঁড়ি ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন, প্রমদা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। এজন্য পাড়ার অন্যান্য লোকের সহিত এ সমস্ত আলাপ হইত এবং তাহারা অবিলম্বেই এ সমুদয় কথা ঠাকুরুণদিদিকে কহিত। ঠাকুরুণদিদি একদিন মুখ ভার করিলেন, পরদিন দুই একটি অসন্তোষের কথা কহিলেন। তৃতীয় দিবস প্রমদার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিবেন ঘোষণা করিয়া দিলেন। কেনই বা না করিবেন? তিনি তো সরলার ন্যায় পরাধীনা নন? পরদিবস বৈকালে মহা ঝগড়া উপস্থিত হইল। প্রমদাও চুপ করিবার লোক নন, ঠাকুরুণ-দিদিও নন? এক জন অপরকে পরাস্ত করিবারও জো নাই। উভয়েই কলহ-বিদ্যাবিশারদ। ঠাকুরুণদিদি অনেকক্ষণ ঝগড়ার পর দুই হাতের দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রমদার মুখের কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি তোর দাসী, না তোর রাঁধুনী যে, যা মনে আসছে, তুই তাই বল্‌চিস, এই থাকল তোর বাড়ী-ঘর, আমি চল্লাম। তুই রেঁধে খাস আর না খাস, তোরই ইচ্ছা, আমার কি"—এই বলিয়া ঠাকুরুণদিদি

শশিভূষণের বাড়ী ত্যাগ করিলেন। প্রমদা কখন সমকক্ষ লোকের সহিত কলহ করেন নাই। সুতরাং এতদিন পরাস্তও হন নাই। আজ এই প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত হইলেন।

ঠাকুরুণদিদি চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রমদা একাকিনী গৃহে বসিয়া রোদন করিলেন। পরে চক্ষু মার্জনা করিয়া বাহিরে আসিলেন। আজকার বিবাদে অভিমান খাটিবে না, এজন্য নিজহস্তেই কাজকর্ম করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণ নির্দিষ্ট সময়ে বাটী আসিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরুণদিদি কোথায় ?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "ঠাকুরুণদিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" ঠাকুরুণদিদি নিজেই চলিয়া গিয়াছেন বলিতে প্রমদার কোন মতেই ইচ্ছা হইল না, বস্তুতঃ তাহাই সত্য।

শশিভূষণ কহিলেন, "কেন, ঠাকুরুণদিদির অপরাধ ?"

প্রমদা যাহা মনে আসিল, তাহাই বলিলেন। বিধুভূষণকে পৃথক করিয়া দিবার সময় ঠাকুরুণদিদি বড় ভালমানুষ ছিলেন, কিন্তু দশ দিন হইতে না হইতেই ঠাকুরুণদিদির এতগুলি দোষ উপস্থিত শুনিয়া শশিভূষণ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কখন কারে স্বর্গে তোল, আর কখন কারে নরকে ফেল, টের পাওয়া ভার। এখন দেখতে পাচ্ছি, না খেয়ে মরতে হবে। তোমার ব্যাম, তুমি পারবে না ; আমারও রাঁধবার শক্তি নাই। এখন উপায় ?"

প্রমদা কহিলেন, "সেজন্য তোমার ভাবনা কি ? তোমার তো সময়ে আহার হলেই হলো ?" .

শশি। আমার নিজের আহারের জন্য ভাবি না। ছেলেটা আর মেয়েটা আছে তারা পাছে ঘরে চাল থাকতে মারা যায়।

প্রমদা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "পরকে দিয়ে কি কাজ চলে ? কাল মাকে আনব ; আমি কষ্ট পাচ্ছি শুনলে তিনি অবশ্যই আসবেন। তা হলেই তোমার ভাবনা চুকে গেল।"

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণ যেন মুহূর্তমধ্যে জড়পদার্থের ন্যায় হইলেন এবং কি বলিতেছেন, না টের পাইয়া কহিলেন, "কেনই বা বিধুকে পৃথক্ করিয়া দিলাম ?" কারণ, প্রমদার মাকে আনা যে সহজ ব্যাপার নহে, শশিভূষণ ইতিপূর্বে তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রথমতঃ মা আসিবেন পরে বৈকালে প্রমদার ভ্রাতা আসিবেন—তাঁহাকে কাজে কাজেই আসিতে হইবে। তিনি বাটী থাকিলে তাঁহাকে কে রাঁধিয়া দিবে ? পরদিবস সূর্যদেব উঠিতে না উঠিতে প্রমদার মামা আসিবেন, তিনি

একাকী নির্জন পুরীতে থাকিতে ভালবাসেন না। শশিভূষণ যেন নিমেষের মধ্যেই এ সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া কহিলেন, "কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম?"

প্রমদা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তুমি পৃথক করিয়া দিলে, তুমিই তার কারণ জান। আমি পৃথক করেও দিইনি, তার কারণও জানি নে।"

শশিভূষণ কিছু উত্তর করিলেন না। চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রমদা বলিয়াছিলেন মাকে আনিলে আর ভাবনা থাকিবে না; সেইজন্যই বুঝি শশিভূষণ যত ভাবনা অগ্রেই ভাবিয়া রাখিতেছিলেন।

প্রমদা শশিভূষণকে চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম?" "কেন দিয়াছিলে, তা তুমিই জান। আমার কি দোষ? আমি তো তখনই বলেছিলাম, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখনও বলছি। দাও, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তোমরা একত্র হও। কত লোকে তাও তো হয়। একবার পৃথক হইলেই যে জন্মের মত পৃথক হয়, তাও তো নয়।"

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণের চৈতন্য হইল। বুঝিতে পারিলেন অপরাধ হইয়াছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমি তো আর কিছু বলিনি, কেবল—"

প্রমদা। কেবল কি? আমি তোমার ও বাঁকা-চুরা কথা বুঝতে পারি না। যা বলবার হয়, একবারে বলে ফ্যালো। আমি বকে মরি সুদ্ধ তোমারই ভালর জন্য বৈ তো নয়। আমার কি? আমি এখানে থাকলেও তুমি চারটি না দিয়ে আর থাকতে পারবে না, সেখানে গেলেও তারা আমাকে ফেলে খেতে পারবে ন ।

বোধ হয় বাপের বাড়ীর কথা লইয়া পূর্বে কি হইয়া গিয়াছিল, প্রমদার তাহা স্মরণ ছিল না। সে কথা মনে থাকিলে আর বাপের বাড়ীর নাম করিতেন না; কিন্তু শশিভূষণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। এজন্য তিনি আর সে বিষয় সম্বন্ধে কিছু কহিলেন না। ক্ষণকাল উভয়েই নীরবে থাকিয়া শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিন কোথায় গেল? কামিনীই বা কোথায়?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "বিপিন তার মামার বাড়ী গিয়াছে। কামিনী ঐ শুয়ে আছে।"

শ। শুয়ে আছে? রাত্রে কিছু খাবে না?

প্র। কি খাবে? কে রাঁধবে?

শ। আর কেউ না রাঁধে আমিই রাঁধবো। সব গোছানগাছান আছে তো?

প্র। গোছানগাছান আর কি? ও বেলার সবই আছে, চারটি ভাত হলেই হয়।

প্রমদা কিঞ্চিৎ পরে "উঃ, আজ আমার অসুখটা কিছু বেড়েছে" এই বলিয়া

শয়ন করিলেন। শশিভূষণ রান্নাঘরে গিয়া তত্রত্য দারোগাগিরি কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

দস্তুরমত প্রমদার ভাতের থালাটি ঘরে আসিল। বারংবার ডাকাডাকির পর প্রমদা মুখ বাঁকা করিয়া গিয়া আহার করিতে বসিলেন। শশিভূষণ মনে করিতে লাগিলেন, ইহাতেও যদি মন না পাই, তবে আর কিসে পাব? এই ভাবিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। প্রমদার আহার হইল। অসুখ বাড়িয়াছে বলিয়া যে এক দানা কম খাইলেন, তাহা নয়। রোজই যে পরিমাণ খাইতেন, অদ্যও তাই খাইলেন। আহারের পর আচমন করিলেন, কিন্তু এতাবৎ একটিও কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিনকে তো বলে দিলেই হতো, সে তোমার মাকে ডেকে আনত।"

এই কথা কহিয়া প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রমদা চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় অবাক হইয়া থাকিলেন। ফলতঃ বলিবারও কোন কথা ছিল না। মাকে আনিবার জন্যই বিপিনকে পাঠান হইয়াছিল।

শশিভূষণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দুই একটা হাই ছাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নাসিকাশব্দ করিয়া নিদ্রিত হইলেন। প্রমদাও শয়ন করিলেন। নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত হইল।

প্রমদা বলিয়াছিলেন, "আমি কষ্ট পাইতেছি শুনিলে মা অবশ্যই আসবেন।" কার্যতঃ প্রমদার মাতা সে পর্যন্তও শুনিতে অপেক্ষা করিতেন না। যে প্রকারে হউক, একটা খবর পাইলেই যেখানে থাকুন অমনি পাখীর ন্যায় উড়িয়া আসিতেন। বিপিনের নিকট যখন শুনিলেন প্রমদা ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তিনি তখনই আসিতেন কিন্তু তাঁহার পুত্র তৎকালে বাড়ী না থাকায় সে দিবস আসা রহিত করিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কতক্ষণে রাত পোহাবে"; এবং পুত্রের অনুপস্থিত থাকার জন্য সে দিবস যাওয়া না হওয়ায় মনে মনে তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময় গদাধর আসিয়া বাটী উপস্থিত হইলেন। প্রমদার ভ্রাতার নাম গদাধর।

গদাধর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অন্নাভাবে কৃশকলেবর। মস্তকটি ক্ষুদ্র, নাসিকা পর্যন্ত কেশে আবৃত, গলাটি লম্বা, পা দুখানি কুলার মত, লেখাপড়া সম্বন্ধে মা সরস্বতীর বরপুত্র বলিলেই হয়। প্রমদার মা সেজন্য বড় দুঃখিত। যখন তখন কহিতেন, "যারা লেখাপড়া শেখাবে, তারা ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না, তবে আর কেমন করে গদাধরের বিদ্যা উপার্জন হবে।" প্রমদার মাতার বিবেচনায় গদাধরকে লেখাপড়া শেখান প্রমদার একটি অবশ্য-কর্তব্যকর্ম।

আর একটি কথা বলিলেই গদাধরের রূপ-গুণের সমুদয় পরিচয় দেওয়া হয়, অর্থাৎ তিনি "ত"-বর্গ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং তৎপরিবর্তে "ট"-বর্গ প্রয়োগ করিতেন।

সন্ধ্যার পর বাটি আসিয়া বিপিনকে দেখিয়া কহিলেন, "কি বিপিন, টুমি কি মনে করে? কখন এলে?"

বিপিন উত্তর না দিতেই গদাধরের মাতা কহিলেন, "তুমি এমন সময় কোথায় গিয়াছিলে, গদাধরচন্দ্র?" প্রমদা ও প্রমদার মা উভয়েই "গদাধরচন্দ্র" বলিয়া ডাকিতেন, কখনই তাহার অন্যথা হইত না। পাড়ার লোকে কিন্তু "গদা" ছাড়া আর কিছুই বলিত না। "তুমি কোথায় গিয়াছিলে, গদাধরচন্দ্র? দেখ দেখি, বিপিন এসেছে—কি খাবে, কি হবে, তার কোন উদ্যোগ করলে না, লোকে কি বলবে বল দেখি?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "আমি কোটায় গিয়েছিলাম, টাটে টোমার কাজ কি? আমি কাজে ছিলাম। বিপিনের খাবার ভাবনা কি, আমরা যা খাই, বিপিনও ট্যই খাবে। এটো বিপিনের পরের বাড়ী নয়। বিপিন, বিপিন টামাক খেয়েছ?"

বিপিন। আমি তামাক খাই নে।

গদা। টুমি খাও না, আমরা টো খাই। মা, একটু টামাক সাজ।

গদাধরচন্দ্র আদরের ছেলে। নিজহাতে কখন তামাক সাজিয়া খান নাই। তাঁর মাতা খাইতে দিতেন না, তামাকের পিপাসা হইলে তিনি নিজে সাজিয়া দিতেন। গদাধরের মা তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলে গদাধর ইত্যবকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিন, টবে কি মনে করে এসেছ?"

বিপিন। "দিদিমাকে নিতে এসেছি।"

গদাধর সহাস্য বদনে কহিলেন, "মা শুনলি, টুই যে সেডিন বলছিলি, প্রমডার ডয়া মায়া নেই, কখন ডেকেও পাঠায় না আর খরচপত্র ডেয় না। এই ড্যাক, ডেকে টো পাঠ্যেছে।"

বিপিনের সম্মুখে গদাধর এরূপ বলায় গদাধরের মা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "গদাধরচন্দ্র, তোমার কি এজন্মেও বুদ্ধি হবে না? আমি কবে ওকথা বলেছিলাম?"

গদাধর। আমার বুড্ডি নেই, টোমার টো আছে, টা হলেই আমার হবে। কিণ্টু টোমার মনে ঠাকে না, এই একটা ডোষ। সেডিন টুমি এ-কটা বল্লে, আজ বল, না।

এই সময় গদাধরের মা তামাক সাজিয়া গদাধরকে হুঁকা দিলেন, গদাধরচন্দ্র

হুঁকা পাইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন, উপস্থিত কথা ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল তামাক টানিয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, একটা ডায় বেঁচে গেলাম, ডিডিডের বাড়ী গেলে আর একটু টামাকের জন্তে টোমার খোসামোড করটে হবে না।"

গদাধরের মা। গদাধরচন্দ্র, তোমার কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে?

গদা। টবু ভাল টুমি বল্লে আমার বুড্ডি লোপ পেয়েছে। টবে আমার এককালে বুড্ডি ছিল। এইডিন টো আমার বুড্ডি নেই বোলে টুমি মোরছিলে।

গদাধরের মাতা কহিলেন, "হ্যাঁ, তোমার খুব বুদ্ধি আছে, এখন দেখ দেখি, জেলেপাড়ায় চাট্টি মাছ পাওয়া যায় কি না। বিপিন এসেছে, ওকে চারটি খাওয়াতে হবে তো।"

গদা। কেন, ডিডি যে ডাল পাঠায়ে ডিয়েছিল, টা নেই?

গদাধরের মা সক্রোধে গদাধরের মুখের দিকে তাকাইলেন, অর্থাৎ সেসব কথা বলিতে বারণ করিলেন। কিন্তু গদাধর ভয় পাইবার লোক নন। তিনি কহিলেন, "অমন চোক গরম করে কাকে ভয় ড্যাকাও? আমি বুঝি জানি নে। সেডিন ডাল এসেছিল, সে কি মিঠ্‌ঠে কঠা? সেই ডাল রেঁডো, এখন আমি রাট্রে কোনখানে মাছ আণ্টে যেটে পারব না।"

গদাধরের মা সক্রোধে ভ্রূকুটি করিয়া "গদাধরচন্দ্র—"

গদা। কেন, গডাঢরচণ্ড্রকে কেন, এই টো গডাঢরচণ্ড্র আছে, টোমার ভয়ে পালাবে না। গডাঢরচণ্ড্র পালাবার ছেলে নয়, কিন্টু যডি বিরক্ট কর, টবে সব কঠা বলে ডেবে।

গদাধরের মা অনুপায় দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গদাধর তামাক খাইতে খাইতে বিপিনের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন এবং সেই কথোপকথনে আহারের সময় পর্যন্ত অতিবাহিত হইল। আহারান্তে গদাধর ও বিপিন শয়ন করিলেন। গদাধরের জননী ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র গোছাইতে লাগিলেন। এবং পরদিবস গমনের জন্য বস্ত্রাদি নির্বাচন করিলেন। সমস্ত গোছান হইলে তিনিও নিদ্রিতা হইলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে শশিভূষণ শয্যা হইতে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে "ডিডি ডিডি" রবে গদাধরচন্দ্র দেখা দিলেন। তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গদাধরচন্দ্রের মাতা, সর্বশেষে বিপিন। একে একে তিন জন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গদাধরকে দেখিয়া শশিভূষণের মনোমধ্যে যে ভাবের উদয় হইল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন; সহজেই তাহা অনুভূত হইতে পারে। আপাদমস্তক পর্যন্ত তাঁহার কলেবর ঈষৎ কম্পিত

হইল। বোধ হয় লঘুপতনক, "দ্বিতীয়কৃতান্তমিব" ব্যাধকে দেখিয়া যত অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়াছিল, শশিভূষণ সহধর্মিণীর প্রিয়তম ভ্রাতাকে দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক ভীত হইলেন।

প্রমদা ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া জননী ও ভ্রাতাকে সমাদরে বসাইয়া বাটীর সমাচার জিজ্ঞেস করিতে লাগিলেন। গদাধরচন্দ্র ক্ষণকাল বসিয়া বাটীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গদাধরচন্দ্র যে বাটীতে থাকেন, সেখানে কোন দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিবার জো নাই। তাঁহার চোখ তাহাতে পড়িবেই পড়িবে; বিশেষ যদি খাবার জিনিস হয়।

শশিভূষণ মনে মনে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। প্রমদা "ষোড়শোপচারে" আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রমদার জননী পাকশাক করিয়া নিয়মিত সময়ে আহার করিলেন। বাটীর অন্যান্য সকলেরও আহার হইয়া গেল।

শশিভূষণ এই অবধি আপনার বাটীতে আপনি পরাধীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। গদাধরচন্দ্রের মাতা বাটীর একমাত্র কর্ত্রীস্বরূপ হইলেন। গদাধরচন্দ্র স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের কারণ ভর্তি হইলেন। প্রমদা পরম সমাদরে সকলকে আহারাদি করাইতে লাগিলেন; কি জানি ত্রুটি হইলে পাছে লোকে নিন্দা করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সরলার বিরহ; শ্যামার বিক্রম

কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্তা বলিয়াছেন, "মৃত্যুকালে যে মহাবিরহ ঘটিবে, তাহাই মনে হয় বলিয়া আমাদের সামান্য বিরহে কষ্ট বোধ হয়।" এ কথা সঙ্গত বটে। নচেৎ দুঃখের তো কোন কারণই নাই। জানিতে পারিতেছি, আমার ভাই, বন্ধু আজ বাটী হইতে যাইতেছে, আবার প্রয়োজন সমাপ্ত করিয়াই প্রত্যাগত হইবে। কিন্তু তথাপি যে মন প্রবোধ মানে না, তাহার কারণ, সেই মহাবিরহের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন কেহ আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যায়, তখনই যে আমরা মৃত্যুচিন্তা করিয়া থাকি এমন নহে; কিন্তু তাহা না করিলেও বিরহবেদনার যে সেই মূল কারণ, তাহা নিশ্চয়। তুমি কাহাকে পাঁচ টাকা দান করিলে তোমার

কোন কষ্ট বোধ হয় না ; তোমার দশ টাকা হারাইয়া গেলেও তোমার বিশেষ দুঃখ হয় না, কিন্তু বাজারে যদি চারি পয়সার জিনিস কিনিতে তোমার নিকট হইতে ঠকাইয়া ছ পয়সা লয়, তাহাতে তোমার মর্মান্তিক কষ্ট বোধ হয়। কেন? কারণ, তোমার মনে হয়, তোমাপেক্ষা দোকানী অধিক চতুর, অধিক বুদ্ধিমান। লোকে নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিতে চায় না। ঠকিয়া আসিলে নিজের ন্যূনতার স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় দেওয়া হয়, এবং সেইজন্যই এত মনঃকষ্ট হয়। কিন্তু ঠকিয়া আসিলে কি কেহ এরূপ তর্ক করিয়া থাকে? ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, আমাদের মনে অনেক সময় অনেক ভাবের উদয় হয়। সেই সেই সময় ঐ সমস্ত ভাবের কারণ সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি না, অথবা ঐ কারণের অনুসন্ধানও করিয়া দেখি না।

বিধুভূষণ বাটী হইতে চলিয়া গেলে সরলার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কেনই বা যাইতে দিলাম! বাটী থাকিয়া যদি দুজনে একত্রে উপবাস করিতাম, তাহাও এ যন্ত্রণা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল ছিল।" আবার ভাবেন, "আমি কি স্বার্থপর! আমার জন্য তিনি কষ্ট পাইবেন, ইহাও আমার বাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে? বিশেষ তাঁহাকে যদি অনাহারে থাকিতে হইত, তাহাও আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না!" কবে বিধুভূষণ কি মিষ্ট কথাটি কহিয়াছেন, কবে অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু বেশী ভালবাসার চিহ্ন দেখাইয়াছেন, সরলার মনে তাহাই উদিত হইতে লাগিল। বিধুভূষণ এক এক দিন রাগ করিতেন বলিয়া, সরলার কত কষ্ট হইত, তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিয়াছেন শুনিলে সরলার কত দুঃখ বোধ হইত, সে সমস্ত কথা এক্ষণে তাঁহার মনে হইল না। তাঁহার কবে কি ব্যামো হইয়াছিল, সরলার তাহাও স্মরণ হইতে লাগিল। বিদেশে যদি সেইরূপ পীড়া হয়, তাহা হইলে কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবে? এই সমস্ত ভাবিয়া সরলা ছাতে বসিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছেন।

বিধুভূষণকে বাটীর মধ্য হইতে বিদায় দিয়া সরলা ছাতে গিয়া বসিয়াছিলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। বিধুভূষণও দু এক পা যান, আর ফিরিয়া ফিরিয়া ছাতের দিকে দৃষ্টি করেন। ক্ষণকাল এইরূপে গমন করিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁহাদিগের দৃষ্টি অবরোধ করিল। বিধুভূষণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। সরলা ঐ ছাতেই বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা করিলেন, "দৌড়িয়া গিয়া এখনও ফিরাইয়া আনি, কিন্তু কি সুখভোগ করিতে আনিব? না, আমি নিজে অনাহারে মরি তাহাও ভাল, তবু তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। দিদির দাসী হইয়া থাকিলে যদি মুখ না করিয়া চারিটি চারিটি

খেতে দিত, আমি তাহাও হইতে পারিতাম।” সরলা এইরূপ ভাবিতেছেন। শ্যামা গৃহকর্ম সমস্ত সমাপন করিয়া পাকশাকের আয়োজন করিয়া দিয়া সরলাকে ডাকিতে গেল। বেলা এক প্রহর হইয়াছে, তথাপি সরলার হুঁশ নাই। শ্যামা নিকটে গিয়া কহিল, “বলি ও ছোটগিন্নী, আর কারুর কি সোয়ামী নেই? না আর কেউ কখনও বিদেশে যায় নাই?”

শ্যামার ডাক শুনিয়া সরলার চৈতন্য হইল। ত্রস্ত হইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্যামা, কি বলছ?”

শ্যামা। কি বলব? আজ কি আর গৃহস্থদের রান্নাবাড়া হবে না? না, তোমার খিদে নেই বলে আমরা সকলেই উপোস করব?

সরলা। শ্যামা, আমার যথার্থই খিদে নেই, তুমি গিয়া রেঁধে খাও, আমি আজ আর কিছুই খাব না।

শ্যামা। আমি খেলে তো আর গোপালের পেট ভরবে না, সে যে পাঠশালা থেকে আসছে, এসে কি খাবে?

সরলা। এত বেলা হয়েছে?

শ্যামা। বেলা হবে কেন, তোমার জন্যে সুয্যিদেব বসে আছে?

সরলা সূর্যের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, যথার্থই অধিক বেলা হইয়াছে, তখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছাত হইতে নামিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। পাকশাক হইল। গোপাল খাইল, সরলার ভাতের কাছে বসা মাত্র। শ্যামা আবার বাসন-ঘর মুক্ত করিল। সেদিন গেল, তার পরদিনও গেল। সরলার বিরহানল ক্রমে ক্রমে কম পড়িয়া আসিতে লাগিল। একেবারে যে নির্বাণ হইয়া গেল, তা নয়। কিন্তু সে পাবকের শিখা আর রহিল না। সময় কি চমৎকার চিকিৎসক! শোক-তাপ যদি চিরকালই সমান থাকিত, তাহা হইলে মানবজীবন কি দুঃসহ দুঃখময় হইয়া পড়িত!

বিধুভূষণ ও শশিভূষণের পৃথক্ হইবার দিনকতক পরেই গদাধরচন্দ্রের দল আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধুভূষণ যতদিন বাটীতে ছিলেন, গদাধরচন্দ্র অথবা তাঁহার জননী সরলার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, কিংবা তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতেও সাহস পান নাই। প্রমদা মাঝে মাঝে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন বটে, কিন্তু সরলা তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তিনজন একত্রে সাবেক বাকি সুদসমেত আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিবস প্রমদা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও শ্যামা, বলি তোমাদের বাবুজী মহাশয় কোথায় গেলেন, কাপড় ধার করতে, না টাকা ধার করতে? আজকাল যে বড় গানবাজনার কথা শুনতে পাইনে?”

শ্যামা কহিল, "যদি বেঁচে থাক, আর পরমেশ্বর তোমার চোক কান বজায় রাখেন, তা হলে শুনতে পাবে।"

প্রমদা শ্যামার কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি বললি?"

শ্যামা কহিল, "আজ মাসের ক'দিন, তাই জিজ্ঞাসা কল্লেম।"

প্রমদা। দেখলে, দেখলে মাগীর আক্কেলটা? থাকত যদি বাড়ী, তা হলে এখনি মুখখান জুতো দিয়ে সোজা করে দিতাম।

সরলা কহিলেন, "শ্যামা ক্ষান্ত দে, শ্যামা ক্ষান্ত দে। ওঁর মনে যা আসে উনি তাই বলুন না, তোর তো গা ক্ষয়ে যাবে না।"

শ্যামা কহিল, "কেন ক্ষান্ত দেব? উনি কোথাকার কে!" উচ্চৈঃস্বরে প্রমদাকে সম্বোধন করিয়া "কথায় কথায় জুতো মারব বল। এস, মার না? আমারও হাত আছে।"

প্রমদা রাগে আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। "থাক্ থাক্, আসুক আগে বাড়ী, তখন তোর কত প্রতাপ দেখাব।"

শ্যামা। কত লোকে দেখিয়েছে, এখন বাকি আছ তুমি। এস না, এখনি দেখাও না? আর তার বাড়ী আসবার দরকার কি?

প্রমদা কথা না কহিয়া গৃহমধ্যে গিয়া বসিলেন। রাগে কর্ণের অগ্র পর্যন্ত রক্তিমাবর্ণ হইয়াছে, ফোঁস ফোঁস করিয়া ঘনঘন নিশ্বাস বহিতেছে। হস্তপদ সর্বদা নাড়ার দরুন অলঙ্কারের শব্দ হইতেছে। প্রমদার মাতা দেখিয়া শুনিয়া একবারে অবাক হইয়া রহিলেন। প্রমদার মাতা সম্মুখ-সমরে সাহায্য করিতেন। কিন্তু শ্যামার বিক্রম দেখিয়া তাঁহার ভরসা হইল না। তিনি এক্ষণে তনয়ার নিকটে বলিতে লাগিলেন—"মা, স্থির হও, স্থির হও। শিখান না থাকলে কি ছোটলোকের মুখে এসব কথা বেরোয়, তলে তলে টিপ্‌নি আছে, তা তো তুমি টের পাও না। আজ বাড়ী এলে সব বলে দিও। দেখ তিনি কি বলেন। বাপ্‌রে বাপ্, আমার তো আর এবাড়ী তিলার্ধ থাকতে ইচ্ছা করে না। কবে আমাকেই কি বলে বসে?"

প্রমদার মাতার কথা শেষ না হইতে হইতেই গদাধরচন্দ্র কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদাকে রাগত দেখিয়া ও জননীর মুখে উল্লিখিত কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিডি—কি হয়েছে?" ডিডি কথা কহিলেন না। গদাধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিডি কি হয়েছে?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "যা যা, ঐ দিকে যা, কোথাকার গণ্ডমুর্খটা, তোর যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত তা হলে তোর অদেষ্টে এত দুঃখ কেন?"

গদাধরচন্দ্র অজ্ঞান! তার কপালে কি দুঃখ? তার বিশ্বাস, ক্রমেই তার সুখ

বৃদ্ধি হচ্ছে। দিদির বাটি এসে পর্যন্ত তো আহার-আদি ভালই হচ্ছে, তবে আবার অসুখ কি? এই ভাবিয়া গদাধর বেকুবের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

গদাধরের মা সমুদয় কহিলেন। গদাধর শুনিয়া কম্পমান হইয়া কহিলেন, "চল্লাম আমি, ডেখি ও মাগীর কট প্রতাপ!"

এই বলিয়া লাঠি হাতে করিয়া গদাধর সরলার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন: "আয় বেটী আয়, ডেখি টোর কট জোর, আর কার প্রটাপে টুই লড়িস্!"

প্রমদা নিষেধ করিলেন না। গদাধরের মাও না। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি দু ঘা এক ঘা দিতে পারে, ভালই।

সরলা গদাধরের আস্ফালন শুনিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে গেলেন, শ্যামা কোনমতেই দরজা বন্ধ করিতে দিল না। গৃহের কোণ হইতে তরকারি-কোটা একখানা বঁটি হস্তে লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, "কোথায় সে শাককাটা বামুন? আয়, আজ তোর নাক-কান না কেটে যদি আমি জল খাই, তবে আমার নাম শ্যামাই নয়!"

বঁটির চোকাল ধার দেখিয়া গদাধরের আর ভরসা হইল না। দূর হইতে কহিলেন, "টুই আমাকে কাট্‌বি, এই চল্লাম আমি ঠানায়? ডারগা বক্‌শী ডেকে আনি।"

শ্যামা। যা তুই যেখানে ইচ্ছা সেইখানে। গিয়ে যা করতে পারিস তা করিস।

থানা সেই গ্রামেই। গদাধরের থানার এক কনস্টেবলের সহিত আলাপ ছিল। গদাধরের বিশ্বাস ছিল, তিনি গেলেই আর কেউ আসে না-আসে, সেই কনস্টেবল তো আসবেই, তা হলেই শ্যামা জব্দ হবে। দৌড়িয়া থানায় গেলেন। দেখিলেন— দারোগা কি বলিয়া দিতেছেন, আর তাঁহার আলাপী কনস্টেবল তাই লিখিয়া লইতেছে। গদাধর গিয়া কহিলেন, "ডারগা মহাশয়, ডারগা মহাশয়, শ্যামা আমার নাক-কান কাট্‌টে চায়?"

দারোগা কহিল, "তুমিই বা কে, আর শ্যামাই বা কে?"

গদাধর। আমি শশীবাবুর শালা।

দারোগা। তোমার বাপের নাম কি?

গদাধর। টা বল্লে চিণ্টে পারবে না। শ্যামা ডাসী আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমার নাক-কান কেটে ডিটে চায়।

দারোগা কনস্টেবলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রমেশ, একে তুমি চেন?"— কনস্টেবলের নাম রমেশ।

রমেশ গদাধরের কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধির পরিচয় দিল। দারোগা শুনিয়া কহিলেন, "ভাল, তোমার মকর্দমা কচ্ছি, এত বড় অন্যায়—তোমার নাক-কান কাটতে চায়।"

গদাধর। অন্যায় না, বড় অন্যায়। আপনি এর একটা সুবিচার করুন।

দারোগা কহিলেন, "আচ্ছা তা করছি। কিন্তু তোমার নাক-কান কেটেছে, না শুধু বলেছে কাটব।"

গদাধর হঠাৎ কানে হাত দিলেন। দারোগা কহিলেন, "হাঁ, আগে ভাল করে দেখ; দাবি প্রমাণ করা চাই।"

গদাধর কহিলেন, "কাটে নাই, কিণ্টু বলেছে কাটব।"

দারোগা। একটা স্ত্রীলোক বলেছে তোমার নাক-কান কাটবে, তাই তুমি দৌড়ে থানায় এসেছ? তোমার লজ্জা করে না?

গদাধর। সে টেমনি ষ্ট্রীলোক বটে। সে টো ষ্ট্রীলোক নয়, সে ষ্ট্রীলোকের বাবা। যে বঁটি টুলেছিল, যডি ডেখটে, টবে বাপ্ বাপ্ করে টুমিও পালাটে।

দারোগা। সত্যি নাকি? তবে তো তাকে জব্দ করা উচিত। তুমি এক কাজ কর। ফিরে যাও, গিয়ে ঝগড়া কর। তোমার কান কেটে দিক আগে, নৈলে তো মকর্দমা হবে না?

গদাধর। আগে যদি কান কেটে ডেবে, টবে আমি কি লয়ে নালিস করব?

দারোগা। কেন, এক কান নিয়ে?

গদাধর বুঝিতে পারিল, দারোগা ঠাট্টা করিতেছেন। তখন রাগত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, টুমি আমার মকড্ডমা না কর, আমি জেলায় যাব।"

দারোগা কহিলেন, "সেই ভাল। এসব বড় মকর্দমা এখানে হয় না।"

গদাধর উঠিয়া যাইতেছেন। দারোগা কনস্টেবলকে কহিলেন, "একটু মজা করব দেখবে?"

কনস্টেবল কহিল "কি মজা?"

দারোগা অন্য একজন কনস্টেবলকে কহিলেন "হরি সিং, এই লোকটিকে গারদে দাও তো। ও মিথ্যা এজেহার দিতে এসেছে।"

হরি সিং আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র গদাধরের হস্ত ধারণ করিয়া গারদে লইয়া গেল। গদাধর রাগত হইয়া বলিলেন, "টোমরা টের পাও নাই আমি কে? ঠাক, টোমাদের মজা ড্যাকাবো; আমি শশীবাবুর শালা, টা টোমরা জান? আমাকে গারডে ডেওয়া সোজা কঠা নয়।"

কনস্টেবল কহিল, "তুমি ঠাকুর যা করতে পার, করো। আমার কি? আমি

তো হুকুম মেনেছি। মোদ্দা তুমি আর বেশী কথা কইও না। দারোগাবাবু বললেন, বেশী কথা কইলে হাতকড়া লাগাতে হবে।"

শুনিয়া গদাধরের ভয় হইল, না জানি আবার হাতকড়া কি। তখন কনস্টেবলের পায় পড়িতে লাগিল। "হরি সিং, টোমার পায় পড়ি, আমাকে ছেড়ে ডেও।"

হরি সিং কহিল, "আমার ছেড়ে দেবার কি ক্ষমতা?"

গদাধর। টবে একবার রমেশ বাবুকে ডেকে ডেও।

কনস্টেবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রমেশবাবু আসতে পারে না!"

গদাধর। আমি রমেশবাবুর এটো কল্লাম, আর রমেশবাবু আমার সঙ্গে একবার ডেকা করলেন না। গদাধর এই প্রকার ক্রমাগত কখন খোশামোদ, কখন রাগ প্রদর্শন করিয়া পরে সন্ধ্যাবেলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। তখন দারোগা গারদে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি আর মিথ্যা মকর্দমা করবে?"

গদাধর। না।

"স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঝগড়া করবে?"

গদাধর। না।

"তিন হাত মেপে নাকখত দাও, তবে যেতে পাবে।"

গদাধর নাকে খত দিয়া প্রস্থান করিলেন।

গদাধরচন্দ্র থানায় গেলে ক্ষণকাল পরে শশিভূষণ বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন অপেক্ষা সেদিন সকালে কাছারি বন্ধ হইয়াছিল। বাটী আসিয়া প্রমদাকে রাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা আনুপূর্বিক সমুদয় বলিলেন, কেবল প্রথমতঃ তিনিই যে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, সেইটুকু বাদ দিলেন। শশিভূষণ শুনিয়া প্রথমতঃ চটিয়া উঠিলেন। সুযোগ বুঝিয়া প্রমদার মাতাও আবার এই সময়ে দুই একটি টিপ্পনী করিলেন। কিন্তু শশিভূষণ রাগ করিয়া শ্যামার কি করিবেন? তাহাকে ধরিয়া মারিতেও পারিবেন না, কিংবা এই কথা লইয়া মকর্দমাও করিতে পারেন না। সাতপাঁচ ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হিসাব পাস

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শশিভূষণের বুদ্ধি বিলক্ষণ প্রখর ছিল। সেই বুদ্ধিই শশিভূষণের উত্তরোত্তর উন্নতির মূল। প্রথমতঃ পাঁচ টাকা বেতনে প্রবেশ করেন, কিন্তু এক্ষণে পঁচিশ টাকা হইয়াছে। তাঁহার উপরে একমাত্র দেওয়ানজী আছেন। পরম্পরায় শুনা যাইতেছে, দেওয়ানজী বুঝি বেশী দিন আর না টেকেন। শশিভূষণের বুদ্ধি দর্শন করিয়া বাবু যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় শশিভূষণকে দেওয়ানী কার্যের ভার দিলে তাঁহার আর নিজে কিছু না দেখিলেও চলিবে। হিসেব কিতেব দেখা কি ঝঞ্ঝাটের কাজ? বাবু একবিন্দু বিশ্রাম পান না, আমোদ-প্রমোদ করা তো দূরে থাকুক; ভাবিয়া পান না—তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি কি প্রকারে এ সমস্ত কার্য করিবার অবকাশ পাইতেন। বিশেষ তাঁহাদের সময়ে তো দুই তিনটি বৈ আমলা ছিল না। বাবু স্থির করিলেন, "সেকেলে" লোকে খুব পরিশ্রম করিতে পারিত, তাঁহাদের বুদ্ধি তাদৃশ সূক্ষ্ম ছিল না। যাহাদের বুদ্ধি অধিক, তাহারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে না। পরমেশ্বরের নিয়মই এই।

আশ্চর্যের বিষয় এই, লোকে পরস্পরের ঐশ্বর্যেই হিংসা করে, বুদ্ধি বিদ্যার হিংসা করিতে দেখা যায় না। আমা অপেক্ষা এর জমি বেশী, ওর টাকা বেশী, অনেকেই বলে। কিন্তু কে কোথায় কাহাকে বলিতে শুনিয়াছে, "আমা অপেক্ষা অমুকের বুদ্ধি বেশী?" বুদ্ধি থাকিলে ধন হয়, জমি হয়, জমিদারি হয়, কিন্তু তথাপি অমুকের মতন আমার বুদ্ধি হউক—এ কথা কেহই বলে না।

বাবুর পিতা পিতামহেরা এক সন্ধ্যা আতপান্ন আহার করিয়া কৃশকায়ে যাহা করিতেন, বাবু তিন বেলা মৎস্য মাংস ও প্রয়োজনমত বলকারক "আরক" সেবন করিয়াও তাহা করিতে পারেন না। তাঁহার বুদ্ধি কম? তা নয়। তবে কি না "সেকেলে" লোকের বরদাস্ত হইত। বাবুর ততদূর সহ্যগুণও নাই, আর ততদূর শারীরিক বলও নাই।

শশিভূষণের বুদ্ধি আছে, বল আছে, সহিষ্ণুতা আছে এবং মিষ্ট কথায় মনের তুষ্টি সম্পাদন করার শক্তিও আছে। তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চ-পদাভিষিক্ত হইবেন, তাহার বিচিত্র কি?

শশিভূষণের অধীনে এক্ষণে সাত আট জন আমলা। সকলেই বিশ্বাসী। শশিভূষণ সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী। তিনি যাহা দেখিয়া দিবেন, তাহাতে "ভুলচুক" থাকিবার জো নাই। সমস্ত খরচ তাঁহারই হাতে।

শশিভূষণ হিসাবের কতকগুলি কাগজ হস্তে লইয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বাবু, শিবমন্দির ও শিবপ্রতিষ্ঠার খরচের হিসাব প্রস্তুত হয়েছে দেখুন।"

বাবু (বন্ধুগণ-পরিবেষ্টিত)। তুমি ভাল করে দেখেছ? কোন ভুলচুক নাই তো?

শশী। আমি তো কিছুই টের পেলাম না। আমার যতদূর বিদ্যা, তার মধ্যে এক পয়সাও তফাত দেখতে পাচ্ছি না। আপনি না দেখলে ভুলচুক আছে কি না, কি প্রকারে বলব।

বাবু মহা সন্তুষ্ট! শশিভূষণের অপেক্ষা এসব কর্ম বেশী বোঝেন। শশিভূষণ তাহা নিজেই স্বীকার করেন। "কহিলেন, তবে আর আমি কি দেখব, তুমি দেখেছ, তা হলেই হলো।"

শশিভূষণ তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্মচারীর সমভিব্যাহারে হিসাব পাস করিতে গিয়াছিলেন। বাবুর কথা শুনিয়া পরস্পর একবার চোখাচোখি করিলেন। তাঁবেদার কর্মচারী ঈষৎ হাস্য করিলেন। কিন্তু সে হাসি শশিভূষণ টের পাইলেন, আর কাহারও টের পাইবার জো নাই; শশিভূষণ ঈষৎ চক্ষু গরম করিলেন, যেন সে স্থানে সে সময়ে সে হাসিটুকুও হাসা ভাল হয় নাই। তাঁবেদার মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

বাবুর একজন বন্ধু ইংরাজীতে কহিলেন, "কাজ হইয়া গেল, এক্ষণে ইহাদিগকে বিদায় করিবার আপত্তি কি?"

বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আর কোন কাজ উপস্থিত আছে?"

শশী। আজ্ঞা না। আপাততঃ তো কিছু দেখছি না। হস্তস্থিত কাগজগুলোকে একবার নাড়িয়া "এটায় মোট কত খরচ হলো, একবার দেখলে ভাল হতো না।"

বাবু শশিভূষণের কাগজ নাড়া দেখিয়া ভাবিলেন, একবার আরম্ভ করিলে তো সহজে শেষ হয়, তাহার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ ছিপিখোলা বোতলটা তক্তাপোশের নীচে রহিয়াছে। তাহা হইতে কত উড়ে যাইতেছে। গেলাসে যেটুকু ঢালা আছে, সে তো একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "কত হয়েছে বল।"

শশী। চব্বিশ হাজারের ইস্টিমিট ছিল, কিন্তু একত্রিশ হাজার তিনশত তের টাকা খরচ হয়েছে।

কথাগুলি কহিয়া শশিভূষণের ওষ্ঠাধর যেন ঈষৎ কম্পিত হইল।

বাবুও যেন একটু আশ্চর্য হইলেন। কিন্তু বয়স্যগণের মধ্যে এই কটি টাকার জন্য সমুদয় হিসাব দেখা কিছু অপমানের কথা বিবেচনা করিয়া কিছু বলিলেন না। একজন বয়স্য ইংরাজীতে কহিলেন, "ইস্টিমেটের চাইতে প্রকৃত খরচ তো চিরকাল বেশী হয়ে থাকে।" বাবু কতক অভিমানের ভয়ে, কতক বন্ধুর কথায় শশিভূষণের হস্ত হইতে কাগজগুলি লইয়া ইংরাজীতে নাম সই করিয়া দিলেন। হিসাব পাস হইল।

হিসাব স্বাক্ষরিত হইলে শশিভূষণ কাগজগুলি লইয়া কাছারি আসিলেন। এদিকে তক্তাপোশের নিম্ন হইতে গেলাস ও বোতল উপরে উঠিল। বাবুরা আমোদে আসক্ত হইলেন। শশিভূষণ অধীনস্থ কর্মচারিগণের সহিত বাটী পৌছিয়া লাভ বণ্টন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ পুরাতন বাড়ীটা কি করিবেন ?

প্রমদার মাতা ও ভ্রাতার আগমন এবং শশিভূষণের দেওয়ান হওয়া অবধি শশিভূষণের বাটীতে থাকিবার অত্যন্ত অসুবিধা হইল। বাটীতে স্থান অল্প। বৈঠকখানা অর্দ্ধেক হইতে হইতেই বন্ধ রহিয়াছে। শশিভূষণ ভাবিলেন, আর অল্প খরচ করিলেই বৈঠকখানাটি প্রস্তুত হয়। অতএব তাহাই করা উচিত। কিন্তু প্রমদা এ পরামর্শে অনুমোদন করিলেন না। ঘরটি প্রস্তুত হইলে বিধুভূষণকে কালে তাহার অংশ দিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় কথা আর কি হইতে পারে ? শশিভূষণের প্রমদার কথা লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য হইল না। সুতরাং অন্য একটি স্থান ক্রয় করিয়া শশিভূষণকে বৈঠকখানা প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইতে হইল। কিন্তু স্থান ক্রয় করিবার সময় এই এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল—"কাহার নামে কেনা যায় ?" শশিভূষণের নিজ নামে তো হইতেই পারে না। কারণ, তাহা হইলে পাছে বিধুভূষণ মকদ্দমা করিয়া তাহার অংশ লয়। সেই কারণ প্রযুক্ত প্রমদার নামেও হইল না। পরিশেষে সাতপাঁচ ভাবিয়া গদাধরচন্দ্রের নামে স্থান খরিদ করা হইল। গদাধরের ইহাতে আহ্লাদের সীমা রহিল না।

প্রথমতঃ বৈঠকখানাই প্রস্তুত করিবার কথা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটি সুন্দর বাটী হইল। শশিভূষণ সপরিবারে সেই নূতন বাটীতে উঠিয়া গেলেন। সরলা, গোপাল

ও শ্যামা সেই পুরাতন বাটীতে রহিলেন। এখন পুরাতন বাটীতে যে অংশ আছে, তাহা কি করিবেন, শশিভূষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামে বাটী ভাড়া হইবার সম্ভব নাই। শূন্য ফেলিয়া রাখিলেও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। শশিভূষণ প্রমদাকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা একটু মিষ্টি হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগে তুমি কি মনে করেছ বল, তারপর আমার মনের কথা বলব।"

শশী। না, আগে তুমি বল।

প্রমদা এবার একটু মন কেড়ে লওয়া-গোছের হাসি হাসিয়া শশিভূষণের নিকট গিয়া বসিলেন এবং সেইরূপ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুমি না বললে আমি বলব না।"

শশী। আমি মনে করেছি, ও-বাড়ীটা সমুদয়ই বিধুকে দিব।—এই সময়ে প্রমদার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, মুখচন্দ্রিমা মেঘাচ্ছন্ন, অমনি পুনরায় কহিলেন, "এই মনে করেছি, কিন্তু তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে কি আমি কোন কাজ করতে পারি? এখন তোমার বিবেচনায় কি হয় বল।"

প্রমদা। আমার বিবেচনা নিয়ে তুমি কি করবে। তোমার বাড়ী, তোমার যা খুশি তাই কর।

শশিভূষণ কথার ভাব বুঝিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন? ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আজ এ কথা এই পর্যন্তই থাক, আর এক দিন হবে। দু-দিন থাকলে বাড়ীটে আর পচে যাবে না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নীলকমল কর্তৃক অদৃষ্টের ফলাফল বর্ণন

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা বিধুভূষণ ও নীলকমলকে এক মুদীর দোকানে রাখিয়া অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহারা সে রাত্রি সেই মুদীর দোকানেই ছিলেন, তাহাও জানেন। পরদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মুদীর দোকান হইতে পুনরায় কলিকাতার পথে চলিলেন। ক্ষণকাল গমন করিয়া উভয়ে এক বৃক্ষমূলে শ্রান্তি দূর করিবার মানসে উপবেশন করিলেন। পূর্বদিবস নীলকমল ক্রমাগতই গান করিয়াছিল। অদ্য নীলকমলের মুখে কথা নাই।

যে সর্বদা বকে, তাহাকে চিন্তাকুল দেখিলে তাহার সমভিব্যাহারী লোকের মনে এক প্রকার কষ্ট অনুভূত হয়। বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন। বিধুভূষণের মনেও সেই কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু কথা কহিতে গেলেই পাছে নীলকমল গান ধরে, এই ভয়ে এতক্ষণ কথা কন নাই; বৃক্ষমূলে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল কি ভাবছ?"

নীলকমল কথা কহিল না।

বিধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল কি ভাবছ?"

নীলকমল কথার জবাব না দিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাঠাকুর, (নীলকমল এই অবধি বিধুভূষণকে দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল) যে সাহেবরা খ্রীষ্টান করেন, তারা যা বলে, সব কি সত্যি?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কি বলে তা না শুনলে কেমন করে বলব?"

"এই যে তারা বলে, খ্রীষ্টান হলে মেম দেবে, তা কি যথার্থই দেয়?"

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? যদি দেয়, তা হলে তুমি খ্রীষ্টান হবে না কি?"

নীলকমল কহিল, "হতে তো ইচ্ছা করে, কিন্তু জাত যাবে যে? আচ্ছা, বেহ্মজ্ঞানী হলে কি তারা বিয়ে দিয়ে দেয়?"

বিধু কহিলেন, "তা তো আমি বলতে পারিনে।"

নীল। বেহ্মজ্ঞানী হলে জাত যায় না, তাই আমার ইচ্ছা করে বেহ্মজ্ঞানী হই। কিন্তু যদি পাদরি সাহেবরা মেম দেয়, তা হলে খ্রীষ্টানই হই। বাঙ্গালি বে করার চাইতে মেম বে করা ভাল। কেমন দাদাঠাকুর, ভাল নয়?

বিধু। সে যার যেমন ইচ্ছা। তুমি যে মেম বে করবে, তাকে খেতে দেবে কি, আর পরাবেই বা কি?

নীল। সেই তো ভাবনা। আমি তাই ভাবছিলাম। যাই, বিদেশে তো যাচ্ছি, কিছু-না-কিছু অদেষ্টে জুটে যাবেই।

বিধু। তার আর সন্দেহ কি?

উভয়ে পুনরায় বৃক্ষমূল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। নীলকমল তথাপি পূর্বদিবসের ন্যায় কথা কহে না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, "দাদাঠাকুর, যার যা কপালে থাকে, কেউ খণ্ডন করতে পারে না। আমি তার এক গল্প জানি। আমারও যদি কপালে লেখা থাকে মেমের সঙ্গে বে হবে, তা হবেই হবে।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গল্প বলো দেখি ?"

নীলকমল নিম্নলিখিত গল্পটি বর্ণনা করিল।

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার স্ত্রী ও পুত্র ছিল। এক দিবস রাত্রে ব্রাহ্মণ সপরিবারে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় ঘরের আড়কাটা হইতে একগাছি রজ্জু ঝুলিতেছে দেখিতে পাইল। ব্রাহ্মণ পাশ ফিরিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিদ্রা হইল না, পরে হঠাৎ সেই রজ্জুগাছ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এবার পূর্বাপেক্ষা একটু লম্বা বোধ হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিল, ইঁদুরে দড়িগাছা ফেলিয়া দিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে দড়িগাছ একটি সাপের ন্যায় হইল। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে ডাকিবে, কিন্তু ইতিপূর্বেই সাপ নামিয়া তাহার স্ত্রীকে ও পুত্রকে দংশন করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত হইল। তাহার স্ত্রী ও পুত্র অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করিল। সাপটিও গৃহদ্বারে একটি রন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ সাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভোর হইলে সাপ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া এক কৃষকের প্রাণবধ করিল ; এবং একটু পরে এক বৃষ হইয়া একটি বালককে নষ্ট করিল। ব্রাহ্মণ এখনও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। ক্ষণকাল পরে সেই বৃষ একটি বৃদ্ধ মানুষের আকার ধারণ করিল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধ প্রথমতঃ পরিচয় দিতে অস্বীকার করিল ; কিন্তু ব্রাহ্মণের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কহিল, "আমি কর্মসূত্র। অর্থাৎ যাহার যেরূপে মৃত্যু হইবে অদৃষ্টে লেখা থাকে, আমি সেইরূপে তাহার প্রাণ সংহার করি।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কিসে মরিব বলিয়া দিন।" বৃদ্ধ কহিল, "পাগল! সে কথা বলিতে নাই।" কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই তাহার পা ছাড়িবে না, অগত্যা বৃদ্ধ কহিল, "তোমাকে গঙ্গায় কুমীরে মারিবে।"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় আর বাটী না গিয়া পূর্বমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল ; অর্থাৎ যে-দেশে গঙ্গা নাই। দিনকতক গমনের পর এক রাজার রাজ্য ত্যাগ করিয়া আর এক রাজার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় এক বাটীতে বাসা করিয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ যে রাজ্যে গমন করিল, তথাকার রাজার সন্তানাদি হয় নাই। ব্রাহ্মণ শুনিয়া রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমি এক স্বস্ত্যয়ন জানি, করিলে আপনার সন্তান হইবে।" রাজা তচ্ছ বণে ব্রাহ্মণকে স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করিলে মহারাজের এক বৎসরের মধ্যে একটি পুত্র জন্মিল।

রাজা ব্রাহ্মণকে নিজ বাটী রাখিলেন। এবং রাজপুত্র বড় হইলে ব্রাহ্মণকে

তদীয় শিক্ষাকার্যে নিয়োগ করিলেন। রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া দেশভ্রমণে যাইবেন। রাজা ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে যাইতে কহিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "আমি সর্বস্থানে যাইতে পারিব, গঙ্গাতীরে যাইব না।" রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ আত্মবৃত্তান্ত সমুদয় পরিচয় দিল। রাজা হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে গঙ্গাতীরে যাইতে হইবে না।" রাজপুত্র ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে নানা স্থান পর্যটন করিয়া গঙ্গাতীরে যাইবার মানস প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত যাইতে অস্বীকার করিল। কিন্তু রাজপুত্র কহিলেন, "আপনাকে তো আর রাস্তা হইতে কুমীরে লইয়া যাইবে না? তবে যাইতে ভয় কি?" ব্রাহ্মণ অগত্যা সম্মত হইল।

যোগের সময় রাজপুত্র গঙ্গাস্নানে যাইবেন, এজন্য ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "আপনি তীরে থাকিয়া মন্ত্র পড়াইবেন, তাহাতে ভয় কি?" ব্রাহ্মণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজকুমারের সহিত গমন করিতে হইল। গঙ্গাতীরে সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছে দেখিয়া তাঁহার সাহস হইল। রাজপুত্র স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন; ব্রাহ্মণ তীরে থাকিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। কিন্তু লোকের কোলাহলে রাজপুত্র শুনিতে না পাইয়া কহিলেন, "আমার লোকে চতুষ্পার্শ্বে ফিরিয়া দাঁড়াইবে, আপনি মধ্যস্থলে থাকিয়া মন্ত্র পড়ান।" বলিবামাত্র রাজপুত্রের লোকে তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং ব্রাহ্মণও সেই বেষ্টনের মধ্যে গিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। মন্ত্র সমাপন হইলে রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয়, আমি সেই কর্মসূত্র।" এই বলিতে বলিতে কুম্ভীরের রূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া সলম্ফে গভীর জলে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ নীলকমলের গল্প শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ চিন্তাকুলও হইলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ে এক রাস্তার ধারে দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নীলকমল দোকানে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোকানী ভাই, এখানে দু-জন ব্রহ্মজ্ঞানী এসেছিল?

বিধু কহিলেন, "কেন, সে কথায় তোমার কাজ কি?

নীল। যদি এসে থাকে, তবে ঐ রাস্তায় যে কথাটা বলেছিলাম, তার মীমাংসা করে যেতাম।

মুদী কহিল, "না বাবু, ব্রহ্মজ্ঞানী-ট্যানি কেউ এখানে আসে নি।" নীলকমল মুদীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইল। তার মনে বিশ্বাস ছিল যে, দোকানে আসিয়া পূর্বরাত্রের ব্রাহ্মদ্বয়ের সহিত দেখা হইবে।

অতঃপর উভয়েই সেই দোকানে স্নানাহার করিলেন, এবং পথশ্রান্তিতে অত্যন্ত কাতর থাকায় সে রাত্রিও সেই স্থানে যাপন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শহরের সুখ

পরদিবস প্রাতে আবার উভয়েই চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যতই কলিকাতার সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, নীলকমলের ততই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কিন্তু কলিকাতা কেমন স্থান, নীলকমল তাহার কিছুই জানে না; এজন্য বিধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দাদাঠাকুর, কলিকাতা কেমন জায়গা?"

বিধু। কেমন জায়গা জিজ্ঞাসা কল্লে এখন আমি কি বলব? কত বড় তাই জিজ্ঞাসা করছ, না কেমন জলহাওয়া, এর আমি কোন্‌টার জবাব দেব?

নীল। আমি সব জিজ্ঞাসা করছি। কলিকাতায় কি আমাদের দেশের মত মাটি?

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমাদের দেশের মতন, নাকি আর এক রকম মাটি?"

নীল। আচ্ছা, কলিকাতা যে বড় শহর বলে—তা শহরটা কি আমাকে বল দেখি।

বিধু। শহর এই যে, মস্ত বাজার, অসংখ্য দোকান, অসংখ্য লোকজন।

নীল। আচ্ছা, আমাদের হাটে যত লোক হয়, তত লোক?

বিধু। কোথায় তোমাদের হাট? কলিকাতায় যত লোক, এত লোক এ দেশে আর কোন জায়গায়ই নাই।

নীল। আচ্ছা, সেখানে ক-দিন অন্তর হাট হয়?

বিধু। হাট কি? সেখানে কি হাট আছে? রোজই যে-জিনিস ইচ্ছা হয়, তাই কিনতে পাওয়া যায়। কতশত দোকান আছে! রোজ কতশত জায়গায় বাজার বসে।

নীল। আচ্ছা, রোজ বাজার বসে, আর এত দোকান আছে, রোজ খদ্দের হয় কোথা থেকে? আমাদের হাট তো মস্ত হাট, কিন্তু তা তো রোজ হয় না। আর একদিন জিনিস কিনলে আর তিনদিন কিনতে হয় না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "কোথা থেকে খদ্দের হয়, একটু পরে দেখতে পাবে। আমি আর এখন বকতে পারি না।"

উভয়ে ক্ষণকাল মৌনভাবে চলিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বল দাদা-ঠাকুর, কোথা থেকে খদ্দের হয়?"

বিধু কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন, "বল্লাম এখনকার সময় নয়, তবু জিজ্ঞাসা করবে? অমন কর তো আমি কিছুই বলব না।"

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। কলিকাতার যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই লোকের সমারোহ বেশী দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদাঠাকুর, এত লোক কোথায় যাচ্ছে? বোধ হয় কোন জায়গায় যাত্রা হচ্ছে।"

বিধু। হাঁ, যাত্রা হচ্ছে না তোমার মাথা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ না, প্রায় কলিকাতায় পৌঁছিলাম। এখানেও লোক হবে না তো কোথায় হবে?

নীল। এত লোক কি সকলেই কলকাতায় যাচ্ছে?

বিধু। হাঁ।

নীলকমল আবার খানিক চুপ করিয়া থাকিল। শ্যামবাজারের নিকটবর্তী হইয়াছে। একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া নীলকমল বলিয়া উঠিলেন, "দাদাঠাকুর, হ্যাদে দেখ, এ আবার একটা কি?"

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "নীলকমল, তুমি কখন গাড়ী দেখ নি?"

নীল। দেখব না কেন? রহিম ঘরামির গাড়ী দেখেছি, আর আর কত লোকের গাড়ী দেখেছি।

বিধু। সে তো গরুর গাড়ী। কখন ঘোড়ার গাড়ীর নাম শোন নি?

নীল। এরি নাম ঘোড়ার গাড়ী?

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "হাঁ। কেন, তুমি কি কৃষ্ণনগর যাও নাই? সেখানে কত ঘোড়ার গাড়ী আছে।"

নীলকমল কহিল, "আমি ভাবতাম, ঘোড়াগাড়ী আর গরুর গাড়ী একই রকম, এতে গরু যোড়ে, ওতে ঘোড়া যোড়ে। এ দেখি একখান পালকির মতন, তা কেমন করে টের পাব?"

এই বলিতে বলিতে উভয়ে শ্যামবাজারের পুল পার হইল। নীলকমল পুল পার হইয়া দেখে, কতকগুলি গাড়ী যাচ্ছে। অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, হ্যাদে ডানদিকে দেখ, কত ঘোড়াগাড়ী। বাপ্ রে?"

নীলকমলের চোখ আর রাস্তার দিকে নাই; ক্রমাগত এদিক ওদিক দেখিতেছে, এমন সময় একখান গাড়ী আসিয়া তাহার গায়ে পড়িবার জো হইল। গাড়োয়ান "হট্ যাও" বলিয়া হাতের চাবুক দ্বারা নীলকমলকে প্রহার করিল। নীলকমল হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল, গাড়ী তাহার উপর চড়িবার উপক্রম করিতেছে। অমনি 'বাবা রে' বলিয়া রাস্তার ডানদিকে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, এ তোমার গাঁ নয়, তোমার গাঁয়ের হাটও নয়, এখানে রাস্তা দেখে না চল্লে মারা পড়বে। এখনি গিয়েছিলে আর কি!"

নীল। দাদাঠাকুর, এখন অবধি আমি তোমার গা ধরে চলব।—এই বলিয়া বিধুভূষণের হস্ত ধারণ করিলে বিধু কহিলেন, "আমাকে ধরলে লাভের মধ্যে এই যে, তুমিও মারা যাবে, আমিও মারা যাব। তা না করে তুমি আমার পিছুপিছু এস, আর মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখ। পাগলের মত এক জিনিসের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেক না।"

বিধুভূষণ যদিও কখন কলিকাতায় আসেন নাই, কিন্তু কৃষ্ণনগরে সর্বদা তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং তিনি নীলকমলের মত বেকুব নন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কলিকাতা তত নূতন বোধ হইল না। নীলকমলকে ডাকিয়া কহিলেন, "নীলকমল, কলিকাতার মধ্যে থাকা তো বড় কষ্ট, চল আমরা কালীঘাট যাই, গঙ্গাস্নান করা হবে, কালীদর্শন হবে, আর সেখানে একটু এর চাইতে কম গোলযোগ শুনিছি।"

নীলকমলের কলিকাতা দেখিবার জন্যে যত স্পৃহা ছিল, দেখিয়া তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হইল না। চাবুকের আঘাতটা এখনও জ্বলিতেছে, সুতরাং কালীঘাটে কম গোলযোগ শুনিয়াই সেখানে যাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদাঠাকুর, এখানে লোক কী সুখে থাকে? চারিদিক্ থেকে যে গন্ধ বেরুয়েচে, আর রাস্তায় বেরুলে হয়ত চাবুক খেতে হয়, নয় গাড়ী চাপা পড়তে হয়।"

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিল, "কলিকাতায় থাকবার ঐ সুখ।"

"আমি এখন সুখ চাই নে। চল, এখন কালীঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌছতে পারলে হয়। ঘোড়াগাড়ীর যে হাঙ্গাম?"

বিধু। কালীঘাটে তো যাব, কিন্তু রাস্তা চিনি নে তো, শুনেছি কালীঘাট এর দক্ষিণ, চল দক্ষিণমুখে যাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুহৃদ্ভেদ

কালীঘাটে যাইবেন কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিধুভূষণ ও নীলকমল দক্ষিণমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ভবানীপুরের বাজারে আসিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "নীলকমল, এই তো কালীঘাট বোধ হচ্ছে। কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর দেখি, কালীবাড়ী কোথায়?"

নীলকমল রাস্তার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "কালীবাড়ী কোথায় ?"

যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে একজন ঢাকাই চালওয়ালা মহাজন। পূর্বদেশে কখনও কথার সোজা জবাব দেয় না। একটা প্রশ্ন করিলে তৎপরিবর্তে পাঁচটা জিজ্ঞাসা করাই সে দেশের নিয়ম। নীলকমলের কথা শুনিয়া মহাজন জিজ্ঞাসা করিল, "আসচো কোয়াহে হে ?"

নীলকমল কহিল, "কেষ্টনগর থেকে।"

মহাজন। আর কহন কি কলকাতায় আস নাই ?

নীলকমল। তা হলে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করব কেন ?

মহাজন। যাবা কোয়ানে ?

বিধুভূষণের বিরক্তি ধরিয়া উঠিল। রৌদ্রে চলিয়া চলিয়া মাথা ধরিয়াছে। ক্ষুধায় গা ঘুরিতেছে। ঢাকাই মহাজনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমরা যাব চুলোয়।"

মহাজন বিধুভূষণের কথা শুনিবামাত্র চটিয়া উঠিয়া কহিল, "এ যে বারি বরমানুষ দেহি, যেন রাজা রাজবল্লভের নাতি। যা তোরা দেহে নে গে কালী-বারী, আমি তো বল্‌মু না।"

বিধুভূষণ। না বল্লে তো বয়েই গেল। চল নীলকমল, আমরা খুঁজে নিতে পারব।

আবার খানিক দূর গিয়া বিধুভূষণ মনে করিলেন, রাস্তার লোকের উপর বিরক্ত হইয়া নিজে কষ্ট পাওয়া অতি নির্বোধের কাজ। এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ গলায় একখানা গামছা, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, হাতে একছড়া ফুলের মালা, তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। বিধুভূষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কালীঘাটে কোন্ দিক্ দিয়ে যাব ?"

জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ব্রাহ্মণ চিরপরিচিতের ন্যায় বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিল, "তার জন্যে ভাবনা কি ? আমার সঙ্গে এস, আমি সেইখানে যাচ্ছি।" নীলকমল ও বিধুভূষণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ব্রাহ্মণটি মা-কালীর পাণ্ডা। সে যে-শিকারে বাহির হইয়াছিল, তাহাই পাইয়াছে। রাস্তায় নানাবিধ মিষ্টালাপ করিয়া বিধুকে ও নীলকমলকে কালীঘাটে লইয়া গেল।

বিধুভূষণ ও নীলকমল প্রায় অপরাহ্নে কালীঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। নীলকমলের গঙ্গা দর্শন করিয়া অভক্তি হইল। বিধুভূষণকে কহিল, "দাদাঠাকুর, এই কালীঘাটের গঙ্গা ? এরই এত নাম ? এর চেয়ে আমাদের হাঁসখালির নদী ঢের ভাল, সেখানে কাদাও কম।" বিধুভূষণ বলিলেন, "এই গঙ্গায়

এত লোক উদ্ধার হলো, আর তুমি আর আমি কি হতে পারব না?" এইরূপ গল্পে স্নান সমাপন করিয়া উভয়ে কালীর মন্দিরে গেলেন। পাণ্ডাজী সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মন্দির দেখিয়াও নীলকমলের বড় ভক্তি হইল না, কিন্তু কালী দর্শন করিয়া একেবারে অভক্তির পরাকাষ্ঠা হইল। "দাদাঠাকুর, দূরে থেকে সব জিনিসের বড় বড় কথা শুনা যায়। তুমি বল্লে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যে দিব্বি বলো আমি করতে পারি, এর চেয়ে আমাদের গাঁয়ে রামা কুমোর ভাল ঠাকুর গড়তে পারে।" বিধুভূষণ কহিলেন, "আচ্ছা, পারে ভালই, এখন যা করতে এসেছ করে যাও।"

উভয়ের কালী দর্শন করা হইল। মন্দিরের দ্বারে একজন কালীর পরিচারক ছিল। বিধু ও নীলকমল প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্রেই সে দর্শনী ও প্রণামী পয়সা চাহিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিতে হবে?"

পরিচারক কহিল, "তাহার নিয়ম নাই, কিন্তু আট আনার কম নয়, অধিক যত দিতে পার, ততই তোমাদেরই ভাল।"

বিধুভূষণ কোমরস্থিত থলি হইতে চারি আনা দিলেন। নীলকমল না দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দিলে না?"

নীলকমল কহিল, "আমি বাবুর চাকর, আমি আর কি দেব?"

উভয়ে মন্দির হইতে বাহিরে আসিলে পাণ্ডা হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল, "আমাকে কি দেবে দাও।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "তোমাকে আর কি দেব? একবার তো দিয়ে এলাম।"

পাণ্ডা কহিল, "ও তো প্রণামী দিলে। তুমি প্রণামী কেন লাক টাকা দাও না। তাতে তো আমার কোন লাভ নাই। আমি যে তোমাদের সঙ্গে করে এনে কালী দর্শন করালাম, তার বকশিশ কই? আর ফুল দিলাম, সিন্দুর দিলাম, এর দক্ষিণা কৈ?"

বিধুভূষণ ট্যাঁক থেকে আর চারি আনা পাণ্ডাকে দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কালীঘাটের লোকে যদি একবার টের পায় কাহারও কাছে পয়সা আছে, তাহা হইলে তাহাকে সহজে ছাড়ে না। বিধুভূষণের হাতে পয়সা আছে দেখিয়া অন্ততঃ পঁচিশ জন স্ত্রী-পুরুষে আসিয়া মালা হাতে করিয়া তাঁহাকে ও নীলকমলকে ঘিরিয়া ফেলিল। আর যাইবার উপায় নাই। সম্মুখে যাইতে গেলে পশ্চাৎ দিক্ হইতে কাপড় ধরিয়া টানে, পশ্চাতে আসিতে গেলে সম্মুখে টানে, যেদিকে যান অপর দিক্ হইতে তিন চারি জন টানাটানি করে। আর এত আশীর্বাদ ও গোলমাল করিতে লাগিল যে, সেখানে যে না গিয়াছে সে কখন তাহা অনুমান করিতেও সমর্থ হয় না।

বলিলেও বিশ্বাস করে না। বিধুভূষণ বিরক্ত হইয়া কোমর হইতে পয়সা সকলকে কিছু কিছু দিতে গেলেন। কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয়, কোমরে থলি নাই। উচ্চৈঃস্বরে নীলকমলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, আমার থলি কি হলো?"

নীলকমল কহিল, "আমি আপনার মাথা বাঁচাতে পারি নে, তা তোমার থলি কোথায় কেমন করে বলব।"

বস্তুতঃ নীলকমলের মাথা বাঁচান দায় হইয়া উঠিয়াছিল। যে যে-দিক্ হইতে পারিতেছে, তার কপালে সিন্দুর দিতেছে। সকলেরই যে কপালে পড়িতেছে, তা নয়। কেউ গালে দিতেছে, কেউ কানে, কেউ নাকে, একজন খানিক তার চক্ষুর মধ্যে দিল। মালা এতই দিয়াছে যে, নীলকমলের একপ্রকার বোঝা হইয়া উঠিল। নীলকমল ক্রমাগতই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "ওগো, আমার কাছে কিছু নেই, আমাকে কেন মিথ্যা কষ্ট দাও।"

অতি কষ্টে বিধু ও নীলকমল গোলের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন খোট্টাকে তাঁহাদেরই মত আক্রমণ করিয়াছে। ন'লকমল তথায় আর এক মুহূর্তও দাঁড়াইল না। "দাদাঠাকুর, ওই আবার আসছে, আমি চল্লাম। আর কোন্ শালা এখানে থাক্‌বে" এই বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। বিধুভূষণ আস্তে আস্তে আসিতেছেন। দৌড়িয়া পলায়ন কলিকাতায় সহজ ব্যাপার নহে। নীলকমলের পিছু পিছু অমনি ধর ধর বলিয়া লোক দৌড়াইতে লাগিল। নীলকমল যতই যায়, লোকের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। খানিক দৌড়াইয়া নীলকমল আর পারিল না। তিনদিন রাস্তায় চলিয়াছে, বিশেষ সেদিন কিছুই আহার করে নাই; একটা মোড় ঘুরিবার সময় নীলকমল পড়িয়া গেল। অমনি সকলে আসিয়া নীলকমলের চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইল, কিন্তু কিজন্য তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া আসিয়াছে, কেহই জানে না। লোকে আসন্নকালে যেমন সংসারের দয়া-মায়া পরিত্যাগ করে, নীলকমল সেইরূপচিত্ত হইয়া কহিল, "দাও দাও, কত মালা আছে আর কত সিন্দুর আছে দাও। একটা চোক গিয়েছে, নয় বাকি যেটা আছে সেটাও যাবে।" নীলকমলের কথায় লোক মনে করিল এটা পাগল, তাই ভাবিয়া একটু পরে সকলে হাসিয়া চলিয়া গেল। নীলকমলের বেদনায় চক্ষে জল পড়িল, একটু রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফিরিয়া বিধুভূষণের নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু নীলকমল আর পথ চিনিতে পারিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় সন্ধ্যা হইল, তথাপি মন্দির খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুধায় শরীরে আর সামর্থ্য নাই। ইটের রাস্তায় পড়িয়া গিয়া শরীরে স্থানে স্থানে চর্ম উঠিয়া গিয়াছে। এই

অবস্থায় নীলকমল এক বাটীর দরজায় বসিল। একাকী বিদেশে কোথায় যাইবে, কাহার বাড়ীতে থাকিবে ভাবিয়া নীলকমল কাঁদিতে লাগিল।

যে বাটীর দ্বারে বসিয়া নীলকমল রোদন করিতেছিল, সন্ধ্যার সময় সে বাটীর বাবু কাছারি হইতে বাটী আসিয়া নীলকমলকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

নীলকমল কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, "আমি নীলকমল।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে বসে কাঁদছ কেন?"

নীলকমল কহিল, "আমি হারায়ে গিয়েছি।"

বাবু। সে কি রে? তুই হারিয়ে গিয়েছিস কেমন করে?

নীলকমল আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণনা করিল। শুনিয়া বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাটীর মধ্যে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া তিনি নীলকমলকে জলখাবার দিলেন। আহার করিয়া নীলকমলের শরীর প্রায় পূর্ববৎ হইল। তখন নীলকমল মনে করিল, এই সময় একবার গুণের পরিচয়টা দেওয়া যাউক। এই ভাবিয়া বাবুকে কহিল, "আমি যাত্রার দলে থাকব বলে এসেছি, ভাল বেহালা বাজাতে পারি।"

বাবু কহিলেন, "একবার বাজাও দেখি।"

নীলকমল বেহালাটি বাহির করিয়া দেখিল, চার পাঁচ জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নীলকমলের সর্বস্বধন বেহালাটি। সেটির এমন দুর্দশা দেখিয়া নীলকমলের চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

নীলকমল কথা না কহিয়া বেহালাটি বাবুর সম্মুখে রাখিল। তদ্দর্শনে বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাবু কহিলেন, "তুমি কেঁদ না, আমি তোমাকে একটা বেহালা কিনে দিব।"

নীলকমল কহিল, "দেবেন বটে, কিন্তু এমনটি আর হবে না।"

বাবু কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দোকানে যেও। দোকান থেকে তোমার যেটি পছন্দ হয়, সেটি নিও।"

নীলকমল আশ্বস্ত হইল এবং চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। পরে রাত্রে আহারাদি করিয়া সেই বাটীতে শয়ন করিয়া রহিল।

বিধুভূষণের যথাসর্বস্ব এক থলির মধ্যে—সেই থলি চুরি হওয়ায় তাঁহার যে পর্যন্ত দুঃখ হইল, তাহা অনির্বচনীয়। নীলকমলকে সকলে তাড়াইয়া লইয়া গেল, তাহা দর্শন করিয়া তিনি আরও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন একাকী এখানে আসিয়া কি কুকর্মই করা হইয়াছে। পথশ্রান্তিতে, মনোদুঃখে ও

জঠরানল প্রজ্জলিত হওয়ায় বিধুভূষণের চক্ষু হইতে দরদর করিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। মনোদুঃখে একাকী গঙ্গাতীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন ; এমন সময়ে তাঁহার পূর্বপরিচিত পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাণ্ডাজী পুনর্বার শিকারে বহির্গত হইয়াছে। বিধুভূষণ পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গেলে তিনি চারিটি অন্ন পান। পাণ্ডা কহিল, "সেজন্য ভয় কি ? তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে প্রসাদ দেব এখন।" বিধুভূষণ পাণ্ডার সমভিব্যাহারে আসিয়া কালীর ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন। এবং সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরের এক কোণে শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন, পরে নাটমন্দিরের এক কোণে বসিয়া রহিলেন। অবাক্—তিনিও কাহারও সহিত কথা কহেন না, অন্য কেহও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আইসে না। যখন বড় সমারোহ হইল, একটু এদিক্ ওদিক্ চলিয়া বেড়াইলেন। ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন এবং পূর্বদিবসের মত নিদ্রায় রজনী যাপন করিলেন। এইরূপে বিধুভূষণ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাসের উইল

হেম স্বর্ণলতার লেখাপড়া সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ ঘটিল। কাহারও কাছে সাহায্য না লইয়া স্বর্ণলতা অতি সত্বরেই পুস্তকাদি পাঠ করিতে শিখিলেন এবং হেমকে প্রতিশ্রুত পত্রখানি লিখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া হেমের যারপরনাই আহ্লাদ হইল। বাটী আসিবার সময় তিনি একটি খোঁপার ফুল খরিদ করিয়া আনিলেন এবং বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্রেই স্বর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, এই তোমার পত্রের জবাব এনেছি।" স্বর্ণ হেমের স্বর শুনিয়া দৌড়িয়া গৃহমধ্য হইতে আসিয়া হেমের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। হেম ফুলটি স্বর্ণের হাতে দিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, এই নাও তোমার ফুল। দেখ, আমি যা বলেছিলাম, তাই করেছি কি না ?" স্বর্ণ হেমের হস্ত হইতে হাসিতে হাসিতে ফুলটি লইয়া আপনার খোঁপায় পরিলেন।

হেম যখন বাটী আসিয়া পৌছিলেন, তখন বিপ্রদাস অনুপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাগত হইলেন। হেম বাটী আসিতেছে শুনিয়া তিনি প্রায় কোন স্থানে যাইতেন না। গেলেও অধিক দেরি করিতেন না। বাহির হইতে হেমের

স্বর শুনিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্লনেত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বর্ণ পিতাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত প্রসারণপুর্বক তাঁহার কাছে গেল। বিপ্রদাস অমনি স্বর্ণকে কোলে লইলেন। স্বর্ণ কহিল, "এই দেখ বাবা, দাদা আমার জন্যে ফুল এনেছে।"

বিপ্রদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এ-পর্যন্ত কথা কহিতে পারেন নাই। স্বর্ণের ফুল দেখিয়াও কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার নেত্রযুগলে দুইটি মুক্তাফল দেখা দিল। বিপ্রদাস প্রেম-অশ্রুপাত করিলেন। তদ্দর্শনে স্বর্ণের চক্ষে সেইরূপ মুক্তাফল ফলিল। হেম মাটির দিকে মাথা নামাইলেন। যে-গৃহে মধ্যে মধ্যে এরূপ মুক্তাফল ফলে না, সে গৃহের গৃহস্থেরা যথার্থ দীন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া হেমকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্নানের-বেলা হইলে সকলে স্নানাহার করিলেন।

স্বর্ণলতা পুর্ববৎ হেমের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া হেম বিস্মিত হইলেন। মাঝে মাঝে বিপ্রদাস খাটে শয়ন করিয়া থাকেন এবং স্বর্ণ ও হেম নীচে বসিয়া কি পাঠ করে শ্রবণ করেন। সে সময় বিপ্রদাসের চক্ষে জল ধরে না।

দেখিতে দেখিতে হেমের ছুটি ফুরাইয়া গেল। ছুটি চিরকালই দেখিতে দেখিতে যায়। হেম পুনরায় বাটী হইতে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিপ্রদাস এক দিবস কহিলেন, "হেম! আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন, "আমার ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়ছে ছাড়াতো কমছে না? এইবেলা একটু লেখাপড়া কিছু করে যাই। তা না করে যদি মরি, তা হলে যা কিছু আছে, কবে কে তোমাদের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে নেবে।"

হেম বিপ্রদাসের কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া হর্ষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিজন্যে যাইবেন শুনিয়া মুহূর্তমধ্যে তাঁহার মুখ ম্লান হইল। বিপ্রদাস হেমের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "উইল করব, তাতে ভয় কি? লোকে কি উইল করলেই মরে।"

হেমের চক্ষু দিয়া দরদর অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বিপ্রদাস হেমের চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, "ছি কানতে নাই। কত লোকে ছেলেবেলাই উইল করে। একবার উইল করে আবার কতবার বদলায়।"

হেম ক্রন্দন সংবরণ করিলেন। নির্ধারিত দিবসে তাঁহারা কলিকাতায় যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

বিপ্রদাসের যে গ্রামে বাটী, সে গ্রামের বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ হাইকোর্টের উকিল।

বিপ্রদাস হেমের বাসায় দুই এক দিবস অবস্থিতি করিয়া ভবানীপুরে বিনয়বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন।

বিনয়বাবু বিপ্রদাসকে দেখিয়া যত্ন ও ভক্তি করিয়া বসাইলেন। অন্যান্য গল্পের পর বিনয়বাবু বিপ্রদাসের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্রদাস কহিলেন, "বাপু, আমরা তো বুড়ো হয়ে পড়লাম, এখন কবে মরি তার ঠিক নাই। তাই ভাবলাম, এইবেলা একটা উইল না করে গেলে পাছে পরে ফাঁকি দিয়ে নেয়।"

বিনয়বাবু উত্তর করিলেন, "সে ভালই বিবেচনা করেছেন। উইলের ভাবনা কি? যখন বলবেন করে দেব; কিন্তু আপনি কাকে কি দিবেন মনে করেছেন?"

বিপ্র। যা কিছু আছে, মনে করেছি—সমান ভাগে স্বর্ণকে আর হেমকে দিয়ে যাব। ওর আর চুলচিরে ভাগ করায় কাজ কি?

বিনয়বাবু কহিলেন, "তা হলে হেমের প্রতি অন্যায় হয়। মনে করুন, স্বর্ণের বিবাহ হলে তো হেম তার বিষয়ের অংশ নিতে যাবে না?"

বিপ্র। বিনয়বাবু, যা বলছ সত্য বটে, কিন্তু মেয়েটি যে সৎপাত্রে পড়বে, তার নিশ্চয় কি? বিশেষ হেম ব্যাটাছেলে; বেঁচে থাকলে কত বিষয় করতে পারবে। আমার বাপ তো আমাকে কিছু দিয়ে যান নাই।

বিনয়। সর্বসমেত কত টাকা রেখে যাচ্ছেন?

"সেকেলে"-লোক সববিষয়ে খোলা বটে, কিন্তু সঞ্চিত বিষয় কত, কাহাকেও বলে না। বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমার যৎকিঞ্চিৎ আছে। তা তুমি যেখানে উইল করবে, তোমার কাছে আর গোপন করলে কি হবে? উইল লেখার দিন টের পাবে।"

বিপ্রদাস এই বলিয়া সে দিবস বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। দিনকতক পরে উপযুক্ত স্ট্যাম্পে উইল লেখা হইল। বিপ্রদাসের ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল। হেমকে তাহার পনের হাজার দিলেন ও স্বর্ণকে পনের হাজার দিলেন। হেম প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ও স্বর্ণলতার বিবাহ হইলে উইলের শর্ত আমলে আসিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধর ও শ্যামা

গদাধর থানায় কি হইয়াছিল, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু মনে মনে কিরূপে শ্যামা ও সরলাকে জব্দ করিবেন, এই চিন্তাই সর্বদা করিতে লাগিলেন। প্রমদাও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার

স্বামী বাটী আসিয়া শ্যামার বিধিমত লাঞ্ছনা করিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি কিছু করিলেন না, তখন মনে করিলেন, আর কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজেই শ্যামাকে শাসন করিবেন। কিন্তু শ্যামাকে কিছু বলিতে কাহারও সাহস হয় না।

এক দিবস রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শ্যামা ও সরলা শুইয়া আছেন, ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে। প্রমদা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পুরাতন বাটীতে গিয়া সরলার শয়নঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। শুনিলেন, সরলা ও শ্যামা উভয়ে কথোপকথন করিতেছে। সরলা কহিলেন, "শ্যামা, প্রায় তিন মাস হইল, তবু একখান পত্রও পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় গেলেন ? কি হলো, তার কিছুই টের পেলেম না। আমার ভাবনায় শরীর শুখিয়ে যাচ্ছে।"

শ্যামা উত্তর করিল, "তার ভাবনা কি ? এই পত্র এলো। মনে কর, তিনি একে বিদেশে গিয়েছেন, সেখানে দেখেশুনে নিতেই কত দিন গিয়েছে, একটু স্থির হয়ে না বসলে তো আর কেউ পত্র-টত্র লিখতে পারে না।"

সরলা। তা সত্য বটে, কিন্তু তিন মাসও তো অল্প সময় নয় ?

শ্যামা। তিনি যে তিন মাস এক জায়গায় আছেন, তারই বা ঠিক কি ? যাত্রার দল তো কখন এক জায়গায় বসে থাকে না। হয়ত আজ এখানে, কাল ওখানে ফিরে বেড়াচ্ছেন, তাই পত্র লিখিবার কোন সুবিধা পান নাই।

সরলা। আমাদের খরচপত্রও বুঝি প্রায় শেষ হয়ে এলো, এর পর কি হবে, আমি তাই ভাবছি।

শ্যামা। তার ভয় কি ? এখনও যা আছে, তাতে ছয় মাস অনায়াসে চলবে।

সরলা। শ্যামা, তুমি যে ঐ ভাঙ্গা সিন্দুকে টাকা রাখ, এ কিন্তু ভাল নয়। কবে কে টের পেয়ে একদিন সব নিয়ে যাবে।

শ্যামা। কেই বা টের পাবে যে, সিন্দুক ভাঙ্গা। যদি তুমি চুরি কর তা হলে যাবে, আর আমি চুরি করলে যাবে। এ ছাড়া আর চুরি করতে আসবে কে।

প্রমদা এত দূর পর্যন্ত শুনিয়া দ্বারের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বড়ই আহ্লাদ হইল। একবার মনে করিলেন, সেই রাত্রিই টাকাগুলি চুরি করিবেন। কিন্তু নিজে গেলে পাছে ধরা পড়েন, এই ভাবিয়া রাত্রে চুপ করিয়া রহিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে শশিভূষণ কাছারি চলিয়া গেলে গদাধর ও জননীকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। গদাধরচন্দ্র আহ্লাদে আটখান হইয়া কহিল, "ডিডি, টোমার আর কিছু কোরটে হবে না। আমি একলাই পারব, কিন্টু ডুয়ার খোলা পেলে হয়।"

গদাধরের মাতা কহিলেন, "সেজন্যে ভয় নাই। আমি আজ পাঁচ দিন দেখছি, ওরা দোর খুলে রাখে। কিন্তু গদাধরচন্দ্র সাবধান, শ্যামা যদি জেগে থাকে, তবে তুমি এমন কাজে যেও না।"

গদাধর উত্তর করিল, "ভয় কি মা! আমি গায়ে টেল মেখে যাব, যডিও ঢরে-টরে, একটান মেরে পালাব।"

প্রমদা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, দূরে শ্যামাকে আসিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "গদাধর চুপ চুপ্।" গদাধর চুপ করিল। পরে প্রমদা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "গদাধরচন্দ্র, আজ না তুমি বাড়ী যেতে চেয়েছিলে, যাও না কেন?"

গদাধরও উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "এখন টো রোড হয়ে উঠল, ওবেলা যাব।" সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ অগ্রে গদাধর কাপড়চোপড় পরিয়া বাটী যাইবার জন্য বাহির হইলেন। কিন্তু রাত্রি ১০টা ১১টার সময় পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রমদা দরজা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং গদাধর নিঃশব্দেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রীষ্মকাল, সরলা ও শ্যামা দরজা খুলিয়া শুইয়া আছেন, দু-জনের মধ্যে শুইয়া গোপাল নিদ্রা যাইতেছে, শব্দটি মাত্র শুনা যাইতেছে না। গদাধর সুযোগ বুঝিয়া সরলার গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক টাকাগুলি লইয়া সেই রাত্রেই বাটি চলিয়া গেলেন। পরদিন ৭টার সময় গদাধর ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় আসিবার সময় মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন গোলযোগের কথা শুনিতে পাইলেন না। পাড়াগাঁয়ে শহরের মত প্রত্যহ টাকার প্রয়োজন হয় না। সরলার কোন খরচপত্রের আবশ্যক হয় নাই। শ্যামাও সে দিবস সিন্দুক খোলে নাই। সুতরাং সে দিবস কোন গোলযোগও হইল না।

পরদিবস আহার করিয়া গোপাল পাঠশালায় যাইবার সময় কহিল, "মা, আজ মাইনে দিতে হবে, গুরুমহাশয় কালই নিয়ে যেতে বলেছিলেন, তা আমার মনে ছিল না। আজ না দিলে হবে না।" সরলার তখন অবসর ছিল না। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামা, গোপালের পাঠশালের মাইনে দাও।"

শ্যামা সিন্দুক খুলিয়া যে স্থলে টাকা থাকে খুঁজিয়া পাইল না; মনে করিল, সরলা টাকা স্থানান্তরে রাখিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। এজন্য সরলাকে কহিল, "খুড়ী-মা, আমার সঙ্গে চালাকি?"

সরলা কহিলেন, "সে কি শ্যামা?"

শ্যামা। ইঃ—উনি কিছু জানেন না আর কি?

সরলা কহিল, "শ্যামা, যথার্থই আমি কিছু জানি নে।"

শ্যামা সরলার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, সরলা যাহা বলিয়াছেন যথার্থ। তখন কহিল, "তুমি তো টাকা কোন জায়গায় রাখ নাই।"

সরলা কহিলেন, "আমি তো দু-তিন দিন হলো সিন্দুকের কাছেও যাই নি।"

শ্যামা কহিল, "তবে যথার্থই টাকা চোরে নিয়েছে।" উভয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সিন্দুকের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। টাকা কোথাও নাই। সরলার মুখ শুখাইয়া গেল। কপালে ঘর্ম বহিতে লাগিল। কাতরস্বরে কহিলেন, "শ্যামা, উপায় ?"

শ্যামা কহিল, "আর কিছু না, ঐ বিট্‌লে বামুন নিয়েছে। এ গদার কর্ম। এত দিন না, তত দিন না, হঠাৎ ও পরশু বাড়ী গেল কেন? ও-ই টাকা চুরি করে নিয়ে রেখে আসতে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হলো, ওরা সেদিন সকলে ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ করছিল, আমি ওদের বাড়ীর দিকে গেলাম তখন চেঁচিয়ে কথা কইতে আরম্ভ করলে। চল্লাম আমি থানায়, ও কেমন বামুন আমি দেখব।"

এই বলিয়া শ্যামা গৃহমধ্য হইতে বাহির হইল। প্রমদা, গদাধর ও গদাধরের জননী এ দু-দিবস ক্রমাগত চৌকি দিতেছিলেন কখন টের পায়। আপাততঃ সরলার গৃহে উচ্চ কথা শুনিয়া পরস্পর তিন জনে হাসিতে লাগিলেন।

শ্যামা বাহির হইয়া কহিল, "আমি টের পেয়েছি, কে টাকা চুরি করেছে? এ সব গদাধরের কর্ম। সেদিন বাড়ী গেল, যেন কেউ টের পেলে না আর কি? এখন আমি বলছি, ভাল চাও তো টাকাগুলি দাও, না দিলে আমি থানায় খবর দেব। আমি কাউকে ছেড়ে কথা কব না। ধাড়ি বাচ্ছা সকলেরই নাম করে দেব।"

গদাধর বাহির হইয়া কহিল, "কি টুই বকবক করছিস? কে টোর টাকা নিয়েছে? ফের যডি টুই চোর বলিস, টবে আমিই টোকে ঠানায় নিয়ে যাব।"

শ্যামা। তোর আর আমাকে থানায় নিয়ে যেতে হবে না। সেদিন গিয়েছিলি না থানায়? কি কল্লি গিয়ে?

গদাধর মনে করিল, শ্যামা তাহার বিদ্যা টের পাইয়াছে, পাছে বেশী কথা কহিলে সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে ঝগড়া ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্যামা বলিতে লাগিল, এই "আমি চল্লাম। আমি কাহারো উপরোধ করব না। ঘরে পুলিস এনে খানাতল্লাসি করে তবে ছাড়ব।" শ্যামা এইরূপ বলিয়া বাটীর বাহির হইতেছে এমন সময় শশিভূষণ কাছারি হইতে বাটী আসিলেন। পুলিস খানা-তল্লাসির কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবার কি হয়েছে?"

শ্যামা কহিল, "গদাধর আমাদের টাকা চুরি করেছে, যদি ভাল চায় এখনই দিক, নইলে আমি চল্লাম, এই পুলিস ডেকে আনি গিয়ে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "শ্যামা আমার সঙ্গে এস—আমি অনুসন্ধান করে দেখি, পরে তুমি থানায় যেও।" শ্যামা শশিভূষণের কথায় ফিরিয়া আসিল।

শশী কাপড়-চোপড় ছাড়িলেন। শ্যামা গদাধরের বাটী যাওয়া ও তাহার পূর্বে তাহাদিগকে পরামর্শ ও পরে টাকা হারানর বিবরণ সমুদয় বর্ণনা করিল। শশিভূষণ শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই না বলিয়া শ্যামাকে কহিলেন, "শ্যামা, এখন এই টাকাটি দিয়া গোপালকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। আমি আহারাদি করে ইহার বিচার করব।"

শ্যামা তাই করিল।

শশিভূষণ আহারাদি করিয়া সমুদয় পুনরায় প্রমদার নিকট শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। প্রমদাকে কিছু না বলিয়া পুনরায় কাছারি যাইবার সময় শ্যামাকে ডাকিয়া কহিয়া গেলেন, "শ্যামা, কে টাকা নিয়েছে ঠিক হলো না। কিন্তু পুলিস আনিয়া গোলের প্রয়োজন কি, তোমার যত টাকা গিয়েছে, আমিই দেব।"

কাছারি হইতে আসিয়া শশিভূষণ শ্যামাকে পুনরায় ডাকিয়া টাকাগুলি গণিয়া দিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গোপালের দুই মা

শশিভূষণের বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে রামচন্দ্র ঘোষের বাটীতে পাঠশালায় গোপাল লিখিতে যায়। রামচন্দ্র ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসে। পাঠশালায় ষাট সত্তর জন বালক লেখে। বালকেরা সকলে সারি সারি বসিয়া আছে। তন্মধ্যে গুরুমহাশয় হুঁকা-কলিকা-বেত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের মেজের উপর বেত্রাঘাতপূর্বক "পড়ে লেখ্ পড়ে লেখ্" বলিয়া সিংহনাদ করিতেছেন।

বালকেরা যাহার যতদূর গলা, উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া লিখিতেছে। কেহ কেহ পঞ্চমে তুলিয়া "ক লেখ খ লেখ" করিতেছে, কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে "রামকৃষ্ণ পরামাণিক" "জন্মেজয় মিত্র" ইত্যাদি যুক্তাক্ষরে নাম লিখিতেছে। অসংযুক্ত বর্ণের নাম গুরুমহাশয়ের গ্রাহ্য হয় না। কলার পাতায় কেহ হেঁকে হেঁকে "সেবক

শ্রীউত্তমচন্দ্র দেবশর্মণঃ" পাঠ লিখিতেছে। কাগজলেখক ছাত্রেরা যেন মস্ত মস্ত জমিদার মহাজন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থের প্রতি দৃকপাতই নাই। যেমন তেমন বাংলা কাগজে মহামহিম পাঠ লিখিয়া দু-লাখ পাঁচ-লাখ টাকাই কর্জ দিতেছে। কেহ গ্রামকে গ্রামই পত্তনি পাট্টা ইজারা দিতেছে। টাকার সুদ, কি জমির নিরিক লইয়া কোনই গোলযোগ হইতেছে না। এতেও গভর্নমেণ্ট জমিদারদিগকে নিন্দা করেন।

নিধিরাম পাততাড়ি কক্ষে করিয়া ডান হাতে দোয়াত ঝুলাইয়া পাঠশালায় দেখা দিল। গুরুমহাশয় নিধিরামের দেরি হইয়াছে বলিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। নিধিরাম উপস্থিত হইবামাত্রেই গুরুমহাশয় সমাদরে নিধিরামকে ডাকিলেন—"নিধে, এদিকে আয় তো।" হুকুম পাস করিয়াই গুরুমহাশয় বেত্র আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে নিধিরামের ওষ্ঠ, তালু শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু গুরুমহাশয়ের হুকুম লঙ্ঘন করিবার জো নাই। নিধিরাম আস্তে ব্যস্তে এজলাসের নিকটে অগ্রসর হইল।

গুরুমহাশয় দক্ষিণ হস্তে বেত্রাস্ফালন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে নিধে, আজ তোর দেরি হলো?"

নিধিরামের চক্ষের তারাদ্বয় মস্তকে উঠিয়াছে। যেন নিধিরামের অন্তিম কাল উপস্থিত। ঢোক গিলিয়া নিধিরাম উত্তর করিল, "সকালবেলা তামাক ছিল না, তাই তামাক মেখে আনতে দেরি হয়ে গিয়েছে।"

এক কথাতেই গুরুমহাশয়ের রাগ কমিয়া গেল। কলিকাটি নিধিরামের হাতে দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, সাজ তোর এক কলিকা তামাক। যদি ভাল হয়, তবে কিছু বলব না, মন্দ হলে তোর হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় করব।"

নিধিরাম বাঁচিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাততাড়ি ফেলিয়া কলিকা-হস্তে তামাক সাজিতে গেল।

আড়ালে আসিয়া নিধিরাম তামাক সাজিল এবং নিজে দুই এক টান দিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে লইয়া গেল। নিধিরাম হালি তামাকে দীক্ষিত, সুতরাং যে ইচ্ছা, সেই তামাক তার কাছে ভাল লাগে। তাহার মুখে ভাল লাগিলে গুরুমহাশয়ের মুখে ভাল লাগিবে এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে গুরুমহাশয়কে কলিকাটি দিয়া নিজের জায়গায় বসিতে যাইতেছে।

গুরুমহাশয় দুই চারি টান টানিয়াই নিধেকে ডাকিলেন। আজি নিধের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। নিধে মনে করিতে লাগিল, "হায়, আমি সকালবেলা উঠে কার মুখ দেখেছিলাম? অদৃষ্টে যে কি আছে বলা যায় না।"

কিন্তু ভাবিলে আর কি হইবে? এক পা দু-পা করিয়া কম্পিতকলেবরে নিধিরামকে হুজুরে হাজির হইতে হইল।

গুরুমহাশয় কহিলেন, "তবে রে পাজি, তুই কি এই তামাক আমার জন্য এনেছিস?"

নিধি। আমার দোষ কি গুরুমহাশয়! বাবা কাল হাট থেকে যে তামাক এনেছেন, আমি তাই এনেছি।

"তোর বাবা কেমন তামাক আনে আমি দেখাচ্ছি," বলতে না বলতে অমনি গুরুমহাশয় সপাং সপাং করে নিধিরামের পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

গুরুমহাশয় নিধিকে প্রহার করিয়া, বীরভাব ধারণ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "দোলের পার্বণী যার যার বাকি আছে দাও।"

পাঁজিতে যত পার্বণ আছে, গুরুমহাশয় তার প্রতি পার্বণে পয়সা আদায় করেন। যদি বাপ মা না দিতে চান, গুরুমহাশয় বালকদিগকে চুরি করিয়া আনিতে শিখাইয়া দেন। ছেলেরা যদি সুবিধামতে বাহিরে পয়সা না পায়, তবে বাড়ীর কোন জিনিসপত্র চুরি করিয়া বেচিয়া গুরুমহাশয়কে পয়সা দেয়। গুরুমহাশয়কে সন্তুষ্ট করা আর দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, বালকদের কাছে উভয়ই তুল্য।

দোলের পার্বণী পয়সা যাহারা যাহারা আনিয়াছিল, গুরুমহাশয়কে দিল। গোপাল দিতে পারিল না।

গুরুমহাশয় গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "গোপাল, তোমার পয়সা কোথায়?"

গোপাল সকাতরে উত্তর করিল, "গুরুমহাশয়, আমি কাল দেব।" প্রহারের ভয়ে গোপাল বলিল, কাল দেব, কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার ঠিক নাই। গুরুমহাশয় বলিলেন, "তুমি আজ তিন দিন দেব বলে দিতে পারলে না; কাল যদি না পাই, তবে তোমাকে নিধের মতন করব।"

গোপাল দাঁড়াইয়া কহিল, "কাল আমি অবশ্যই আনব।"

পাঠশালার ছুটি হইলে গোপাল বাটী যাইবার সময় ভুবন নামে আর একটি বালককে বলিল, "ভুবন, আমাকে যদি একটা পয়সা ধার দাও, তা হলে আমি বাঁচি, তা নইলে কাল আর আমার পিঠের চামড়া থাকবে না।"

ভুবন কহিল, "তোমার মায়ের কাছ থেকে এনে দাও না কেন?"

গোপাল। মায়ের কাছে পয়সা নেই, থাকলে কি আমি তোমার কাছে ধার চাই?

ভুবন। তবে তোমার জলখাবার পয়সা থেকে দাও না কেন?

গোপাল। আমি জলখাবার পয়সা পাই নে। তা যদি পেতাম, তা হলে আমি তোমার কাছে ধার চাইতাম না।

ভুবন। তুমি জলখাবার পয়সা পাও না, তবে জল খাও কি? আজ বাড়ী গিয়ে কি খাবে?

গোপাল। তা তো আমি বলতে পারি নে। যদি কিছু থাকে, তবে মা দেবে। যদি না থাকে, তবে খাব না।

ভুবন। তুমি বাড়ী গিয়ে খাবার চাও না?

গোপাল। না।

ভুবন। কেন?

গোপাল। যদি চাই, আর যদি ঘরে না থাকে, তবে মা বড় কাঁদে। মার কান্না দেখলে আমি থাকতে পারি না। আমারও বড় কান্না পায়। এইজন্য আমি কিছু চাই নে। একদিন আমি আর বিপিন একত্তর বাড়ী গেলাম, বিপিন খাবার খেতে লাগল, মা আমাকে কিছু দিতে পারলেন না বলে কত কানতে লাগলেন। সে অবধি আমি আর একত্তর বাড়ী যাই নে। যখন বুঝি, বিপিন বাড়ী গিয়া খাবার-টাবার খেয়ে খেলা করছে, আমি তখন বাড়ী গিয়াই বিপিনের সঙ্গে খেলা করি। যদি ঘরে কিছু থাকে, মা ডেকে দেন। যদি না থাকে, তা হলে আর কিছু খেতে পাইনে।—এই কথা বলিতে বলিতে গোপালের চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

গোপালের অশ্রুপাত দর্শন করিয়া ভুবনের সরল চিত্ত দ্রব হইয়া গেল। ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, "বিপিন যাহা খেতে পায়, তার কিছু তোমাকে দেয় না?"

গোপাল কহিল, "বিপিনের দেবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু জেঠাই-মা দিতে দেন না। বিপিনকে খাবার দিলে তিনি নিজে সুমুখে বসে থাকেন, পাছে বিপিন আমাকে দেয়।"

ভুবন। চল, তুমি আমাদের বাড়ী চল। আমার যে খাবার আছে দু-জনে ভাগ করে খাব এখন; আর তোমাকে মার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে দেব।"

গোপাল। তোমার মার কাছে চাইলে দেবে না; তুমি যদি দাও তবে চল যাই।

ভুবন। আচ্ছা চল যাই, আমিই দেব এখন।

উভয়ে অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বাটী গেল। বাটী গিয়া গোপাল বাহিরে বসিল। ভুবন মায়ের কাছে গিয়া গোপালের কাছে যাহা শুনিয়াছিল, আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল। তিনি শুনিয়া গোপালকে ডাকিয়া আনিতে কহিলেন। ভুবন মাতার আজ্ঞা পাইবামাত্র দৌড়িয়া দ্বারে আসিয়া গোপালকে লইয়া গেল।

ভুবনের মাতা গোপালের ম্লান মুখ ও ছলছল নেত্র দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। দুটি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, তোমরা দু-জনে একত্তর হয়ে পাঠশালা থেকে এলে, তা তুমি বাইরে বসেছিলে কেন?"

গোপাল কিছু উত্তর করিল না।

তখন ভুবনের মাতা উভয়কে খাবার দিলেন; এবং দুটি ছোট ছোট গেলাসে জল দিলেন। গোপাল ও ভুবন খাবার খাইয়া জল খাইতেছে। গোপাল এক গেলাস জল খাইয়া শূন্য গেলাসটি হাতে ধরিয়া কহিল, "আমাকে আর একটু জল দিন।"

ভুবনের মাতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কার কাছে জল চাচ্ছ।"

গোপাল একটু লজ্জিত হইয়া হেঁটমুখে কহিল, "আপনার কাছে।" ভুবনের মাতা কহিলেন, "আমি কে, তা না বল্লে জল দেব না।" গোপাল আরও লজ্জিত হইল এবং আরক্তিম মুখ হেঁট করিয়া রহিল। ভুবনের মা পূর্বের মতন অল্প হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমাকে যদি বল, 'মা, একটু জল দাও,' তা হলে দেব, নইলে দেব না।"

গোপাল গাঢ়স্বরে কহিল, "মা, একটু জল দাও।"

ভুবনের মা গোপালকে অবিলম্বে কোলে লইলেন এবং শিরশ্চুম্বন করিয়া আর এক গেলাস জল দিলেন।

গোপাল ক্ষণকাল চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না। ভুবনের মায়ের স্কন্ধে নিজমস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। ভুবনের মাতার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল গোপালের বাহুমূলে পড়িতে লাগিল।

গদাধর, তোমারও মা আছে! প্রমদা, তোমারও সন্তান আছে!

অনেকক্ষণ কোলে রাখিয়া ভুবনের মাতা গোপালকে নামাইয়া দিয়া পূর্ববৎ গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, "গোপাল, আগে বল যে, তুমি পাঠশালা থেকে বাড়ী যাইবার সময় রোজ এখানে আসবে, তা নইলে তোমাকে যেতে দেব না।"

গোপাল কহিল, "আমি রোজই আসব।"

ভুবনের মাতা তখন গোপালের হাতে একটি টাকা দিয়া কহিলেন, "যাও, এখন দু-জনে গিয়ে খেলা কর। বাড়ী যাবার সময় আমাকে না বলে যেও না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল যাত্রার দলে

নীলকমল কালীঘাটে বাবুর বাড়ী খায়দায় থাকে, কাজকর্ম করে। বাবু একটি ভাল বেহালা খরিদ করিয়া দিয়াছেন। সকলে কুঠি কাছারি চলিয়া গেলে সেইটি বাজায়। তাহাকে দেখিয়া যদি কেহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিত, "এটি কে," বাবুর উত্তর করিবার অগ্রে নীলকমল কহিত, "আমি একজন কালওয়াৎ; বাবুকে গান-বাজনা শোনাই, আর বাবুর বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকি।" বস্তুতঃ নীলকমলের দ্বারা বাবুর একটি চাকরের কাজ চলিত। এজন্য বাবু নীলকমলের কথায় একটু হাসিয়া ক্ষান্ত হইতেন, আর কিছু বলিতেন না।

রাস্তা দিয়া ফিরিওয়ালারা যখন হাঁকিয়া যাইত, নীলকমল তখনই তাহাদিগকে ডাকিত। নিকটে আসলে নীলকমল জিজ্ঞাসা করিত, "আজ কোন জায়গায় কারুর যাত্রা হবে বলতে পার?" যে ফিরিওয়ালা একবার নীলকমলের ডাকে আসিয়াছে, সে আর দ্বিতীয়বার আসিত না। নীলকমলও আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিত না। তার বিশ্বাস ছিল, ফিরিওয়ালারা সকল বাটীতে যায়, সুতরাং সব জায়গার খবর জানে।

ক্রমে এক মাস দু-মাস যায়, নীলকমল আর যাত্রার খবর পায় না। নীলকমলের রাত্রে ঘুম হয় না। দিনে দু-দণ্ড স্থির হইয়া এক স্থানে বসে না। কিন্তু কোনখানে গিয়া অনুসন্ধান করিতেও ভরসা হয় না। ঘরের বাহিরে গেলেই হারাইয়া যাইবে, এই চিন্তা নিয়তই নীলকমলের অন্তঃকরণে জাগরূক। অথচ কোথায় যাত্রা হইবে, কেমন করিয়া সেখানে যাইবে, তাহার উপায়ও না করিলে নয়।

নীলকমল এক দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তামাক খাইতেছে এবং কোথায় যাত্রা হইবে, এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময় বাবু বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "নীলকমল, নীলকমল!"

নীলকমল অনন্যমনা হইয়া ভাবনা করিতেছিল, সুতরাং বাবুর ডাক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন। নীলকমল ফিরিয়া বাবুকে দেখিতে পাইল; বাবুর পোশাকা ধুতি চাদর ও ছড়ি হাতে দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাবেন? আমারে ডাকছেন নাকি?"

বাবু কহিলেন, "হাঁ। চল, যাত্রা শুনে আস। তুমি নাকি যাত্রা শুনবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছ?"

নীলকমল উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ। আমারে যদি নিয়ে যান, তবে বড়ই ভাল হয়।"

বাবু কহিলেন, "সেইজন্যেই তো তোমাকে ডাকছি। শীঘ্র চল, আবার বাড়ী ফিরে এসে কাছারি যেতে হবে।"

নীলকমলের আর দেরি নাই। অবিলম্বে হুঁকাটি রাখিয়া স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর বাহির হইল। বাবু কালীঘাটের কালীবাড়ীর রাস্তা ধরিলেন। নীলকমল তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল, "যাত্রা হচ্ছে কোথায়?"

বাবু। কালীবাড়ীর কাছে।

নীল। কালীবাড়ীর বড় কাছে?

বাবু। হাঁ।

নীলকমল বাবুর উত্তর শুনিয়া কহিল, "তবে আপনি যান—আমার যাওয়া হবে না।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাওয়া হবে না?"

নীল। যার পাথরের চোখ থাকে, সে যেন কালীবাড়ী দু-বার যায়। আমার মাংসের চোখ, আমি আর সেখানে যাবো না।

বাবু। কেন বল দেখি?

নীলকমল কহিল, "মহাশয়, আমি যখন প্রথম দিন এলাম, তখন এক হাটের লোক ধর্ ধর্ করে পিছুপিছু এসে এক খানার কাছে আমাকে পেড়ে ফেল্লে। কেবল সিন্দুর দেবার জন্যে। আমি আর সেখানে যাই নে। আমার চোখটি যাবার জো হয়েছিল। আর খানিক থাকলেই যেত।"

বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে এস, তোমার ভয় নাই।"

নীল। অমন দাদাঠাকুরও বলেছিলেন, কিন্তু বিপদের সময় তো ঠ্যাকাতে পারলেন না। তখন যে রামা মাঝির মতন হাল ছেড়ে বসে রইলো। হতো যদি আমার দেশ, তাহলে এক বাঁকের বাড়িতে মাথা ভেঙ্গে দিতাম।

বাবু। তোমার দাদাঠাকুরও তো তোমার মতন শহুরে লোক, তা তোমাকে বাঁচাবে কি? তুমি আমার সঙ্গে এস, কোন ভয় নাই।

নীল। দাদাঠাকুর শহুরে লোক মন্দ কি! সে কেষ্টনগরে থাকতেই কত গাড়ী দেখেছিল।

বাবু। গাড়ী দেখলেই শহুরে হলো? এখন তুমি যেতে হয় তো চল। না যাও বল, আ ম যাই।

নীলকমলের যাবার খুব ইচ্ছা, অথচ কালীবাড়ীর কাছে, ভয়ে সহজে স্বীকার

হয় না। ক্ষণকাল এক স্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন ভয় নেই তো, এইবেলা ঠিক করে বল।"

বাবু উত্তর করিলেন, "আর কতবার বলব।"

নীলকমল বাবুর কথায় ভর করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। যাত্রার স্থলে গিয়া নীলকমল একবার ঝাড়লণ্ঠনের দিকে চায়, একবার যাত্রাওয়ালাদের দিকে চায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত লোকজনের দিকে চায়। এবং যা দেখে, তাহারই সম্বন্ধে বাবুকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। বাবু ক্ষণকাল পরে বিরক্ত হইয়া গেলেন। বেলাও বেশী হইতে লাগিল, কাছারি যাইতে হইবে, এজন্য বাবু নীলকমলকে কহিলেন, "চল তবে এখন যাই।"

নীলকমল কহিল, "আমি যেখানে একবার এসেছি, যাত্রা শেষ না হলে আর যাব না।"

বাবু নীলকমলের কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন নীলকমল, পথ চিনতে পারবে তো ?"

নীলকমল উত্তর করিল, "না চিনি, এত লোক আছে, জিজ্ঞাসা করলেও বলে দেবে না ?"

"কি জিজ্ঞাসা করবে বল দেখি ?"

"কেন, বাবুর কথা।"

"কোন্ বাবু ?"

"যে বাবু কাছারি কাজ করে।"

বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তা হলেই তুমি আমার বাড়ী পঁহুছাবে আর কি ?"

নীলকমল কহিল, "কেন ? হাসলে যে ? আর কি কেউ কাছারি কর্ম করে নাকি ? এখানে ক'টা কাছারি। আমাদের গাঁয় তো একটা বৈ নেই।"

বাবু কহিলেন, "তার হিসাব তো এখন দিতে পারি নে। মোদ্দা যদি আমার বাড়ী যেতে চাও, তবে রামেশ্বরবাবুর বাড়ী কোথায়, বলে জিজ্ঞাসা করো।"

নীলকমল 'রামেশ্বরবাবু' 'রামেশ্বরবাবু' মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল। রামেশ্বর-বাবুর নাম মুখস্থ করিয়া নীলকমলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কার যাত্রা হইতেছে, এটি নিশ্চয় করা। নিকটস্থ একজন লোককে দু-বার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া তার গা টিপিল। টিপ্‌টি বড় সহজ টিপ নয়। টিপ খাইয়া সেই লোকটি "উঃ, কে রে" বলিয়া নীলকমলের মুখের দিকে চাহিল।"

নীলকমল তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার যাত্রা হচ্ছে ?" সে কহিল, "তা কি লোকের গা না-টিপে জিজ্ঞাসা করলে হয় না ?

নীলকমল কহিল, "এত চটো কেন ভাই! যদি তোমার ব্যথা লেগে থাকে, তুমি আমাকে নয় একটা টিপ দাও।"

"গোল মৎ করো, গোল মৎ করো" একজন খোট্টা দাঁড়াইয়া কহিল।

নীলকমলের আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। এমন সময় দু-জন লোক গান শুনিয়া উঠিয়া যাইতেছে। নীলকমলের নিকটবর্তী হইয়া একজন অপর জনকে কহিল, "আর গোবিন্দ অধিকারীর সেকাল নাই।" নীলকমল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তখন ভাবিতে লাগিল, "গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে তো আমার আলাপ আছে। একবার চোকাচকি হলে হয়। তা হলেই আমাকে ডাকবে, আর আমি আসরে গিয়ে বসব। এ ব্যাটার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছি বলে চটে গেল, আসরে গিয়ে বসলে ব্যাটা টের পাবে আমি একজন যে-সে নই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া নীলকমল একবার ডানদিকে চেয়ে থাকে, একবার বাঁদিকে বেঁকে চেয়ে থাকে, কিন্তু চোকাচকি আর হয় না। অগ্রে যাইবারও আর জো নাই। নীলকমল একস্থানে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক এদিক, ক্ষণেক ওদিক বেঁকিতেছে, এমন সময় যাত্রা ভাঙিয়া গেল। সকলে বাহিরে যাইতে লাগিল, গোল অনেক চুকিয়া গেল। নীলকমলের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, নীলকমল আসরে গিয়া বসিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আশা মরীচিকা

বিধুভূষণ কিয়ৎকাল কালীঘাটে থাকিয়া তিনিও যাত্রার দলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানে যান, সেইখানেই শুনেন, হয়ত তাদের বাদ্যকরের দরকার নাই, অথবা ভাল বাদ্যকরের বেতন দিবার ক্ষমতা নাই। কালীঘাটে যদিও আহারের ভাবনা নাই বটে, কিন্তু বিধুভূষণের বস্ত্রাদি এরূপ মলিন হইয়া গেল যে, তাঁহার আর কোন স্থানে যাইবার জো রহিল না। তাঁহার পাণ্ডা বন্ধু তাঁহাকে তাহার নিজের ব্যবসা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিল। কিন্তু বিধুভূষণ নূতন লোক, সকল স্থান ভাল করিয়া চেনেন না। অধিকন্তু কালীঘাটে থাকিয়া মিথ্যা কথা বলা ও প্রবঞ্চনা করা অপেক্ষা অধিক পাপ আর নাই, এই সমস্ত ভাবিয়া পাণ্ডার উপদেশ গ্রহণ করিলেন না।

এক দিবস একাকী বসিয়া বিধুভূষণ নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিতেছেন।

"পূর্বেই বা কি ছিলাম, এখনই বা কি হইয়াছি। শরীরে সামর্থ্য মাত্র নাই। যেখা'ন বসিয়া থাকি, সেইখানেই থাকিতে ইচ্ছা করে, মনে উৎসাহের চিহ্নও নাই, বস্ত্রাদি দেখিলে আর ব্রাহ্মণ কেহই কহিবে না, বাড়ীর খবর পাইলাম না, পত্র লিখি তাহারও জবাব পাই না, পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো, সেই বা কোথায় ? আমার অদৃষ্টই বুঝি এমনি যে, যাহার সহিত আমার সংস্পর্শ হইবে, তাহার আর সুখ হইবে না। আহা, সরলার যদি অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে আর কোন সুখ হউক বা না হউক, অনাহারে থাকিতে হইত না।" সরলার কথা মনে হইয়া বিধুভূষণের চক্ষু হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ ও প্রমদার কথা মনে হইয়া তাঁহার চেহারার আর এক প্রকার ভাবান্তর হইল। চক্ষু লাল হইল। মুখভঙ্গি ভীষণাকার হইল, এবং দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল। পুনরায় গদাধরচন্দ্র ও তদীয় জননীর কথা মনে হইয়া মুখে ঈষৎ হাস্য উপস্থিত হইল।

মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। অন্তঃকরণে যখন যে ভাবের উদয় হয়, মুখে অবিলম্বে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হইলে মুখ ম্লান হয়; সুখ উপস্থিত হইলে মুখ প্রফুল্ল হয়। অন্তঃকরণে রাগের কারণ সঞ্চার হইলে চক্ষু আরক্তবর্ণ হয়, ওষ্ঠাধর কাঁপিতে থাকে ও দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হয়। ফলতঃ চিত্ত যখন যে রসে অভিষিক্ত থাকে, মুখমণ্ডলে তখনই তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। সুতরাং মনুষ্যের মুখ জীবদ্দশায় নিয়তই বিকৃতভাবে থাকে। স্বাভাবিক কাহার কেমন মুখ, তাহা মৃত্যুর পরে ব্যতীত জানা যায় না।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বিধুভূষণের মুখে দুঃখ, রাগ ও কৌতুকের চিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার পাণ্ডা-বন্ধু কহিল, "কি হে, পাগল হইবার উদ্যোগ করতেছ নাকি ?"

বিধুভূষণ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সুতরাং পাণ্ডা-বন্ধু নিকটে আসিয়াছে, তাহা টের পান নাই। এজন্য তাহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হাঁ, কি বলছ ?"

পাণ্ডা। এমন কিছু না, পাঁচালি শুনবে ? আমাদের দেশের এক দল পাঁচালিওয়ালা এসেছে। চল, আজ পাঁচালি হবে, শুনে আসি।

বিধুভূষণ সর্বক্ষণই প্রস্তুত। বলিবামাত্রেই তাহার সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া পাণ্ডা কহিল, "তুমি যে বলেছিলে, কোন যাত্রার দলে চাকরি করবে। এই তো উপস্থিত আছে, কর না কেন ?"

বিধুভূষণ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ ? কৈ ?"

পাণ্ডা কহিল, যেখানে আমরা পাঁচালি শুনতে যাচ্ছি, সেইখানেই আছে। আমার সঙ্গে দলের অধিকারীর দেখা হয়েছিল। তার বাড়ী আমার গ্রামে। তাদের যে একজন বাদ্যকর আছে, সে তো একে ভাল বাজাইতে পারে না, আবার তার উপর মদ খায়। নূতন দল, এ সময়ে একজন ভাল লোক না রাখলে নাম হবে না। এইজন্য আমাকে বলেছিল, 'যদি তোমার কোন আলাপী লোক থাকে, সঙ্গে করে নিয়ে এস।' কিন্তু এক বন্দোবস্ত করতে হবে। তারা এখন মাইনে দিতে পারবে না। যা পায়, তার বখরা দিতে প্রস্তুত আছে।"

বিধুভূষণের মন এখন হলেই হয়, বখরাই দিক, আর মাইনেই দিক। এই কথা সাঙ্গ না হইতে হইতে তাহারা পাঁচালির দলে গিয়ে উপস্থিত হইল। আর দুই ঘণ্টা বাদ পাঁচালি আরম্ভ হইবে। পাণ্ডা দলের কর্তাকে কহিল, "এই তোমার লোক এনেছি।"

বিধুভূষণের বেশভূষা দেখিয়া দলের কর্তার কিছু অভক্তি হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বিধুকে কহিল, "আপনি একবার বাজান দেখি ?" এই বলিয়া এক জোড়া তবলা তাঁহার কাছে দিল। বিধুভূষণ বাজাইলেন। পাঁচালিওয়ালা বড় ধূর্ত। মনে মনে পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলে পাছে বেশী দর হইয়া যায়, এজন্য মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "হাঁ, চলতে পারে।" পরে পাণ্ডার দিকে মুখ ফিরাইয়া "বন্দোবস্তের কথা বলেছ ?"

পাণ্ডা কহিল—"হাঁ।"

অধিকারী। তাতেই স্বীকার ?

পাণ্ডা। তাতেই।

অধিকারী। তবে কবে থেকে মিশবেন ?

বিধু। যবে থেকে বলেন।

অধিকারী। তবে আজ।

বিধু। আচ্ছা তাই।

বিধুভূষণের পাঁচালির দলে যাওয়া অবধি যেন দলের অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। অল্প দিবসের মধ্যেই দলের নাম প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং দেশ-বিদেশ হইতে বায়নাপত্র আসিতে লাগিল। "টাকা হইলে লোকের চেহারা ফেরে" সকলেই বলিয়া থাকে, বস্তুত সে কথা যথার্থ, বিধুর এক্ষণে বিলক্ষণ আয় হইল। তাঁহার মলিন বসন দূর হইল, মুখভঙ্গী ভাল হইয়া আসিল, কিন্তু পূর্বের ন্যায় চিন্তাশূন্য আর হইল না। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই ক্রমে ক্রমে প্রাচীন হয়। অধিকাংশই হঠাৎ বিজ্ঞ হইয়া বসে, এমন সর্বদাই দেখা গিয়া থাকে। আজি দিব্য যুবাপুরুষ, অনবরত

আমোদপ্রমোদ করিতেছে, কোন ভাবনাচিন্তা নাই, দুঃখক্লেশ কাহাকে বলে জানে না, দেখিলে বোধ হয় যেন চিরকালই তার এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে; এমন সময়ে তাহার পিতা কিংবা মাতা কিংবা জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাল হইল। আর সে প্রফুল্ল মুখে হাসি নাই, সে ক্রীড়াকৌতুকে আসক্তি নাই? একেবারে সমুদয়ই পরিবর্তন হইয়াছে। এক রাত্রিতে বৃদ্ধ হইয়াছে। বিধুভূষণ পৃথক হইবার দিন অবধিই বিজ্ঞ হইয়াছেন।

টাকা হাতে পাইবামাত্রেই বিধুভূষণ সরলাকে পত্র লিখিলেন এবং কিছু খরচ পাঠাইয়া দিলেন। লেখাপড়ায় তাদৃশ পারদর্শিতা না থাকা প্রযুক্ত একখানা পত্র লিখিতে কত কাগজই নষ্ট করিলেন। একবার অক্ষর মনোমত হইল না, সেখান ফেলিয়া দিলেন। আর একবার কথা ভাল লাগিল না, সেখানও ফেলিয়া দিলেন। একবার খানিক কালি পড়িয়া গেল, সেখানিও নষ্ট হইল। শেষের খানি ভাল হইল। প্রফুল্লচিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। সরলা পাইয়া যে কত আহ্লাদিত হইবে, সেই ভাবিয়া বিধুর আর আহ্লাদের সীমা নাই। চক্ষু হইতে দুটি মুক্তাফল বর্ষণ হইল। বিধু আহ্লাদে অশ্রুপাত না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

চিঠিখানি ডাকঘরে রেজিস্টারি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ঐ ডাকঘরে চিঠির জবাব আসিবে। বিধুভূষণের নিকট ডাকঘর তীর্থস্থান হইয়া উঠিল। রোজই এক একবার যান। "কিন্তু সরলা তো লিখিতে জানে না?" বিধুর ভাবনা হইল, "কে চিঠি লিখিয়া দিবে? গোপাল এত দিন চিঠি লিখিতে শিখিয়াছে, গোপাল লিখিবে।"

প্রত্যহই ভাবিয়া যান, আজ চিঠি আসিবে, কিন্তু আইসে না।

আশা! ধন্য তোমার ছলনা, ধন্য তোমার কুহকিনী শক্তি! তুমি কি না করিতে পার? তোমার ন্যায় আর কে প্রবোধ দিতে পারে? তুমি মুমূর্ষুকে বলবান করিতে পার, অন্ধকে দর্শন করাইতে পার, পঙ্গু দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করাইতে পার, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পার। কিন্তু তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনীও আর কেহ নাই। তোমার রূপ দেখিয়াই লোকে ভুলিয়া যায়। তোমার চরিত্র কেহ অনুসন্ধান করে না। যাহাকে তুমি বারংবার প্রবঞ্চনা করিয়াছ, সেও তোমার মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

বিধুভূষণও ডাকঘরে যাইতে ক্ষান্ত হন না, কিন্তু চিঠিও আইসে না। প্রত্যহই আশা করিয়া যান, প্রত্যহই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। একদিবস পোস্টমাস্টার কহিলেন, "আপনার চিঠি পৌঁছিয়াছে, রসিদ আসিয়াছে।"

বিধুভূষণ আগ্রহ-সহকারে কহিলেন, "কৈ ? কৈ ? দেখি।" পোস্টমাস্টার পুস্তক খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন। লেখা রহিয়াছে, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিধু হর্ষোৎফুল্লনেত্রে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে নামটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে পোস্টমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কাগজখানা আমাকে দিতে পারেন ?"

পোস্টমাস্টার কহিলেন, "এখানা আমার রসিদ। এখানা হস্তান্তর করিবার হুকুম নাই।"

বিধুভূষণ সতৃষ্ণনয়নে আরও ক্ষণকাল নামটি নিরীক্ষণ করিয়া আর্দ্র চক্ষু বস্ত্র দ্বারা মার্জনা করিয়া ডাকঘর হইতে চলিয়া আসিলেন।

বিধুভূষণের মন অদ্য ইতিপূর্বের কয়েক দিবস অপেক্ষা অনেক ভাল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল ও বিধুভূষণের পুনর্মিলন

হুগলি জেলার অন্তর্গত দেবীপুরে বারওয়ারি পূজায় যাত্রা, পাঁচালি, কবি ইত্যাদি বায়না হইয়াছে। বৈকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত পাঁচালি হইয়া গেল। সকলেই পাঁচালি শুনিয়া প্রশংসা করিল। কিন্তু তাহারা গানে যত মোহিত না হইল, বাজনা শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক প্রীতি লাভ করিল।

এ দলে বিধুভূষণ বাদ্যকর।

শেষরাত্রে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই যাত্রা শুনিতে বসিয়াছে। বিধুভূষণের দলের সকলে প্রাতঃকালে গান শুনিতে গেল। বিধুভূষণও সেই সঙ্গে গেলেন। তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন, আর সঙের বাজনা বাজিয়া উঠিল এবং যাত্রার দল হইতে একটি কচি, কৃশকায়, ছিটের ইজের-চাপকান-পরা রাম উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, "বাছা হনুমান—বাছা হনুমান।" দুই চারি বার ডাকিয়া চুপ করিল। পুনরায় "বাছা হনুমান—বাছা হনুমান।" রামটি এমনি কৃশ ও দুর্বল যে, এক এক বার বাছা হনুমান বলিয়া ডাকিতে তাহার আপাদমস্তক পর্যন্ত কম্পিত হইতেছে, গলায় শির উঠিতেছে এবং মুখ কালির বর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তথাপি হনুমানের দয়া হয় না। হনুমান এসেও আসে না। রামের এদিকে চক্ষু ভাজিয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, এঁরা মরে আসরে পড়ে ঘুম

দিচ্ছেন। রাম বেচারার হিংসা হচ্ছে। মরিতে পারিলেই একটু ঘুমাইয়া বাঁচে। কিন্তু হনুমান না এলে তো যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে না। হনুমানও আইসে না। দল হইতে একজন তানপুরা ফেলিয়া দৌড়িয়া হনুমানকে আনিতে গেল।

পাঠকবর্গ, চলুন দেখি সাজঘরে হনুমান কি করিতেছে।

নীলকমল গোবিন্দ অধিকারীর দলে গিয়াছিল, পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু নীলকমলের বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া গোবিন্দ অধিকারী তাহাকে নিজে না রাখিয়া আর এক রামযাত্রার দলে সুপারিশ করিয়া দিয়াছিল। নীলকমল চারি টাকা বেতন পায়, আর তামাক সাজে, মন্দিরে বাজায়, দু-এক বার বা বেহালারও কানমোড়া দেয়। কি করে? বিদেশে চাকরি মেলে না। যা পেয়েছে, তাই করিতেছে। কিন্তু এতদিন তাহাকে কেহ সঙ সাজিতে বলে নাই। আজ আর অন্য লোক নাই, সুতরাং অধিকারী নীলকমলকে হনুমান সাজিতে বলিয়াছে। নীলকমল ইহাতে অত্যন্ত রাগত হইয়াছে। চক্ষু লাল করিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে এমন কোন বন্দোবস্ত ছিল না যে, আমি সঙ সাজব। আর যদি সাজি, তবে রাজা সাজব কিংবা আর কিছু সাজব, আমি হনুমান সাজতে পারব না।"

অধিকারী কহিল, "এতে দোষ কি? যাত্রার দলে সঙ তো সকলেই সেজে থাকে। আর যদি সঙ সাজতেই হয়, তবে হনুমানই বা কি, আর রাজাই বা কি?"

নীলকমল। না, আমি হনুমান হয়ে মুখে চুনকালি দিয়ে কলা খেতে খেতে অত লোকের মধ্যে যেতে পারব না। আমাকে এতে চাই রাখ বা না রাখ।

অধিকারী মহাবিপদে পড়িল। এদিকে "বাছা হনুমান, বাছা হনুমান" করিয়া রামের স্বরভঙ্গ হইবার জো হইয়াছে। এজন্য অধিকারী কহিল, "তোমাকে এখন অবধি ৫৲ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া যাইবে, যদি হনুমান সাজ।"

নীলকমল সম্মত হইল, কিন্তু তথাপি লজ্জায় আসরে আসিতে পারিতেছে না। দু-এক জন লোক গিয়া হনুমানরূপী নীলকমলকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিল।

রাম কহিল, "কি বাছা হনুমান, এতক্ষণে এলে?"

নীলকমল "হাঁ প্রভু এলাম" বলিয়া উত্তর করিবে, এমন সময়ে বিধুভূষণকে দেখিতে পাইল। রাস্তায় সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, নীলকমল তেমনি চমকিয়া উঠিল। নীলকমল ভাবিল যে, বিধুভূষণ সকলই টের পাইয়াছেন, গোবিন্দ অধিকারীর দলে মিশিতে পারে নাই তাহাও জানিতে পারিয়াছেন, এখন যে কি অবস্থায় কি বেতনে আছে সকলই অবগত হইয়াছেন।

নীলকমল এই সমস্ত মুহূর্তমধ্যে ভাবিয়া রামের কথায় আর জবাব না দিয়া,

সভাস্থ লোকের নিকট জোড়হাতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহাশয়, আমাকে জোর করে হনুমান সাজায়েছে।"

হনুমানের কথা শুনিয়া সভাস্থ সমুদয় লোক হাসিয়া উঠিল। নীলকমল পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আপনারা আমার কথায় কি বিশ্বেস করলে না। আমি দিব্বি করে বলতে পারি, আমি হনুমান না, আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর, আমাকে জোর করে হনুমান সাজায়েছে।"

সভাস্থ লোক আরও বেশী হাসিয়া উঠিল। নীলকমল লজ্জিত হইয়া বসিল।

রাম ডাকিলেন, "বাছা হনুমান!"

নীল। কে তোর হনুমান? আমাকে অমন হনুমান হনুমান করলে তোর ভাল হবে না।

রাম। (অধিকারীর পরামর্শে) হনুমান, এ যুদ্ধ-বিপদ হইতে রক্ষা কর।

নীল। ফের তুই হনুমান হনুমান করছিস? তোর যুদ্ধ হলো না হলো, তাতে আমার কি?

অনেক খোশামোদের পর নীলকমল যুদ্ধে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিল। কিন্তু সে সাহায্য নামমাত্র। রাম ধনুক-বাণ যেই ধরিল, আর অমনি পঞ্চত্ব পাইল। একটু পরে গান ভাঙ্গিয়া গেল। নীলকমল মুখোস ফেলিয়া দিয়া অধোবদনে বসিয়া আছে। বিধুভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, কোথা থেকে এখানে জুটলে?"

নীল। আরে যাও ঠাকুর, তোমার কথায় কাজ নাই। ওরাই নয় হেসে উঠল আমাকে চিনতে পারে না। কিন্তু তুমি কেমন করে হাসলে? তুমি তো আমাকে চিনতে, তুমি কেন দুটো কথা বলে দিলে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, আমি তো—তুমি নীলকমল নও ভেবে হাসি নি। তোমার কথায় হাসি এল।"

নীল। আমার কথায় হাসি এল কেন? আমি কি পাগল?

বিধু। আমি তো বলছি না যে, তুমি পাগল।

নীল। আমি আর এ-দলে থাকব না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। আমাদের পাঁচালির দল, সেখানে সঙ সাজা নেই, সেই বেশ হবে! তুমি এখানে কত বেতন পাও?"

নীলকমল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "৬৲ টাকা।" নীলকমল দু-টাকা বেশী করিয়া বলিল। এ রোগ অনেকেরই আছে, খালি নীলকমলের নয়।

বিধুভূষণ এক্ষণে দলের প্রধান হইয়াছেন বলিলে হয়। এজন্য তিনি কহিলেন,

"তবে তোমার কাপড়-চোপড় নিয়ে এস। আর যা পাওনা থাকে, তাও নিয়ে এস। আমরা তোমাকে ৮৲ মাইনে দেব।" এই বলিয়া বিধুভূষণ চলিয়া গেলেন।

নীলকমল মনে করিল, "যদি আর দু-টাকা বেশী করে বলিতাম, তাহা হলেও তো পেতাম। আহা হা! আমি বোকামি করেছি।"

নীলকমল মনস্তাপে বাসায় ফিরিয়া গেল। দলের কর্তার নিকট কহিল. "আমার মাইনে হিসাব করে দাও, আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না।"

দলের কর্তাও নীলকমলের উপর বড় চটিয়া ছিল। সুতরাং মাহিয়ানা হিসাব করিয়া দিতে আর কোন আপত্তি করিল না। নীলকমল মাহিয়ানা ও বেহালাটি লইয়া পাঁচালির দলে আসিল।

নীলকমল পাঁচালির দলে আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, আমি চল্লাম।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কোথায়?"

নীলকমল। যেদিকে পা চলে।

বিধুভূষণ। তার মানে কি নীলকমল?

নীলকমল মুখ আঁধার করিয়া উত্তর করিল, "আর আমার এ জীবনে কাজ কি? দেশে থাকতে পারলাম না। বিদেশে এলাম, এখানেও সুখ হলো না। এখন চল্লাম—যে দেশে আলাপী লোকের মুখ দেখতে না পাই, সেই দেশে যাই।"

বিধু। কেন, কেন, এই তো তুমি বল্লে—আমাদের দলে থাকবে। আমি সকলকে বলে ঠিকঠাক করলাম। এখন আবার এমন কথা বলছ কেন?

নীল। এখানে যদি থাকি, তোমরা আমাকে নিয়ে কত হাসিঠাট্টা করবে; আমার তা বরদাস্ত হবে না। হয়ত আমায় হনুমান ছাড়া আর কিছু বলবেই না। রাস্তায় আসতে কতকগুলা ছেলে আমার পাছে লেগে গেল। সত্ মিস্ত্রী যেমন বলত—"কাগের পাছে ফিঙে লাগে," তেমনি সকলেই আমাকে হনুমান হনুমান বলে ডাকে। আমি তো আসছিলাম তোমাদের দলে থাকবার জন্য, কিন্তু এমন করলে তো আর থাকা হবে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, এখানে তোমাকে হনুমান বলে কেউ ডাকবে না।" এই কথা বলিবার সময় বিধুভূষণের মুখে একটু ঈষৎ হাসি দেখা দিল।

নীলকমল তাহাতেই রাগত হইয়া কহিল, "ঐ, ঠাকুর তুমিই বলছ, তার আর অন্যে কি ছাড়বে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কৈ, আমি তো তোমাকে তা বলে ডাকি নাই।"

নীলকমল কহিল, "তবে দিব্বি করে বলো, আর ও-কথা মুখে আনবে না।"

বিধুভূষণ। আচ্ছা, দিব্বি করেই বল্লাম। এখন হলো তো।

নীল। হলো বটে, কিন্তু তুমি যেন না বল্লে, আর সকলে ছাড়বে কেন? তারা তো "বেঁধে মারে সয় বড়" তা তো বুঝবে না। আমার যে কত দুঃখ হয়, তারা তো টের পাবে না। দাদাঠাকুর, আমি যদি এ জানতাম, তা হলে কি আমি কখন রামযাত্রার দলে যেতাম?

বিধুভূষণ কহিলেন, আচ্ছা, তুমি এইখানে বসো, আমি গিয়া সকলকে প্রতিজ্ঞা ক'রয়ে আসি, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।" বিধুভূষণ এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। নীলকমল বিধুভূষণের কথায় অনেক আশ্বাসিত হইয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লচিত্ত হইল। এবং ঘুন্ ঘুন্ করিয়া "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে, পদ্মবনে আমি যাব" ইত্যাদি গাইতে লাগিল।

নীলকমল তিন চারি ফেরতা "পদ্মআঁখি" গাইল। এমন সময় বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন।

নীলকমল ঘুন্ ঘুন্ ছাড়িয়া ইসারার দ্বারায় জিজ্ঞাসা করিল, খবর কি?

বিধুভূষণ অনেক দিবসের পর পদ্মআঁখির গান শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নীলকমলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিধুর হাসি দেখিয়া নীলকমলের চেহারা গরম হইল। বিধু কহিলেন, "নীলকমল, এবার আমার দোষ নাই, তুমি যদি নিজেই হনুমান স্বীকার কর, তবে আর লোকের অপরাধ কি?"

নীলকমল কহিল, "কৈ আমি স্বীকার করলাম?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "ঐ গানই তো সকল দোষের মূল। ও গানটার মানে জান?"

নীলকমল কহিল, "আমি জানি না-জানি তোমার কি, তোমার কাছে যখন জিজ্ঞাসা করব, তখন বলে দিও।"

বিধুভূষণ কহিলেন, 'নীলকমল, রাগ করো না। রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করবার জন্য দুর্গোৎসব করেন, তখন নীলপদ্ম কে আনবে, এই কথা ওঠায় হনুমান স্বীকার হলো, তাই ঐ গানটা হয়েছে। 'পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাবো, আনিয়া নীল পদ্ম সে নীল পদ্ম চরণপদ্মে দিব'।"

নীলকমল বিস্মিত হইয়া কহিল, "বটে!"

বিধুভূষণ কহিলেন, "আমি তো ঠিক করে এলাম, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে দি, তুমি আর কখন পদ্মআঁখির গান গেও না। ওটা শুনলেই লোকের মনে হবে।"

নীলকমল কহিল, "আচ্ছা, আজ অবধি ত্যাগ করলাম।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"শ্যামা কার কি করেছে ?"

বিধুভূষণের বাটী হইতে যাত্রা করিয়া বিদেশে গমন অবধি চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

যতই দিন যায়, সরলা ততই উৎকণ্ঠিতা হন। এক মাস, দু-মাস, তিন মাস, এই প্রকারে চারি বৎসর অতিবাহিত হইল, তথাপি বিধুভূষণের কোন পত্রাদ পান না। সরলা এমন দেবতা নাই যাঁহার উপাসনা করেন নাই, এমন উচ্চ স্থান নাই যেখানে মাথা খোঁড়েন নাই। ভাবনায় সরলার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। সরলা এক স্থানে বসিলে আর উঠেন না, কেহ পূর্বে কথা না কহিলে কাহারও সহিত কথা কন না। তাঁহার অন্নে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। শীতকালে শরীরের ঘর্মে শয্যা ভিজিয়া যায়। তাঁহার শরীর যতই শীর্ণ হইতে লাগিল, মুখের শ্রী ততই বাড়িতে লাগিল। বৈকাল হইলে চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় ও মুখ আরও টল্‌টলে দেখায়, সরলার শরীরে যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে।

এত কাল পর্যন্ত শ্যামার যে টাকা ছিল, তাহাতেই এক রকমে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে বল ফুরাইয়া আসিল। সরলার ভাবনারও বৃদ্ধি হইল। পতি বিদেশে, তাঁহার কোন খবর নাই, ঘরে অন্ন নাই। সরলার পীড়াও বৃদ্ধি হইতে লাগল। এমন ক্ষীণ হইলেন যে, বসিলে আর সহজে উঠিতে পারেন না। শ্যামা তখন উভয়ের মাতা স্বরূপ হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপাল ও সরলা উভয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া পাড়ায় বাহির হয়। কোন বাড়ীতে কাজকর্ম করিয়া দিয়া আপনার আহারের জন্যে যাহা পায়, আনিয়া গোপালকে ও সরলাকে খাওয়ায়; পরে নিজে আর এক বাড়ী হইতে খাইয়া আইসে। ঘরে আর এমন জিনিসপত্র কিছুই নাই যে, বিক্রয় করিলে দু-দিন চলিতে পারে। শ্যামা এক্ষণে পরিবারের জীবনস্বরূপ।

শশিভূষণ সপরিবারে এক্ষণে নূতন বাটীতে গিয়াছেন। গোপাল কোন স্থানে গেলে সরলাকে একাকিনী বাটীর মধ্যে থাকিতে হইত। প্রথম প্রথম একাকিনী থাকিতে সরলা কোন ভয় পাইতেন না, কিন্তু যত কৃশ হইতে লাগিলেন, সরলার ততই ভয় হইতে লাগিল। কে যেন কোথা হইতে আইসে, সরলা টের পান; কিন্তু আর কেহ টের পান না। শয্যায় শুইয়া মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠেন। গোপালের এক্ষণে জ্ঞানবুদ্ধি হইয়াছে। দুঃখে পড়িলে অল্পবয়সেই বুদ্ধি পরিপক্ক হয়। গোপাল চুপ করিয়া সরলার শিয়রে বসিয়া থাকে।

সরলা চমকিয়া উঠিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা! অমন করিলে কেন?"

সরলা কহিলেন, "না বাবা, কিছু না। গোপাল, বাবা, তুমি এইখানেই বসে আছ?"

গোপাল। হাঁ মা; তোমাকে একা রেখে কোথায় যাব?

সরলা। কতক্ষণ বসে আছ? আজ খেলা করতে গেলে না?

গোপাল। এখন তো মা আমি খেলা করতে যাই না।

সরলা ক্ষণেক ক্ষণেক পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। গোপালের সঙ্গে শেষ কথোপকথনের পর আবার ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া একবার জাগিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি দেখছ?"

সরলা। না বাবা, কিছু দেখছি না। তুমি এইখানেই বসে আছ?

গোপাল। হাঁ মা, আমি তো তোমার বিছানা ছেড়ে কোনখানে যাই নাই।

সরলা। হাঁ হাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। গোপাল, বাবা আজ কিছু খেলে না?

গোপাল। দিদি পাড়া থেকে ফিরে এলেই খাব।

সরলা। শ্যামা এখনও ফিরে আসে নি? আহা, বাছা আমার কি ক্লেশই পাচ্ছে? সকালবেলা যায় আর দুপুরবেলা আসে; আবার খেয়ে বেরোয় আর সন্ধ্যেকালে আসে। গোপাল, তুমি আমার কাছে একটা দিব্বি কর দেখি?

গোপাল। কি দিব্বি করব মা?

সরলা। দিব্বি কর যে, আমি মলে তুমি শ্যামাকে কখনও অভক্তি করবে না। তুমি আমারে যেমন ভক্তি কর, অমনি চিরকাল শ্যামাকে করবে?

গোপাল। মা, এর জন্যে দিব্বি করতে হবে কেন? আমি কি জানি নে যে, তুমি আমার যেমন মা, শ্যামাও তেমনি।

সরলার চক্ষে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সরলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। গোপাল নিজের বস্ত্র দ্বারা সরলার চক্ষের জল মুছিয়া দিল।

সরলা এক মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, "গোপাল, বাবা, বালিশ কটা উপরে রাখ দেখি, আমি একবার বসি।"

গোপাল আস্তে আস্তে বিছানায় বালিশগুলি উপর্য্যুপরি রাখিল। সরলা বিছানায় বাহুর ভর দিয়া উঠিয়া বালিশ ঠেস দিয়া বসিলেন। এই পরিশ্রমে চারি পাঁচ বার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল। শ্রান্তি দূর হইলে সরলা কহিলেন, "বাবা গোপাল, একবার

এসে আমার কোলে বসো দেখি। এখনও শক্তি আছে—একবার কোলে করে নিই, আর দিনকতক পরে তাও পারব না।"

গোপাল সরলার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। গোপালের কথা কহিবার জো নাই। তাহার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতেছে।

সরলা বুঝিতে পারিয়া গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া আপনার বামদিকে বসাইলেন। গোপাল সরলার বক্ষোপরি শির স্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

সরলা হস্ত দ্বারা গোপালের মুখ ফিরাইয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, হাসিয়া কহিলেন, "ভয় কি গোপাল, আমি কি তোমাকে ফেলে কোনখানে যেতে পারি? আমি শীঘ্রই ভাল হব।"

গোপাল পূর্বাপেক্ষা গুরুতর বেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সরলা দুই হাত দিয়া গোপালের মস্তক ধারণ করিয়া সস্নেহে বারংবার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

একটু পরে শ্যামা আসিল। বহুকাল পরে সরলার মুখে হাসি দেখিয়া শ্যামার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্যামা বিছানার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ী-মা, আজ একটু ভাল আছ না? রোজ যদি এমন করে একটু একটু গোপালকে কোলে নাও, আর গোপালের সঙ্গে কথা কও, তা হলে পনের দিনের মধ্যেই আবার তুমি যেমন মানুষ, তেমনি হতে পার।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, আজ আমি ভাল আছি। তোমার মত মেয়ে আর গোপালের মত ছেলে কাছে থাকলে যে হতভাগিনী ভাল না থাকে, সে স্বর্গেও ভাল থাকবে না।"

শ্যামার চক্ষে জল টলটল করিতেছে। ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "আবার শ্যামার মতন মেয়ে, শ্যামার মতন মেয়ে করতে লাগলে কেন? শ্যামা কার কি করেছে?"

সরলা সজল নেত্রে হাসিয়া কহিলেন, "আমার আপনার মা যা না করেছে, শ্যামা তার বেশী করেছে। এর চাইতে পৃথিবীতে কি আর কারু বেশী করতে পারে?"

শ্যামা সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামা নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। সমাজের খবরের কাগজের মত একটা ভাল কাজ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে পারে না। শ্যামার দান কেহ দেখিতেও পায় না, জানিতেও পারে না। কোন কাগজেও ছাপা হয় না,

কোন সভাতেও সে বিষয়ে বক্তৃতা হয় না। কাগজে ছাপান সৎকর্ম সেই কাগজের সঙ্গেই মৃত্তিকাসাৎ হইবে। শ্যামা, তোমার কীর্তি সেই অক্ষয় পুরুষ অক্ষয় কাগজে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিতেছেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের নূতন বাড়ী

শশিভূষণের নূতন বাটীতে গদাধরচন্দ্রের এক ভিন্ন বৈঠকখানা। সুন্দর একটি ছোট ঘর। ঘরের মেঝে জুড়ে একখানি শতরঞ্চি পাতা। শতরঞ্চির উপর তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র একখানি গালিচা পাতা, গালিচাখানি জুড়ে তাহার উপর একখানি জাজিম পাতা। জাজিমের উপর একটি তাকিয়া, তাহার সম্মুখে দুইটা রূপা-বাঁধা হুঁকা বৈঠকের উপর বসান। তাকিয়ার পশ্চাদ্ভাগে একটি আলনার উপর তিন-চারখানি কোকিল-পেড়ে সিমলাই ধুতি কোঁচান, একখানি চাদর ও দুটি পিরান। আলনার নিম্ন থাকের উপর দু-জোড়া জুতা ও আলনার ধারে একগাছি বেতের ছড়ি। আলনার অপর ধারে একটি আম্রকাষ্ঠের সিন্দুক।

অদ্য গদাধরচন্দ্র এখনও এখানে বসিয়া কেন? এমন সময়ে গদাধরচন্দ্র তো কখন বাড়ী থাকেন না? সূর্যদেবও অস্ত যাইতে থাকেন, গদাধরচন্দ্রেরও চক্ষু ফুটিতে থাকে। গদাধর একজন নিশাচর বলিলে হয়। কিন্তু আজি গদাধরের মুখ বিরস বিরস বোধ হইতেছে। গদাধর একবার বসিতেছেন, একবার উঠিতেছেন। একভাবে পাঁচ মিনিট থাকিতেছেন না; মাঝে মাঝে জানালা দিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আজি গদাধর কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন না কি? কৈ, কেহই তো আসিতেছে না। গদাধরচন্দ্র "দূর হোক্ গে" বলিয়া উঠিয়া আলনার উপর হইতে একখানি কোঁচান ধুতি পরিলেন, একটা পিরান গায়ে দিলেন। তৎপরে পৈতায় ঝুলান চাবিটি লইয়া সিন্দুকটি খুলিলেন। সিন্দুকটি খুলিয়া গদাধর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটি বোতল বাহির করিয়া লইলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা একটি কাচের গেলাস ধরিলেন। বোতল হইতে একটু আরক গেলাসে ঢালিয়া, তাহাতে খানিক জল মিশাইয়া সেবন করিলেন। পান করিয়াই একবার মুখ বক্র করিলেন। এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন "শালা রামচনা ব্রাণ্ডি ডেবে, টা না ডিয়ে

রোম ডিয়েছে।” কিন্তু রোম বলিয়া যে বোতলটি রাখিলেন, তা নয়। তিন চার বার বোতল হইতে ঢালিলেন, তিন চার বার জল মিশাইলেন, এবং তিন চার বার মুখ বাঁকাইয়া “ডান হাতে” করিয়া প্রথমবারের মতন খাইলেন। যখন দেখিলেন, কিস্তি বেশ বোঝাই হইয়াছে, তখন বোতলটির ছিপি বন্ধ করিয়া আলোকের দিকে উঁচু করিয়া ধরিলেন এবং অতি মৃদুস্বরে “এখনও দশ আনার বেশী আছে” বলিয়া পুনরায় তাহাকে সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। পরে চাদরখানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা কোঁচার অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছড়িগাছটির মস্তক ধরিয়া বাহির হইলেন।

গদাধরচন্দ্রের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইতে গেলে শশিভূষণের বৈঠকখানা দিয়া যাইতে হয়। বড়লোকের বাড়ীর বেড়ালটা পর্যন্ত মুরুব্বি; সুতরাং দুই এক জন উমেদার তাঁহার নিকট দরবার করিতে আসিল। গদাধর তাহাদিগকে দুই এক কথা বলিয়া রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। দুই চারি পদ গমন করিয়াছেন, এমন সময় রমেশ নামক কনস্টেবলের সহিত দেখা হইল। রমেশ গদাধরচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন। গদাধরচন্দ্র রমেশকে দেখিয়া কহিলেন, “রমেশবাবু নাকি? টবু ভাল। আমি মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি ভুলে গেলে।”

রমেশ কহিল, “যেখানে আসব বলেছি, সেখানে কি আর ভুল হয়? আমরা পুলিসের লোক, আমাদের যেমন কথা, তেমনি কাজ।”

উভয়ে অল্পে অল্পে আসিয়া গদাধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। গদাধর পুনরায় সিন্দুকের চাবিটি খুলিয়া বোতলটি বাহির করিলেন এবং খানিক জল ও আরক মিশাইয়া রমেশের হাতে দিলেন।

রমেশ গেলাসটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি?”

গদাধর। রোম।

রমেশ। জল দিয়াছ নাকি?

গদাধর। হাঁ।

রমেশ। তবে ওটা তুমি খেয়ে ফ্যাল। আমি পান্তাভাত খেতে পারি না। আমরা পুলিসের লোক। গরম জিনিস নইলে আমাদের মুখে ভাল লাগে না।

গদাধর সে গেলাসটি সেবন করিলেন। রমেশ নিজের হাতে এক গেলাস ঢালিয়া নির্জলা খাইলেন।

গদাধর বোতলটি আবার সিন্দুকে রাখিয়া দিলেন, রমেশ কহিলেন, “ছুটি দিচ্ছ নাকি?”

গদাধর কহিলেন, "না জানি কি, যডি কেউ আসে। ও ঢাকা ঠাকা ভাল

রমেশ কহিলেন, "তবে আমি আর এক গেলাস একেবারে খাই"। রমেশ কথা কার্যে পরিণত করিলেন। গদাধর বোতল বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টবে এখন কাজের কঠা কও।"

রমেশ কহিলেন, "কাজের কথা যা বলেছি তাই, আমরা পুলিসের লোক, বেশী কথা কই না।"

গদাধর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ডেখ ডেখি ভাই, টোমার কি অন্যায়? আমি সকল করলাম, ঝুকি সমুডায় আমার। টুমি ভাই ফাঁকের ঘরে এসে অটো চাইলে চলবে কেন?"

রমেশ কহিলেন, "আমি আর কত চাইলাম। আজকাল তাদের যে অবস্থা হয়েছে, আমি যদি বলে দি, তা হলে তারাই আমাকে তিন ভাগ দিতে পারে।"

গদাধর। ডেখ ডেখি ভাই, আমার কট কষ্ট। আজ আবার ডাকহরকরা এসেছিল। চিঠিখানা ডিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি যে চিঠি ন্যান, আপনি তার কে হন? আমি বল্লাম, "আমি টার ভাই। ড্যাক ডেকি ভাই, আমি এট মিট্যা কটা কয়ে জাল করে টাকাগুলি করলাম, টুমি টার টিন ভাগ চাও। আমার পক্ষে টা হলে অন্যায় হয়।"

রমেশ। তুমি মিথ্যা কথা বল্লে, জাল করলে সত্যি, কিন্তু তোমাকে শিখালে কে? তুমি তো পত্র পেয়েই তাদের দিতে যাচ্ছিলে। আমি যদি না পরামর্শ দিতাম, তাহলে তোমার তো এক পয়সাও থাকত না।

গদাধর। টুমি টো পরামর্শ ডেও নি, ভিডিই আমাকে পরামর্শ ডিয়েছিলেন। টোমাকে এ যে ডিচ্ছি, এ কেবল আমার বোকামির জন্যে বৈ ট নয়! টোমাকে না বল্লে কি টুমি টের পেটে?

রমেশ। আমাকে না বল্লে এত দিন তোমাকে পুলিসে পাকড়াও করে ফেলত। আমিই তোমাকে বল্লাম যে, রসিদে নিজের নাম সই না করে গোপালের নাম সই করো। তা হলে আর কোন গোল থাকিবে না। কেমন, এ কথা আমি বলি নাই?

গদাধর। টা টুমি বলেছিলে বটে, কিন্টু ডেখ ডেখি, টোমার ডাবিটা অন্যায় কট? এখন ছ-শ টাকার চার-শ টোমাকে ডিলে আমার ঠাকে কি? আবার টার মড্যে ঠেকে ভিডিকে ডিটে হবে।

রমেশ একটু কৃত্রিম বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিল, আমি কিছু চাইনে। যার টাকা সেই পায়, এই আমার ইচ্ছা। চল, আমার কাছে যা আছে আর

তোমার কাছে যা আছে, সমুদয় গোপাল ও গোপালের মার কাছে দিয়ে আসি। আমি ও-টাকা চাইনে, কখন চাইও নি। তোমার ইচ্ছা হয়, সমুদয় নেও। আমি যা জানি, তাই করব এখন।" এই বলিয়া রমেশবাবু উঠিতে উদ্যত হইলেন।

গদাধর একটু হাসিয়া কহিলেন, "রমেশবাবু, চটলে না কি? আমি টো ভাই চটবার কঠা কিছুই বলি নাই। আচ্ছা, যার টাকা, টাকেই ডেওয়া যাবে; এখন টুমি বসো, বোটলটা খালি করা চাই টো?"

রমেশ বসিলেন।

পাঠকবর্গ বোধ হয় টের পাইয়াছেন যে, বিধুভূষণের রেজেস্টারী চিঠিগুলি কোথায় গিয়া পড়িয়াছিল।

বিধুভূষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান না করিয়া আর দেশে প্রত্যাগত হইবেন না। মাঝে মাঝে বাটীর খরচপত্রের জন্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিতেন। চিঠির কোন জবাব পাইতেন না বটে, কিন্তু গোপালের স্বাক্ষরিত রসিদ দেখিয়া মনে করিতেন টাকা সরলার হস্তেই পতিত হইতেছে। গোপাল ছেলেমানুষ, ভাল করিয়া লিখিতে শেখে নাই বলিয়াই তাঁহাকে পত্র লেখে না।

বিধুভূষণের প্রথম চিঠি গদাধরচন্দ্রের হস্তে পতিত হয়। গদাধরচন্দ্র চিঠিখানি খুলিয়া নোট দেখিতে পাইয়া অমনি প্রমদার নিকট গিয়া জানাইলেন। প্রমদা তাঁহাকে রসিদ সই করিয়া চিঠিখানি রাখিতে পরামর্শ দেন। গদাধর নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র রাখিবেন স্থির করিয়া বাহিরে আসিলেন। নোট পাইয়া গদাধরের আর আহ্লাদের সীমা নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরম বন্ধু রমেশবাবু আসিয়াছেন। গদাধর অবিলম্বে রমেশবাবুর নিকট চিঠিখানি দেখাইয়া প্রমদার উপদেশের কথা কহিলেন। রমেশ গোপালের নাম লিখিয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। গদাধর সেই পরামর্শের বশবর্তী হইয়া গোপালের নাম লিখিয়া দিলেন। বিধুভূষণ কখনও গোপালের হস্তাক্ষর দেখেন নাই। তিনি সই দেখিয়া মনে করিলেন, 'এই গোপালের লেখা।'

গদাধরের সহিত রমেশের প্রণয় এই ঘটনা অবধি ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই প্রণয়ের উপর নির্ভর করিয়াই শ্যামার নামে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন। রমেশ যথার্থই পুলিসের লোক। অপর লোক উপস্থিত থাকিলে গদাধরের সহিত এইরূপ কথাবার্তা কহিতেন যে, সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না যে তাঁহাদের সহিত বড় অধিক প্রণয় আছে।

যতবার রেজেস্টারী চিঠি আসিয়াছে, গদাধর হস্তগত করিয়াছেন। গদাধরেরা

পুরাতন বাটী হইতে নূতন বাটীতে আসিলে রমেশ হরকরাকে নূতন বাড়ী দেখাইয়া বলিয়া দেয়, "ঐ বাড়ীতে সরলা থাকেন।" ডাকমুন্সী ও খোঁয়াড়-রক্ষক এক ব্যক্তিই। সে থানায়ই থাকিত, সুতরাং যখন রেজেস্টারী চিঠি আসিত, রমেশ জানিতে পারিত।

এতাবৎ কাল পর্যন্ত গদাধর ও রমেশ সমান ভাগ করিয়া টাকাগুলি লইয়াছেন। কিন্তু শেষ চিঠিতে বিধুভূষণ সত্বরে বাটী আসিবেন লিখিয়া দিয়াছেন। চিঠিখানি সকালবেলা পাইয়া পড়িবার সময় গদাধরের মুখ রক্তহীন হইয়া গেল, এবং হাত কাঁপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হরকরা মনে করিল, কোন বিপদের সংবাদ আসিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "গোপালবাবু, এ কার চিঠি?" হরকরা গদাধরকে গোপালবাবু বলিয়াই জানিত। গদাধর অম্লান বদনে উত্তর করিলেন, "আমার দাদার।"

হরকরা কহিল, "খবর তো ভাল সব?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "ভাল।"

সেই চিঠি অবিলম্বে গদাধর রমেশকে দেখান। রমেশ যখন-তখন বলিতেন, "আমরা পুলিসের লোক।" বস্তুতঃই তিনি যথার্থ পুলিসের লোক। চিঠিখানি দেখিয়া তিনি গদাধরের ভয় আরও দশগুণ বাড়াইয়া দিলেন। তখন বন্ধুতা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমাকে দুই শত টাকা দাও, নচেৎ আমি সমুদয় প্রকাশ করে দেব।"

গদাধর কহিলেন, "টোমাকে ২০০ টাকা ডেবো কেন? টুমি কি এর মেধ্যে নও? টোমারও যে বিপড, আমারও সেই বিপড।"

রমেশ কহিল, "আমি কি টাকা নিয়েছি যে আমার বিপদ?"

গদাধর আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "সে কি রমেশবাবু? টুমি কেমন করে বল্লে যে, টুমি টাকা নাও নাই?"

রমেশ। আমি টাকা নিয়েছি, কে দেখেছে?

গদা। আমি ডেকেছি।

রমেশ। তুমি আসামী, তুমি তো সকলকে জড়াবেই। তোমার কথা কে বিশ্বাস করে?

গদাধর অতল জলে পড়িলেন। ঘোর বিপদ। এখন উপায়? সর্বসমেত ছয় শত টাকা চুরি করিয়াছেন। তার অর্ধেক রমেশ বাবু লইয়াছেন। বাকি অর্ধেকেরও দুই শত চান।

বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া রমেশ এক শত টাকায় নামিলেন।

গদাধর এক শত টাকা দিতে রাজী হইয়া বাটী আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় রমেশকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "সন্ধ্যার পর একবার আমাডের বাড়ী অবশ্য করে যেও।" রমেশ গদাধরকে বাগে পাইয়া নিজে গম্ভীর হইল; কহিল, "যদি অবকাশ পাই, তবে যাব। আমরা পুলিসের লোক, আমাদের কি অল্প কাজ?"

গদাধর বাটী আসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় রমেশের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। রমেশ আসি আসি বলিয়া সন্ধ্যার সময় আসিলেন। গদাধর রমেশকে তুষ্ট করিবার জন্য এক বোতল রম রামধন শুঁড়ীর দোকান হইতে আনাইয়া রাখিয়াছেন। ব্রাণ্ডির কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু রামধনের পাড়াগেঁয়ে দোকান, সর্বদা ভাল বিলাতী জিনিস থাকে না, এজন্য রমই পাঠাইয়া দিয়াছিল।

গদাধর কহিলেন, "রমেশবাবু, বসো, বোটলটা খালি করা চাই টো?"

রমেশ বসিলেন, কিন্তু কহিলেন, "আজ আমার শরীরে কিছু অসুখ হয়েছে, বিশেষ আজ বড় কাজ আছে, আর খেলে কাজ করতে পারব না। এখন কাজের কথা বল, তা না হলে বৃথা বসে থাকা।"

গদাধর পৈতা দিয়া রমেশের দুই হাত জড়াইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "রমেশ বাবু, এ বিপড ঠেকে আমাকে উড্ডার কর। টোমায় এক-শ টাকা ডিটে হলে আর বাঁচি নে। যডি আমার হাটে টাকা ঠাকটো, টা হলে টুমি যা চাইটে আমি টাই ডিটাম, কিণ্টু আমার হাটে একটি পয়সাও নেই।" এই পর্যন্ত বলিয়া গদাধরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় রমেশের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার পা ধরিলেন, এবং শ্রাবণের ধারার ন্যায় নেত্রাসার বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

গদাধরের রোদনে রমেশের হৃদয় কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না। কহিল, "ছি গদাধরবাবু, ও কি? অমন কর তো আমি এখনই সব কথা ভেঙ্গে দেব, চুপ করে বসে কাজের কথা বল, আমরা পুলিসের লোক, কত ব্যাটা আমাদের পায় ধরে থাকে।"

গদাধর পা ধরিয়াই আছেন। রমেশ ছাড়াইতে পারিলেন না। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিয়া পুনরায় কহিলেন, "রমেশবাবু, টোমার কি ডয়া মায়া নাই? আমার ঢন, মান, প্রাণ, সকলই টোমার হাটে। টুমি যডি না রক্ষা কর, টবে আমি আর বাঁচি নে।"

রমেশ। (এবার গদাধরকে ঠাট্টা করিয়া গদাধরের স্বরে কহিল) "টোমার মান, ঢন, প্রাণ, সকলই টোমারই হাটে। টুমি যডি না রাখ, টবে আমার সাট্য কি আমি রাখি।"

গদাধর। রমেশবাবু, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ডিও না।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। গদাধর মনে করিলেন, রমেশের দয়া হইল, পা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টবে কি বল রমেশবাবু?"

রমেশ। নগদ কোম্পানি সিক্কা এক শত টাকা।

গদাধর। টবে আমাকে কেটে ফ্যালো।

রমেশ। আমি কাটব কেন, যারা কাটবার, তারাই কাটবে।

গদাধর দেখিলেন, একশত টাকার কমে কোন মতেই ছাড়ে না। তখন রমেশকে বসিতে বলিয়া নিজে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

রমেশ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বাছাধন ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি। এখন, হয়েছে কি? আগে জেলে যাউন, তখন সুখ পাবেন। ভগিনীপতির টাকায় বাবুয়ানার ফল পাবেন। আর লম্বা কোঁচা, বাঁকা সিঁতি থাকবে না।

অর্ধ ঘণ্টা আন্দাজ বাটীর মধ্যে থাকিয়া গদাধরচন্দ্র ম্লান মুখে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, রমেশ যেখানে ছিলেন সেইখানেই বসিয়া আছেন। গদাধরকে দেখিয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

গদাধর। আর ভাই খবর! আমি টোমাকে বলেছি, আমার হাটে এক পয়সাও নাই। ডিডির কাছ ঠেকে টাকা বের করা কি সহজ কটা?

রমেশ গদাধরের কথা শেষ হইতে-না-হইতে কহিল, "কাজের কথা কি এখন বল। ও-সব কথা রেখে দাও। আমি আর দেরী করতে পারি না। জান তো ভাই, আমরা পুলিসের লোক, কোনখানে দু-দণ্ড থাকবার জো নাই। এক রকম জবাব পেলেই চলে যাই। পরের কাজে মিথ্যা সময় নষ্ট করা কি উচিত?" রমেশের ধর্মশাস্ত্রেও উত্তম জ্ঞান আছে।

গদাধর কহিলেন, "ভাই বিশেষ কেঁডে কেটে বলায় ডিডি ডিটে স্বীকার হয়েছে। প্রঠমে কিছুই ডেবে না, টার পর পঞ্চাশ টাকা। টার পর আমি বলে কয়ে আর মা অনেক কেঁডে কেটে ১০১ টাকা ডিটে স্বীকার করিয়ে এসেছি। টোমার ১০০ টাকা আর ঐ রোমের (গদাধর রমকে রোম বলিতেন) ডাম এক টাকা।"

রমেশ কহিল, "তবে টাকা আনো।"

"আজিই?"

রমেশ। এখুনিই।

গদাধর। টা টো হবে না।

রমেশ। তা না হলে চলে কই। তোমার কাছে বলব ভাই, তার দোষ কি? কারণ, তোমার কথা সাক্ষীর মধ্যে গণ্য নয়। সকালবেলা ঐ চিঠিটে শুনে অবধি আমারও গা কাঁপছে। বলা যায় না, ফৌজদারির হাঙ্গাম, কোথা থেকে

কোথায় যায়। আমার ইচ্ছা করছে, আমিই আগে প্রকাশ করি, তা হলে তো আমি বেঁচে যাব। হয়ত এতক্ষণ বলে ফেলতাম. তা তোমার বিস্তর অনুরোধে বলি নাই। আর কেউ হলে আমি ছেড়ে কথা কইতাম না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাদা কথা। তোমাকে ভাই, এত ভালবাসি বলেই বলি নাই। যদি এ বিপদে আর কেহ পড়ত, তা হলে কি আমি পাঁচ-শ টাকার কম ছাড়তাম? তবে তুমি নিতান্ত আত্মীয় বলেই ১০০ টাকায় সম্মত হয়েছি। যদি নগদ পাই, তবে "পেটে খেলে পিঠে সয়" মনে করে থাকি। কিন্তু নগদ না পেলে ভাই, বড় সুবিধা হবে বোধ হয় না।

রমেশের কথা শুনিয়া গদাধরচন্দ্র পুনরায় ম্লানবদনে বাটীর মধ্যে গেলেন। এবং ঘণ্টাখানেক পরে এক শত টাকা আনিয়া রমেশের হাতে গণিয়া দিলেন। রমেশ টাকা লইয়া থানায় গমন করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধুভূষণের দেশে প্রত্যাগমন—সরলার ঋণ পরিশোধ

ভাদ্রমাস। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। পূর্বের সাত দিবস অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তা কর্দমময়। অধিকন্তু গাড়ীর চাকায় কাটিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল হইয়াছে, সেগুলি জলে পরিপূর্ণ। তাহার দুই পার্শ্বে মৃত্তিকা উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। অসাবধানতাপ্রযুক্ত তথায় পদপ্রক্ষেপ করিলে পিচকারির ন্যায় বেগে পঙ্কিল সলিল উঠিয়া সমুদয় বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। যেখানে রাস্তার ধারে বৃক্ষাদি আছে, সেখানে শুষ্ক পত্র পড়িয়া জলসংযোগে পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতি গৃহ হইতে ধূম উঠিতেছে। গৃহস্থেরা বেলা থাকিতে থাকিতে বাহিরের কর্ম সমাধা করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিতেছে। ঝিঁঝি, মশা ইত্যাদি নানাবিধ কীট-পতঙ্গ উড়িতেছে, ভেককুল আনন্দে রব করিতেছে, ঝিল্লীগণের কর্কশ স্বরে কর্ণে তালা লাগিতেছে। গাভী, ছাগ, মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু একটিও বাহিরে নাই। মনুষ্যের গতায়াত অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছে।

এমন সময়ে দুইটি পথিক কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইতেছে। পথিকদ্বয়ের বাম হস্তে একটি একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ, দক্ষিণ হস্তে একটি একটি কাপড়ের ছাতি; গায়ে পিরান, মস্তকে চাদরের উষ্ণীষ, পদযুগ বিনামাশূন্য। যে অগ্রে যাইতেছে, তাহাকে দেখিলে

বড় শ্রান্ত বোধ হয় না। কিন্তু যে পশ্চাৎ যাইতেছে, তাহার পদপ্রক্ষেপ দর্শন করিলে বোধ হয় যেন তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যাও হইল, পথিকদ্বয়ও এক গ্রামে প্রবেশ করিল। এতক্ষণ তাহারা পরস্পরে কথা কহে নাই, কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী অগ্রগামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, আজ আর চলে কাজ নেই, এই গ্রামেই থাকা যাউক।" এই কথাটি এমন মৃদু স্বরে কহিল যে, কোন তৃতীয় ব্যক্তি শুনিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, পথিক কোন-না-কোন প্রকার ভয় পাইয়াছে। বোধ হয়, কথা শুনিয়া পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বক্তা নীলকমল এবং যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তিনি আমাদের বিধুভূষণ।

প্রথমবার কোন উত্তর না পাইয়া নীলকমল পুনরায় পূর্ব্ববৎ মৃদু স্বরে কহিল, "দাদাঠাকুর, পূজার সময় রাত্রে রাস্তা চলা কিছু না, এস আমরা এক বাড়ী থাকি, কাল রাত থাকতে থাকতে উঠে চলে যাব।"

বিধু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন নীলকমল, এখন ভয় কর কেন? আগে তো তুমি চোরের ভয় করতে না?"

নীলকমল কহিল, আগে কিছু ছিল না, এখন কিছু হয়েছে। কিন্তু যা বল্লাম, সে কথার কি?"

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "এই গ্রামের পরেই হাঁসখালি। হাঁসখালি গেলেই তো বাড়ী গেলাম। এই একটুকুর জন্যে এখানে থেকে কষ্ট পাওয়া কি ভাল? তুমি যে ভয়ের কথা বলছ, এখানে সে ভয়ের কোনই কারণ নাই। এ কৃষ্ণনগরের নিকট, এখানে কি রাস্তার লোক কেউ মেরে নিতে পারে?"

"তবে চল। কিন্তু যদি আমার কথা শোন, তবে এইখানেই থাকা উচিত।"

বিধুভূষণ নীলকমলের কথা না শুনিয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। নীলকমল (অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক) তাঁহার অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া বিধুভূষণ সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "নীলকমল, সেই গাছতলা দেখা যাচ্ছে।" নীলকমল একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "দাদাঠাকুর, সেই এক দিন, আর এই এক দিন।"

পুনর্ব্বার কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া সেই বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলে, বিধু কহিলেন, "নীলকমল, চল—গাছতলায় বসে আর একবার তামাক খাই।"

নীলকমল উত্তর করিল, "দাদাঠাকুর, অত্রার মা যা বলেছিল তাই, তুমি মনের কথা টেনে বলেছ।"

উভয়ে বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন। নীলকমল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল,

"দাদাঠাকুর, তুমি ঠিক যেখানে বসেছ, ঐখানেই বসেছিলে, আর আমিও এইখানে এসে বসেছিলাম। তুমি আমাকে দেখে ডরিয়ে উঠেছিলে।"

বিধুভূষণ চতুর্দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

হায়! আমাদের যে দিনটি যায়, সেটির মতন আর আইসে না। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া কে ক'দিন সুখভোগ করিয়াছেন? কাহার চিত্ত আর নবযৌবনের ন্যায় সৌহার্দ্য বা প্রণয়রসে অভিষিক্ত হইয়াছে? স্বভাবের শোভা দর্শনে কাহার অন্তঃকরণে আর সেরূপ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে? সংসার, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমাতে প্রবেশ করা আর বিস্মৃতিহ্রদে অবগাহন করা, উভয়ই সমান। বিদ্যালয়ে থাকিতে যে সুহৃদকে অবলোকন করিলে ভাবনা-চিন্তা দূর হইয়া যাইত, যাহার মুখে হাসি দেখিলে হৃদয়াকাশে শরচ্চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় প্রভা বিকীর্ণ হইত, যাহার বিরহ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর বোধ হইত, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যাহার চিরসহচর হইব মনে হইত, এখন সে প্রিয় সুহৃদ কোথায়? সকলেই স্বার্থপরতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া অগ্রপশ্চাতে কে আছে দেখিবার অবকাশ নাই।

চারি বৎসর অগ্রে বিধুভূষণের চিত্ত একরূপ ছিল। এখন আর একরূপ হইয়াছে। অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি প্রকৃত সুখের সঙ্গে চিরবিদায় লইয়াছেন। নবযৌবনের সুখের সহিত সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা তুলনা করিলে কাহার হৃদয়ে না শোকানল জ্বলিয়া উঠে? কে দীর্ঘনিশ্বাস না ছাড়িয়া থাকিতে পারে?

নীলকমল চকমকি ঠুকিয়া আগুন বাহির করিল। উভয়ে তামাক খাইয়া বৃক্ষমূল হইতে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

বহুকাল বিদেশে থাকিয়া বাটী আসিবার সময় মনোমধ্যে কত প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কখন কখন আনন্দে হৃদয় উচ্ছলিত হইতে থাকে, কখন কখন ভয়ে শরীরকে কম্পিত করে। যাহাদিগকে বাটী রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাদিগকে সুস্থকায় দেখিতে পাইব ভাবিলে মনে কতই আহ্লাদ হয়, কিন্তু তাহাই যে দেখিতে পাইব তাহারই বা প্রমাণ কি? এরূপ চিন্তায় হৃদয়কে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। বিধুভূষণ পর্যায়ক্রমে ভাল মন্দ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাটীর দ্বারের সমীপবর্তী হইলেন। বাটী হইতে যাইবার সময় দেখিয়া গিয়াছিলেন, বাটীতে লোক ধরে না। তখন শশিভূষণের নূতন বাটী প্রস্তুত হয় নাই। শশিভূষণ, তাঁহার সন্তানাদি, গদাধরচন্দ্র ও তদীয় জননী প্রভৃতি সকলেই এক বাটীতে থাকিতেন। সুতরাং অহর্নিশি বাটীতে গোলমাল থাকিত। বিধুভূষণ

এখন বাটীর নিকটবর্তী হইয়া গোলমালের চিহ্নমাত্রও শুনিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নীলকমলকে কহিলেন, "নীলকমল, তুমি ডাক দেখি একবার, 'বাড়ী কে আছে' বলে?" বিধুভূষণের নিজে উচ্চ কথা কহিবার সামর্থ্য হইল না। নীলকমল উচ্চৈঃস্বরে "বাড়ী কে আছে" বলিয়া দুই তিন বার চিৎকার করিল। কোনই উত্তর নাই। বিধুভূষণ কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "সর্বনাশ হয়েছে।" নীলকমল পুনর্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। এবার শ্যামা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে তোমরা কারা দরজায় ঘা দিচ্ছ?"

নীলকমল। বাহির হইয়া দেখ।

শ্যামা দরজা খুলিয়া দেখিল দুটি লোক। একটি দরজার ধারে বসিয়া, আর একটি দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কারা?"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, তোমরা সব ভাল আছ?"

শ্যামা বিধুভূষণের স্বর জানিতে পারিয়া কম্পিত কলেবরে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "তুমি কোথা থেকে এলে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "শ্যামা স্থির হও। বাটীর সকলে ভাল আছে?"

শ্যামা একটু বিলম্বে কহিল, "প্রাণে প্রাণে। তুমি কোথা থেকে এলে?"

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া "মা দুর্গা" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, "শ্যামা, আমি কোথা থেকে এলাম যে জিজ্ঞাসা করলে—আমার পত্র কি পাও নাই?"

শ্যামা কহিল, "তুমি বাড়ী ছাড়া অবধি পত্র পাওয়া দূরে থাকুক, কোন লোকের মুখেও তোমার খবর পাই নাই। খুড়ী-মা ভেবে ভেবে প্রায় "এখন তখন" এমনি অবস্থা হয়েছে।"

বিধু। আর গোপাল—সে কেমন আছে?

শ্যামা। সে ভাল আছে।

বিধু। তবে চল শ্যামা, বাড়ীর মধ্যে যাই।

শ্যামা কহিল, "এখন বাড়ীর মধ্যে গেলে খুড়ী-মা মূর্ছা যাবেন। তোমরা এইখানেই বস, আমি আগে গিয়া তাঁকে বলি, তারপর তোমাদের নিয়ে যাব।"

বিধু কহিলেন, "শ্যামা, সরলা কি এতই কাহিল হয়েছে যে, আমাদের বাড়ী আসার খবর শুনে মূর্ছা যাবে?"

শ্যামা। বড় কাহিল।

বিধুভূষণ শ্যামার নিকট সরলার অসুস্থতার খবর পাইয়া বড় অধিক কাতর

হইলেন বোধ হইল না। তাঁহাকে এত ভালবাসেন যে, তাঁহার বিরহে কাহিল হইয়াছেন শুনিয়া যেন বিধুভূষণের দুঃখের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুখের উদয় হইল। যেন অন্ধকার রজনীতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ খেলিল। হায়! ভাবিয়া ভাবিয়া সরলার যে যক্ষ্মারোগ হইয়াছে, বিধুভূষণ তা জানিতে পারিলেন না।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে শ্যামা আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিধুভূষণ সরলার গৃহের দ্বার পর্যন্ত প্রায় হাসিতে হাসিতে গমন করিলেন বলিলে হয়। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন। সরলাকে আর চেনা যায় না, এরূপ কৃশা; কিন্তু তথাপি বিধুভূষণের নাম শুনিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। বিধুভূষণকে দেখিয়া সাশ্রুনয়নে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এত দিনের পর কি দুঃখিনীকে মনে পড়েছে?"

বিধুভূষণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "সরলা, এত কাল তোমার নাম জপ করে বেঁচেছিলাম। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখব।"

সরলা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এখন ভাল হব। কিন্তু আজ আর অধিক বসতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে, সর্বাঙ্গ শরীর অবশ হয়ে আসছে।" এই বলিয়া সরলা শয়ন করিলেন। শ্যামা নিকটে বসিয়া সরলার কেশ একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিল।

রজনী প্রভাত হইলে সরলা প্রত্যুষে নিজে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছেন তদ্দর্শনে শ্যামার যার-পর-নাই আহ্লাদ হইল। শ্যামা মনে করিল, ভাবিয়া ভাবিয়া সরলা এরূপ কৃশ হইয়াছিলেন। সরলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "খুড়ী-মা, দেখ দেখি, আমি তো বলেছিলাম, খুড়াঠাকুর বাড়ী এলেই তোমার ব্যামো সব আরাম হয়ে যাবে।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমার অন্নপূর্ণা। তোমার কথা সত্যি হবে না তো কার কথা সত্যি হবে?"

সরলার কথা শুনিয়াই শ্যামা বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। শ্যামার মহৎ দোষ, সে নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। আহা, শ্যামার পরকালে কি উপায় হবে? "পৃথিবীসংশোধনী সভায়" যদি শ্যামা অন্ততঃ যদি দু-দিন যাইতে পারিত, তাহা হইলে শ্যামার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকিত না।

রজনীর প্রথম ভাগে চিন্তায় বিধুভূষণের নিদ্রা হয় নাই। শেষ রাত্রে একটু ঘুম হইয়াছিল। এজন্য বিধুভূষণ সকালে উঠিতে পারেন নাই। শ্যামা পাকশাকের উদ্যোগ করিয়া দিয়াছে, এমন সময় বিধুভূষণ শয্যা হইতে উঠিলেন। সরলা উঠিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া বিধুভূষণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সরলা অত্যন্ত

কাহিল বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে বেড়াইতেছেন এবং এরূপ প্রফুল্লচিত্তে কথাবার্তা কহিতেছেন যে, সকলে দেখিয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইল। সরলা রন্ধন করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শ্যামা কোন মতেই তাঁহাকে রান্নাঘরে যাইতে দিবে না। সরলা বলিলেন, "আমি না রাঁদলে কে রাঁদবে শ্যামা?"

শ্যামা কহিল, "ঠাকুরুণদিদিকে ডেকে আনি।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, ঠাকুরুণদিদি কি আসবেন?"

শ্যামা। "খুড়ী-মা, পয়সা হলে সকলই হয়। আমাদের ভাবনা কি?" বস্তুত শ্যামা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই কার্যে পরিণত হইল। ঠাকুরুণদিদি যেই শুনিলেন যে, বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অমনি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া চলিয়া আসিলেন। সরলাকে দেখিয়া ঠাকুরুণদিদি কহিলেন, "সরলা, তুমি এমন কাহিল হয়েছ, আমাকে এক দিনও বল নাই?"

সরলা একটু হাসিলেন, আর উত্তর করিলেন না।

বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া বাটী আসিয়াছেন, একথা মুহূর্তমধ্যে সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই দেখা করিতে শশব্যস্ত। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, গদাধরচন্দ্র স্বয়ং আসিলেন। আগে যাহারা ঘৃণায় কথা কহিত না, এক্ষণে যেন তাহারা চিরসুহৃদের ন্যায় হইয়া উঠিল। 'রজতে'র কি মহিমা!

লোকের সহিত আলাপ করিতে বিধুভূষণের প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। বাটীর মধ্যে আসিয়া যে সরলার কাছে দু-দণ্ড বসেন, সন্ধ্যার অগ্রে তাঁহার এমন অবকাশ হইল না। সন্ধ্যার সময় সকলে চলিয়া গেলে বিধুভূষণ বাটীর মধ্যে আসিলেন।

সরলা প্রাতঃকালে শরীরে এরূপ বল পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল, তিনি যেন পূর্বের ন্যায় নীরোগ অবস্থাতেই আছেন। বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত সরলা সহাস্যবদনে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাজকর্ম করিলেন। কিন্তু দুই প্রহরের পর হইতে তাঁহার হস্ত-পদ বলশূন্য হইয়া আসিতে লাগিল। কাহাকে কিছু না বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা যে-কোন কার্যেই ব্যাপৃত থাকুক, তাহার এক চক্ষু নিয়তই সরলার উপর থাকিত। সরলা শয়ন করিলে শ্যামা তাঁহার বিছানার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ী-মা আবার শুলে যে?"

সরলা উত্তর করিলেন, "শ্যামা, কাল রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই। ঘুমে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আমাকে জাগাইও না, আমি একটু ঘুমাই।" সরলা এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা আপনার কাজ করিতে গেল।

ক্ষণকাল পরে শ্যামা আবার সরলার বিছানার নিকটে গেল। সরলা এখনও নিদ্রা যাইতেছেন। মুখমণ্ডলে আর কোন চিন্তার লক্ষণ নাই; প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বায়ু শীতল হইয়াছে, তথাপি সরলার ঘর্ম হইতেছে। শ্যামা অঞ্চল দ্বারা আপনার হস্ত পরিষ্কার করিয়া আস্তে-আস্তে সরলার কপাল স্পর্শ করিল। কপাল শীতল। কিন্তু শ্যামার হস্তস্পর্শে সরলা চমকিয়া উঠিলেন। পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় শ্যামা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তথা হইতে চলিয়া আসিল।

শ্যামা বাহিরে আসিয়া ভাবিল, "এখন গ্রীষ্ম কিছু নেই, তবু গা ঘামে কেন?" কিন্তু সরলা বহুকাল শয্যাগত ছিলেন, আজি উঠিয়া বেড়াইয়া কাজকর্ম করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামার কোন ভয় হইল না। পরন্তু মনে করিল, শ্রান্তিপ্রযুক্ত সরলার শরীরে ঘর্ম হইতেছে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, সরলার তথাপি নিদ্রাভঙ্গ হইল না। বিধুভূষণ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সরলাকে নিদ্রিত দেখিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা সেই ঘুম এখনও ভাঙ্গে নাই? শ্যামা কহিল, "না।" শয্যার শিয়রে বসিয়া সরলার কপালে হাত দিলেন। কপাল যেন হিম পাথর। বিধুভূষণ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া "সরলা, সরলা" বলিয়া তিন-চারিবার ডাকিলেন।

সরলা চক্ষু মেলিয়া বিধুভূষণকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন, "কে তুমি?" বিধুভূষণের উত্তর দিবার পূর্বেই পুনর্বার কহিলেন, "না, আমার ভুল হয়েছিল। চিনেছি এখন, তুমি বুঝি আমার গোপালকে নিতে এসেছ? তা পাবে না। আমি যাচ্ছি।"

সরলা প্রলাপ বকিতেছেন।

বিধুভূষণ তিন চারি বার বড় বড় করিয়া সরলার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। সরলা উত্তর করিলেন, "কি? এক-শ বার ডাক কেন? এই যাচ্চি।" এই বলিয়া সরলা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বিধুভূষণ রোদন করিতে করিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামা, সরলা বুঝি ফাঁকি দিলে। তুমি ঘরে যাও, আমি দেখি, যদি একজন ডাক্তার পাই।"

শ্যামা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া ঘরে আসিল। দেখিল, সরলা পূর্ববৎ নিদ্রা যাইতেছেন। "খুড়ী-মা" "খুড়ী-মা" করিয়া ডাকিল, সরলা উত্তর করিলেন না। নিশ্বাস স্বাভাবিক বহিতেছে, মুখভঙ্গী স্বাভাবিক আছে। কিন্তু সরলার শরীর শীতল হইয়াছে। শ্যামা পায়ের কাছে বসিয়া সরলার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

গোপাল অনেক দিনের পর আজি মাতাকে একটু ভাল দেখিয়া ভুবনের সহিত খেলা করিতে গিয়াছে। বিধুভূষণ ডাক্তার ডাকিতে যাইবার সময় ভুবনদের বাড়ী ভুবনের মাতাকে সরলার অবস্থা জানাইয়া গোপালকে সে রাত্রে সেইখানে রাখিতে বলিয়া গেলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে বিধুভূষণ ডাক্তার সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তরবাবু আসিয়াই রোগীকে একটু আরক খাওয়াইয়া দিলেন। পরে বসিয়া শ্যামা ও বিধুভূষণের নিকট সমুদয় বিবরণ অবগত হইলেন। ঘড়ি খুলিয়া সরলার নাড়ীর গতিক দেখিলেন, তৎপরে যন্ত্রদ্বারা সরলার বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ পরীক্ষা করিলেন। তখন বিধুভূষণ চিন্তাকুলচিত্তে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখলেন মশায় ?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "রোগ সাংঘাতিক। বাংলায় ইহাকে যক্ষ্মা বলে। এ রোগ কখনও আরাম হয় না। পুস্তকে লেখে বটে যে, দৈবাৎ আরোগ্য হলেও হতে পারে, কিন্তু আমি এই ৩০ বৎসরের মধ্যে একটিকেও আরাম হতে দেখি নাই। রোগীর চেহারায় বোধ হচ্ছে, চার পাঁচ বৎসর এ রোগের সূত্রপাত হয়েছে। বোধ হয় প্রথমাবধি যত্ন করলে আরও দুই এক বৎসর বাঁচার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে অনুমান মাত্র। এ রোগে কখন মৃত্যু হয়, তার স্থিরতা নাই। এখন যে এত মন্দ দেখা যাচ্ছে, তবুও এমন হতে পারে যে, এখনও পাঁচ ছয় মাস বেঁচে থাকলেও থাকতে পারেন। কিন্তু তা নিতান্ত অসম্ভব। আমার বোধ হচ্ছে, আজ শেষ রাত্রেই এঁর প্রাণত্যাগ হবে। আজ সকালবেলা হতে দুই প্রহর পর্যন্ত ভাল ছিলেন; সে কেবল আপনার আগমনপ্রযুক্ত। তাতেই রোগীর মনে উৎসাহ উৎপাদিত হয়েছিল। কখন কখন সুসমাচার পেলে অন্তঃজলের রোগীও পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করে, চার পাঁচ দিন বেঁচেও থাকে। বোধ হয়, আপনি যদি এমন সময় বাড়ী না আসতেন, তা হলে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতেন। কোন উৎসাহ হলেই কিঞ্চিৎ পরে তাহার বিপরীত ফলোৎপত্তি হয়। রোগীর তাই হয়েছে। বাঁচতেও পারেন, নাও পারেন। কিন্তু আজ বাঁচলেও অধিক দিন জীবিত থাকবেন না।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া বিধুভূষণ ম্রিয়মাণ হইলেন। "হায়, আমিই সরলার মৃত্যুর কারণ" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনি যদি অমন ছেলেমানুষের মতন কাঁদেন, তাহা হলে আপনি এ ঘরে থাকবার যোগ্য নন। এখনও বলা যায় না কি হবে। হয়ত বাঁচতে পারেন। কিন্তু অমন গোলমাল করলে সে সম্ভাবনা তত থাকবে না।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "মহাশয়, আর না, আর কাঁদব না। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, আমি বাড়ী না এলে আর কিছুকাল বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা ছিল—এ কথা শুনে কি আমি না কেঁদে থাকতে পারি?"

ডাক্তার সস্নেহে বিধুভূষণের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "সে অনুমান মাত্র, আমি তো পুর্বেই বলেছি। কিন্তু তা না হলেও গত বিষয় লয়ে কষ্ট পাবার দরকার কি? যে বিষয় আর সংশোধিত হবার জো নাই, তা মনে না করাই ভাল।"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া বসিলেন। ডাক্তারবাবু অনন্যমনা হইয়া সরলার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে সরলার ঠোঁট নড়িল। সরলা অস্পষ্টস্বরে যেন জল জল বলিলেন, শ্যামা জল দিতে গেল। ডাক্তারবাবু শ্যামার হস্ত হইতে গেলাস লইয়া একটি ঝিনুকে একটু জল ও আর একটু আরক একত্র করিয়া সরলাকে খাওয়াইয়া দিলেন। সরলা খাইয়া মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, "বড় ঝাল।"

ক্রমে ক্রমে সরলার চৈতন্য হইল। বিধুভূষণ আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সরলাকে কহিলেন, "সরলা, তোমার আর এক দিনের তরে সুখ হলো না।"

সরলার এক্ষণে উত্তম জ্ঞান হইয়াছে। মৃত্যুর অগ্রে প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। একদৃষ্টে বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা—তুমি চল্লে, আর আমি কাঁদছি কেন জিজ্ঞাসা করছ?"

সরলার প্রেমময়ী মুর্তি অবলোকন করিয়া ডাক্তারবাবু রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

সরলা কহিলেন, "আমি যাচ্ছি সত্য, কিন্তু আমার সুখ হয় নাই কে বল্লে? পতির সেবা ও সন্তান পালন করা আমাদের প্রধান সুখ; তা আমার হয়েছে। যেটুকু দুঃখ ছিল, তা কাল তুমি বাড়ী আসায় দূর হয়েছে। আমার ন্যায় সুখী কজন হয়েছে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা, তুমি আর ও-কথা বলো না, তা হলে আমার বুক ফেটে যাবে।"

সরলা বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "শেষকালে আমার এক অনুরোধ আছে।" এই বলিয়া শ্যামার দিকে চাহিলেন। সরলার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল বহিতে লাগিল। বাক্য নিঃসরণ হইল না; শ্যামা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ডাক্তারবাবু থামাইবেন কি, তাঁহারও আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। অবিশ্রান্ত কেবল রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিধুভূষণের হস্ত সরলার হাতেই আছে। তিনি একটু পরে কহিলেন, "অনুরোধ এই যে, শ্যামাকে কখন দাসী বলে মনে করো না। চিরকাল তোমার যেন জ্ঞান থাকে যে, শ্যামা তোমার আপন মেয়ে।" সরলা আবার চুপ করিলেন।

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা, শ্যামা শুধু আমার মেয়ে নয়। শ্যামা আমার মা। শ্যামা ছিল বলেই আমরা এখনও বেঁচে আছি।" শ্যামা গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু অনেক চেষ্টা করিয়া চক্ষু মুছিয়া ঝিনুকে করিয়া আর একটু ঔষধ সরলার কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন, "এইটু খাউন দেখি ?"

সরলা কহিলেন, "আর কেন ? ঔষধে আর আমার দরকার কি ?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা খাও ! এখনও তোমার পীড়া তত শক্ত হয় নাই।"

সরলা কহিলেন, "আমার নিজের শরীরের ভাব আমি বুঝি। আমি এত দিন মরে যেতেম। কেবল তোমাকে দেখব বলে জীবনটি বেরোয় নাই। একবার আমার গোপালকে ডেকে দাও !"

বিধুভূষণ ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তারবাবু কহিলেন, "এখন আর কি ? যা বলছেন, তাই করো।"

শ্যামা দৌড়িয়া গিয়া গোপালকে কোলে করিয়া আনিল। সরলার নিকট আনিয়া নামাইয়া দিতে গেল। সরলা কহিলেন, "না—না, অমনিই থাক।" তখন গোপালের এক হাত ও শ্যামার এক হাত ধরিয়া কহিলেন, "গোপাল, তুমি, সেদিন যে দিব্বি করেছিলে, তা মনে আছে তো ? শ্যামা তোমার মা, তোমার যথার্থ মা ! দেখো, যেন তোমার দিব্বি মনে থাকে।" পরে শ্যামার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শ্যামা, তুমি আমার বিস্তর করেছ। আমার মা-বাপও এমন করতেন না—আমার গর্ভের মেয়ে এমন করত কি না সন্দেহ। তোমার ধার এ জন্মে তো হলই না, আর কোন জন্মে যে শোধ দিতে পারব, তাহাও অসম্ভব। আমি তোমাকে কি দেব ? আমার সর্বস্বধন গোপাল। শ্যামা, গোপালকে আমি জন্মের মত তোমাকে দিয়ে গেলাম।"

সরলার কথা শুনিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। চক্ষের তারা দেখিতে দেখিতে মস্তকে উঠিল।

সকলে ধরাধরি করিয়া সরলাকে বাহিরে আনিল। মুহূর্তেকে সরলা জন্মের মতন চক্ষু মুদিত করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নানাবিধ

শশিভূষণের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে বাবুর বাটীতে সর্বময় কর্তা হইয়াছেন। তাঁহার উপর বাবুর বিশ্বাস অসীম, তিনিই এখন জমিদার বলিলে হয়। বাবু বেশভূষা ও সুরার খরচ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। শশিভূষণের উচ্চ পদ হইল বটে, কিন্তু সে পদ নিষ্কণ্টক হইল না। পূর্বে যে সমস্ত আমলারা শশিভূষণের উন্নতির জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই কিসে শশিভূষণের অবনতি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবেক দেওয়ানের আমলে তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিতেন না, ইচ্ছাপূর্বক কর্ম বন্ধ করিয়া অলসভাবে থাকিতে পারিতেন না, এ জন্য মনে করিয়াছিলেন, শশিভূষণ যাঁহাদের সমান পদের লোক, তিনি দেওয়ান হইলে তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুরূপ কর্ম করিতে পারিবেন। কিন্তু শশিভূষণ দেওয়ান হইলে তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হইল না। পূর্বেও যেমন দেওয়ানকে ভয় করিয়া চলিতে হইত, এক্ষণেও সেইরূপ করিতে হয়; সুতরাং তাঁহারা সকলে একমত হইয়া কিসে শশিভূষণ কর্মচ্যুত হন, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস মুহুরি, হিসাবনবিস, খাজাঞ্চি, ইত্যাদি আমলাবর্গ একত্র হইয়া কি প্রকারে তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহার বিবেচনা করিতে বসিলেন। অনেকে অনেক প্রকার উপায়ের কথা বলিলেন। কিন্তু কোনটিই সর্ববাদিসম্মত হইল না। পরিশেষে রামসুন্দরবাবু কেরানী কহিলেন, "বাবু তো মদ খেয়ে খেয়ে এক রকম পাগলের মতন হয়েছেন। তাঁর হাতে বিষয়-আশয় রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট। এই মর্মে কর্তা ঠাকুরুণের দ্বারায় কালেক্টর সাহেবের নিকট একখান দরখাস্ত করাতে পারলে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হতে পারে। তা হলে শশীবাবুকে বিদায় হতে হবে।"

রামসুন্দরবাবুর পরামর্শ সকলেই ভাল বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু খাজাঞ্চি কহিলেন, "আমার এক আপত্তি আছে। সকলে যেখানে একত্র হয়েছি, সেখানে মনের কথা খুলে বলাই ভাল। আমার ভয় হচ্ছে, ম্যানেজার হলে এখন যে দু-এক পয়সা পাচ্ছি, তাও পাব না।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই একটু ভাবিত হইলেন। কিন্তু রামসুন্দরবাবু কহিলেন, "সে আপনাদের ভ্রান্তি মাত্র। ম্যানেজার নিযুক্ত হইলে সে বিষয়ে সুবিধা ছাড়া

অসুবিধা হবে না। শশীবাবু যেমন সব বিষয়ে খোঁজ রাখে, ম্যানেজার তা করবে না। কাগজপত্র সাফ সাফাই আর তহবিল দুরস্ত রাখতে পারলেই হলো। বিশেষ এখন যে কাজে পাঁচ টাকা ব্যয় হয়, তখন তাতে পনের টাকা হলেও কেউ কিছু বলবে না। কোম্পানির রেটের বেশী না হলেই হল।”

রামসুন্দর বাবুর কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ করিয়া যে যাহার বাটী চলিয়া গেলেন।

সরলার মৃত্যুর পর দশ দিনের দিন শ্রাদ্ধ হইল। সেটি বন্ধ করিবার জো নাই। বঙ্গদেশের কি চমৎকার প্রথা! জীবিতাবস্থায় যাহার জন্য লোকে এক টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে অনায়াসে দশ টাকা ব্যয় করিতে পারে। যদি শ্রাদ্ধের টাকা দিয়া লোকে চিকিৎসা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক অকালমৃত্যু রহিত হইতে পারিত।

সরলার মৃত্যু অবধি বিধুভূষণের চিত্তে উদাসীনের ন্যায় ভাব হইল। কোনখানে যান না; কোন কাজকর্মে মনোনিবেশ করিতে পারেন না; নিয়তই এক স্থানে বসিয়া ভাবেন ও মাঝে মাঝে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করেন। শ্যামা বিধুভূষণকে একাকী থাকিতে দেয় না। সর্বদাই গোপালকে তাঁহার নিকট বসাইয়া রাখে। গোপাল বাটী না থাকিলে নিজেই তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ গল্প করে। এক দিবস গল্প করিতে করিতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্যামা, তোমরা কি আমার একখানাও চিঠি পাও নাই?”

শ্যামা উত্তর করিল, “না।”

“তবে রেজেস্টারী চিঠিতে গোপালের নামে কে রসিদ দিত?”

শ্যামা কহিল, “গোপালের নামে কখন কোন চিঠি আসেও নি, সে রসিদও দেয় নি। গদাধর রেজেস্টারী চিঠি পেত, সে রসিদ-টসিদ দিত। কিন্তু গোপাল তো কখন দিত না।”

বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “গদাধর কোথা থেকে রেজেস্টারী চিঠি পেত?”

শ্যামা। তার মামা নাকি ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিত।

বিধুভূষণ বসিয়াছিলেন, শ্যামার কথা শুনিয়া অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চাদর লইয়া কহিলেন, “শ্যামা, টের পেয়েছি। সব চিঠিগুলা আর টাকা ঐ গদাই নিয়েছে।” এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহির হইলেন। শ্যামা বুঝিতে পারিল না, কি প্রকারে তাঁহার চিঠি গদাধরের হস্তগত হইবার সম্ভব। এজন্য বিধুকে ফিরাইবার জন্য সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু কোন মতেই ফিরাইতে পারিল না।

বিধুভূষণ দেরি না করিয়া একেবারে ডাকঘরে গেলেন তথায় ডাকমুন্সীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপালের নামে যে রেজেস্টারী চিঠি আসত, তা কার নিকট দেওয়া হত?"

ডাকমুন্সী কহিল, "সেসব চিঠি গোপালবাবুকেই দিয়াছি। তাঁর হাতের রসিদ আছে।"

বিধু। রসিদ আমি চাই না। হরকরাকে বলুন, আমাকে সেই গোপালবাবুকে দেখাইয়া দিক।

বলিবা মাত্র ডাকমুন্সী হরকরাকে বিধুভূষণের সহিত পাঠাইয়া দিল। হরকরা বিধুকে শশিভূষণের বাটী লইয়া গেল। গদাধর যে যথার্থই চিঠি লইয়াছিল, সে, বিষয়ে এখন আর বিধুর সন্দেহ রহিল না। শশিভূষণের বাটীর দ্বারে আসিয়া তিনি গদাধরের রূপ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "কেমন, গোপালবাবুর তো এমনি চেহারা?"

হরকরা উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়! আপনি ঠিক বলেছেন।"

বিধু কহিলেন, "তবে আর চেনাবার দরকার নাই। তুমি ঘরে যাও; আমি বুঝেছি। কিন্তু খবরদার, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়, টাকা গোপাল পায় নাই। অন্য একজন নিয়েছে। প্রকাশ হলে চোর ধরা যাবে না।"

বিধুভূষণের কথা শুনিয়া হরকরার মুখ শুকাইয়া গেল। কম্পিত কলেবরে কহিলী "মশায়, এতে আমার অপরাধ নেই। আমাকে উনি বল্লেন, 'আমি গোপালবাবু,' সুতরাং আমি ওঁকেই চিঠি দিয়েছি। দেখবেন, যেন গরিব না মারা যায়।"

বিধু। তোমার ভয় কি? কিন্তু যদি এ কথা প্রকাশ হয়, আর যদি আসাম পালায়, তা হলে আমি তোমাকেই ধরবো।

হরকরা "আমার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হবে না" এই বলিয়া চিন্তাকুল চিত্তে চলিয়া গেল। বিধুভূষণ থানায় দারোগার কাছে গেলেন।

বিধুভূষণ থানায় গিয়া দারোগার নিকট এ সমস্ত কথা বলিলে দারোগা বাবু কহিলেন, "আজ সন্ধ্যা হয়েছে, এখন গেলে আসামী ধরা যাবে না। কাল সকালে আসবেন। লোকজন নিয়ে যাব, তা হলে অনায়াসে আসামী ধরা পড়বে।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "যদি এ কথা রাত্রের মধ্যে প্রকাশ হয় আর যদি আসামী পালায়, তা হলে কি হবে?"

দারোগাবাবু উত্তর করিলেন, "আমি তার উপায় করছি।" এই বলিয়া রমেশ কনস্টেবলকে কহিলেন, "রমেশ, আজ চারজন কনস্টেবল যেন শশীবাবুর বাড়ীতে রোঁদে থাকে। কাল খানাতল্লাসি করতে হবে। আসামী ঐ বাড়ীতে

আছে, কিন্তু খবরদার, যেন এ কথা প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হলে আসামী পাওয়া যাবে না।”

রমেশ “যে আজ্ঞা” বলিয়া ডায়রিতে চারি জন কনস্টেবলের নাম লিখিয়া শশীবাবুর বাটীতে পাহারায় থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। পরে ভাবিতে লাগিল, “গদাধরকে এ বিষয়ে সংবাদ দেব কি না?” অনেকক্ষণ আন্দোলন করিয়া স্থির করিল, এত চক্ষুলজ্জা থাকিলে পুলিসে চাকরি করা সুকঠিন হইবে।

গদাধর নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। বিধুভূষণ বাটী প্রত্যাগমন করিলে তিন চারি দিবস অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, চার পাঁচ দিবস কোন গোল উপস্থিত হইল না, তখন ভাবিলেন, আর ভয় নাই। বিধুভূষণের সহিত যে তিনি দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার নির্দোষিতা দেখাইবার জন্য।

রাত্রিতে শশিভূষণের বাটী কনস্টেবল পাহারা দিল, কিন্তু তাহা শশিভূষণ কিংবা তাঁহার বাটীর আর কেহ টের পাইল না। পরদিন প্রত্যুষে শশিভূষণ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কাছারি যাইবেন, সম্মুখে একজন কনস্টেবলকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি মনে করে?”

কনস্টেবল কহিল, “আপনি একটু দেরি করে কাছারি যাবেন। আমাদের বাবু এখানে আসছেন। এই বাটীতে আমাদের আসামী আছে।”

শশিভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার বাড়ী কিসের আসামী?”

কনস্টেবল কহিল, “গদাধরবাবু পরের নামের রেজেস্টারী চিঠি নিজের বলে নিয়েছেন, তাই এখন প্রকাশ হয়েছে। আমরা গদাধরকে ধরতে এসেছি।”

শশিভূষণের তখন স্মরণ হইল, গদাধর একখান রেজেস্টারী চিঠি পাইয়াছিল। সে সময় তাঁহার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় নাই। সুতরাং তাহার কোন অনুসন্ধানও করেন নাই। গদাধর বলিয়াছিলেন, চিঠি পৌছিবে না ভয়ে তাহার মামা রেজেস্টারী চিঠি পাঠাইয়াছেন। শশিভূষণ তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কনস্টেবলের মুখে প্রকৃত বিষয় শুনিয়া তিনি রাগত হইয়া গদাধরকে ডাকিলেন। গদাধর নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে তোমার মামার রেজেস্টারী চিঠি পেয়েছিলে, সেই চিঠিখানা আন দেখি।” গদাধর শশিভূষণের রাগত ভাব ও কনস্টেবলকে দেখিয়া দৌড়িয়া খিড়কির দরজার দিকে গেল। অন্তঃপুরে প্রমদার সহিত দেখা হইল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “গদাধরচন্দ্র, দৌড়াচ্ছ কেন?” গদাধর উত্তর না করিয়া একেবার খিড়কির দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রমদা ও প্রমদার মাতা কারণ জানিবার জন্য গদাধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। গদাধর খিড়কির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময় তথায় আর একজন কনস্টেবল

দেখিতে পাইয়া "বাবা রে" বলিয়া বেগে প্রত্যাবর্তন করিল। গদাধরের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গদাধরচন্দ্র?"

গদাধর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিল, "আর গডাধর চণ্ড! গডাধরচণ্ড এই বার মোলো।"

প্রমদা ও প্রমদার মাতা "ষাট্ ষাট্" করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? কি হলো?"

গদাধর কহিল, "সেই রেজেস্টারী চিঠি—"

এমন সময় শশিভূষণ বাটীর মধ্যে আসিয়া রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল সে হতভাগাটা?"

গদাধর ভূতলে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। প্রমদা ও প্রমদার মাতা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, "কেন? এখন কাঁদ কেন? যেমন কর্ম তেমনি ফল। এই বুঝি তোমার মামার রেজেস্টরী চিঠি? তুই আপনিও গেলি, আমার নামেও কলঙ্ক দিয়ে গেলি।"

প্রমদা ও প্রমদার মাতা শশিভূষণের কথায় অত্যন্ত রাগ করিলেন। গদাধর যে দোষ করিয়াছে, সে কিছুই নয়। কিন্তু শশিভূষণের কর্কশ কথা তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত অন্যায় বোধ হইল। প্রমদার মাতা সকরুণ স্বরে প্রমদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি বাছা, আমি বলেছিলাম, 'প্রমদা, আমাদের নিয়ে যাচ্ছ বটে, কিন্তু শেষকালে অপমান হয়ে আসতে হবে।' দেখ দেখি, এখন তা সত্যি হলো কি না?" তুমি বলেছিলে, 'মা, আমার বাড়ী, আমার ঘর, কে তোমাকে অপমান করবে?"

প্রমদা কহিলেন, "আর সে কথায় কাজ কি? অদেষ্ট ছাড়া তো পথ নেই?"

শশিভূষণ কহিলেন, "এখন অদৃষ্টের কথা রেখে দাও। যদি গদাকে বাঁচাতে চাও, তবে ওরে একখানা শাড়ী পরাও, আর কেউ জিজ্ঞাসা করলে তোমার ভগ্নী বলে পরিচয় দিও। আমি সদর দরজায় চললাম, সেখানে দারোগা এসেছে।"

শশিভূষণ বাহির-বাটীতে আসিলে দারোগাবাবু কহিলেন, "আপনার বাটীতে আসামী আছে। হয় বাহির করিয়া দিন, নচেৎ আমরা খানাতল্লাসি করব।"

শশি। মহাশয়, হিসেব করে কথা কবেন। এ ছোটলোকের বাড়ী নয়। আপনারা যে যাবেন, যদি আসামী না পান তখন কি হবে?

দারোগা বিধুভূষণের দিকে চাহিলেন। বিধু কহিলেন, "এই বাড়ীতেই আসামী আছে।"

শশিভূষণ আরক্ত নয়নে বিধুভূষণের দিকে চাহিলেন। বিধুভূষণ কিছু বলিলেন

না। পরে সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই গদাধরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বিধুভূষণ কহিলেন, "একবার রান্নাঘরটা দেখা যাউক।" দারোগা কহিলেন, "হাঁ, উচিত বটে।" এবং শশীবাবুকে কহিলেন, "আমরা এইখানেই দাঁড়াই, পরিবারদিগকে আমার সম্মুখ দিয়া যাইতে বলুন।" শশিভূষণ প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন, কিন্তু দারোগাবাবু কোন মতেই শুনিলেন না। সুতরাং শশীবাবু পরিবারদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন তোমরা এক এক করে বাহির হয়ে যাও।"

প্রথমতঃ প্রমদা, পরে স্ত্রীরূপী গদাধর, সর্বশেষে প্রমদার মাতা বাহির হইলেন। বিধুভূষণ গদাধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। দারোগা শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধ্যে যিনি যাচ্ছেন, তাকে থামতে বলুন। উনি কে?"

শশিভূষণ উত্তর করিবার অগ্রে প্রমদার মাতা কহিলেন, "ও আমার বড় মেয়ে গদাধরচন্দ্র।"

দারোগা শুনিয়াই একজন কনস্টেবলকে কহিলেন, "পাকড়াও।"

গদাধর অমনি "ঐ চরলে ডিডি" বলিয়া দৌড়িয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কনস্টেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া গদাধরকে ধৃত করিল।

গদাধর যথাক্রমে থানা ও মেজেস্টারি পার হইয়া সেসন জজের নিকট হইতে ১৪ বৎসর কারাবাসের আদেশ পাইলেন।

গদাধরের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে বিধুভূষণের মনে কোন শান্তি হইল না। তাঁহার আর ও-বাটীতে থাকিতেও ইচ্ছা রহিল না। তথায় যে সমস্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহাই নিয়ত তাঁহার স্মরণ হইয়া পুনরপি তাঁহাকে সেই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইত। যে কিছু সুখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃখে পড়িয়া একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থও ক্রমে শেষ হইতে লাগিল। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া শ্যামা ও গোপালকে লইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া গোপালকে এক বাটীতে রাখিয়া দিলেন। তথায় রন্ধনাদি করিবে ও ডফ্ সাহেবের স্কুলে পড়িবে। শ্যামাও সেই বাটীতে দাসী হইল। বিধুভূষণ ভাবিলেন,—এখন আমি কি করি? পাঁচালির দলে গেলে টাকা হয় বটে, কিন্তু কর্মটি বড় হেয়। এই প্রকার ভাবিয়া তিনি আর যাত্রার দলে না গিয়া একজন ডেপুটি কলেক্টরের সহিত ঢাকা জেলায় গমন করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল

নীলকমল বিধুভূষণের সহিত একত্র আসিয়া সে রাত্রি বিধুভূষণের বাটীতে ছিল। পরদিবস প্রাতে আর কেহ না উঠিতে উঠিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। রামনগরের নিকটে এক মহকুমা আছে, তথায় গিয়া এক জোড়া ধুতি ও চাদর খরিদ করিল। এবং বাজার অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া সেই ধুতি ও চাদর পরিধান করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। নীলকমলের বহুকালের আশা ফলবতী হইল। নীলকমল দু-এক পা যায়, আর আপনার পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি করে। এইরূপে গমন করিতে করিতে বেলা এক প্রহরের সময় বাটী গিয়া উপস্থিত হইল।

নীলকমলের স্বর শুনিয়াই নীলকমলের মাতা ও দুই ভ্রাতা আসিয়া নীলকমলকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণকমল ও রামকমলের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নীলকমল বাটী হইতে রাগ করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু চারি বৎসরের পর সকলকে পাইয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

নীলকমল বাটী আসিয়া একটি ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ হইল। দশটার মধ্যে তাহার আহার না হইলে নয়। কৃষ্ণকমল ও রামকমল ভয়ে কিছু বলিতে পারে না। চাকুরে ভাই, যাহা করে তাহাই শোভা পায়। আহারান্তে নীলকমল পাড়ায় গিয়া যাত্রা গান ও নানাবিধ গল্প করে। কিন্তু সুখ কখন চিরস্থায়ী নহে। নীলকমলের সুখ দেখিতে দেখিতে অবসান হইল।

এক দিবস নীলকমল গৌরহরি ঘোষের বাটীতে গিয়া বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছে; পল্লীস্থ সকলে একত্র হইয়া শুনিতেছে। ইতিমধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "নীলকমল, তুমি কি সাজতে?"

প্রশ্ন শুনিয়া নীলকমলের চেহারা অপ্রতিভের ন্যায় হইল। তদ্দর্শনে আর একজন ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। নীলকমল এবার একটু রাগত হইল। কিন্তু বাক্য দ্বারা সে রাগ প্রকাশ না করিয়া কহিল, "পাঁচালির আবার সঙ সাজা কি?"

প্রথম প্রশ্নকারী উত্তর করিল, "তুমি তো বরাবর পাঁচালির দলে ছিলে না? আগে যখন যাত্রার দলে ছিলে, তখন কি সাজতে?"

নীলকমল এবার রাগ গোপন করিতে পারিল না। চিৎকার করিয়া কহিল, "তোমাদের সেসব কথায় কাজ কি? যত পাড়াগেঁয়ে ভূত বৈ তো নয়।"

নীলকমলকে রাগত দেখিয়া একজন কৌতুক করিয়া কহিল, "নীলকমল তামাক সাজিত।"

নীলকমল শুনিয়া একটু হাসিল। ভাবিল, উৎপাত কাটিয়া গেল। কিন্তু অবিলম্বেই অন্য একজন কহিল, "নীলকমল হনুমান সাজিত!"

নীলকমল এই কথা শুনিয়া রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোকে বল্লে আমি হনুমান সাজতাম?" এই বলিয়া নীলকমল তথা হইতে উঠিল। কিন্তু তাহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া আর চার পাঁচজন "হনুমান, হনুমান" করিয়া ডাকিতে লাগিল। নীলকমল রাগ করিয়া তাহাদের একজনকে ধরিয়া প্রহার করিতে গেল। অমনি আর সাত আট জন "বাছা হনুমান, বাছা হনুমান" বলিয়া নীলকমলের কর্ণকুহরে মধুসিঞ্চন করিতে লাগিল।

নীলকমল যাহাকে প্রহার করিতে গিয়াছিল, তাহাকে ধরিতে পারিল না। সুতরাং রাগত হইয়া বাটীর দিকে ফিরিল। অমনি দশ বার জন "বাছা হনুমান, বাছা হনুমান" বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নীলকমল যে দিকে যায়, তাহারাও সেই দিকে চলিতে লাগিল। এবং যত যায়, তাহাদিগের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া নীলকমল বাটী আসিল। বালকেরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী আসিল এবং অনবরত নীলকমলের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। নীলকমল এক এক বার রাগিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে নীলকমলের মাতা কহিল, "ওরা বল্লেই বা বাছা হনুমান, তুমি ক্ষ্যাপো কেন।"

নীলকমল কহিল, "ওরা তো পর—বলবেই, তুমি বলতে আরম্ভ করলে? আমার দেশে থাকা হলো না।" এই বলিয়া আপনার বস্ত্রাদি সেই কেম্বিসের ব্যাগটির মধ্যে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইল। নীলকমলের মাতা তাহাকে ফিরাইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিলেন, কিন্তু নীলকমল কোন ক্রমেই তাঁহার কথা শুনিল না।

নীলকমল চলিল, বালকেরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজগ্রামে ছিল, ততক্ষণ সেই গ্রামের বালকেরা তাহাকে ক্ষেপাইতে লাগিল। নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিলে আবার সেই নূতন গ্রামের বালকেরা জুটিল।

কৃষ্ণকমল ও রামকমল বাটী আসিয়া মাতার নিকট বিবরণ জ্ঞাত হইয়া নীলকমলের উদ্দেশে গেল, কিন্তু দেখা পাইল না। পরদিবসও গেল, তথাপি দেখা পাইল না। রামনগর হইতে চারি-পাঁচ ক্রোশ দূরে গিয়া শুনিল যে, একজন "বাছা হনুমান" বললে ক্ষেপে, এমন লোক এসেছিল বটে, কিন্তু সে যে কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গোপাল ও হেমচন্দ্র

কলিকাতার বকুলতলা স্ট্রীটে হেমচন্দ্রের বাসা। দু-তলা বাটী, কিন্তু উপর-তলায় একটিমাত্র ঘর। সে ঘরটি হেমচন্দ্রের শয়নাগার। নীচের তলার রাস্তার ধারের ঘরটি বৈঠকখানা। ঐ বৈঠকখানায় হেমচন্দ্র অধ্যয়নাদি করেন। হেমচন্দ্রের বাসার একটু দক্ষিণে এক বাটীতে গোপাল থাকেন। গোপাল ডফ্ সাহেবের ইস্কুলে পড়েন, ইস্কুলে যাইবার সময় হেমচন্দ্রের বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। হেমচন্দ্র প্রত্যহই গোপালকে দেখিতে পান। গোপাল তাঁহার ঘড়িস্বরূপ। গোপালকে যাইতে দেখিলেই হেমচন্দ্র ইস্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

এক দিবস ইস্কুলের ছুটির পর গোপাল বাটী আসিতেছেন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। গোপালের ছাতি নাই। সেলেটখানির উপর পুস্তকগুলি রাখিয়া উপুড় করিয়া মাথায় দিয়া আসিতেছেন। হেমচন্দ্রের বাটীর নিকট আসিলে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গোপাল দৌড়িয়া আসিয়া হেমচন্দ্রের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

হেমচন্দ্র একটু পূর্বে বাসায় আসিয়াছেন। গোপালকে প্রত্যহ তাঁহার বাসার ধার দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে ইচ্ছা হইয়াছিল, গোপালের সহিত আলাপ করেন। এত দিন সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। আজি গোপালকে দরজায় দেখিয়া হেমচন্দ্র তাঁহাকে বিছানায় আসিয়া বসিতে বলিলেন।

গোপাল কহিলেন, "মহাশয়, আমি যেখানে আছি, সেইখানে থাকি। আমি বিছানায় যাব না।"

হেমচন্দ্র দরজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবেন না? বৃষ্টি এখন শীঘ্র থামছে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

গোপাল হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন এবং মাটিতে পা রাখিয়া তক্তাপোশের ধারে বসিলেন। হেমচন্দ্র কহিলেন, "উপরে এসে বসুন।"

গোপাল নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "না মহাশয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কেন? কতক্ষণ অমন করে বসে থাকবেন?" গোপাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া অবনত মুখে কহিলেন, "আমার জুতো ছেঁড়া, পায়ে কাদা লেগেছে, বিছানার উপর পা দিলে বিছানা নষ্ট হয়ে যাবে।"

হেমচন্দ্র অবিলম্বে চাকরকে পা ধুইবার জল দিতে বলিলেন। গোপাল অত্যন্ত

অনিচ্ছাপূর্বক পা ধুইয়া তক্তাপোশের উপর বসিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহার হাত ধরিয়া তাকিয়ার কাছে লইয়া বসাইলেন। একটু বিলম্বে চাকর জলখাবার আনিল। হেম চাকরের নিকট হইতে রেকাবখানি লইয়া গোপালকে খাইতে কহিলেন।

হেমচন্দ্রের আদর দেখিয়া গোপাল প্রথমতঃ লজ্জিত হইলেন, পরে অবনত মুখে কহিলেন, "আমি কিছু খাব না। আমার এ সময় খাওয়া অভ্যাস নাই।"

হেমচন্দ্র গোপালের হাতে খাবার তুলিয়া দিলেন। গোপাল অত্যন্ত অনিচ্ছা-পূর্বক জল খাইলেন। বৃষ্টি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল। বাটীর সম্মুখের রাস্তা জলমগ্ন হইয়া গেল। লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হইল। তদ্দর্শনে গোপাল কহিলেন, "বৃষ্টি আর এখন শীঘ্র থামবে না। সন্ধ্যাও হলো, আমি এখন যাই।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কি বল্লেন মহাশয়? এই বৃষ্টিতে যাবেন?" গোপাল কহিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে। এখন না গেলেই নয়।" হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনার কি প্রয়োজন?"

গোপাল প্রকৃত না কহিয়া বলিলেন, "কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে, না ছাড়লে অসুখ হবে।"

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি কি এখানে একখান কাপড় পাবেন না?" এই বলিয়া চাকরকে একখানা ধুতি আনিতে কহিলেন।

গোপাল লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "না মহাশয়, আমার কাপড় ছাড়বার তত প্রয়োজন নাই। আমার আরও কিছু প্রয়োজন আছে।"

হেমচন্দ্র গোপালের কাপড়ে হাত দিয়া দেখিলেন, কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন, "কাপড় ছাড়বার প্রয়োজন নাই! এত ভিজলেও যদি ছাড়ার প্রয়োজন না থাকে, তবে আর কখনই প্রয়োজন হয় না।"

গোপাল কহিলেন, "মহাশয়, আমি এখন কাপড় ছাড়ব না। আমি বাসায় যাই।" এই বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

হেমচন্দ্র গোপালের হাত ধরিয়া বসাইলেন; কহিলেন, "এ সময় আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না।"

গোপাল লজ্জাবনত মুখে কাতর স্বরে কহিলেন, "মহাশয়, আপনার সহিত আলাপ করা আমার বহু কাল বাসনা ছিল। আমি পুস্তক কিনিতে পারি না। আপনার নিকট হতে দু-একখানি নিয়ে যাব মনে করতাম, আজ আপনার সহিত দৈবাৎ আলাপ হয়ে আমার বড় আহ্লাদ হয়েছে। আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন আছে; না গেলেই নয়।"

"আপনার আবার বিশেষ প্রয়োজন কি ?"

"আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে না বল্লে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হয়। আমি এক বাসায় পাকশাক করি এবং বেতন-স্বরূপ সেইখানে থাকি আর খাই।" গোপাল এই কথা বলিয়া মাটির দিকে মুখ নামাইয়া বসিলেন।

হেমচন্দ্র গোপালের কাতর স্বর ও কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উপস্থিত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত এত দিন আলাপ করতে ইচ্ছা ছিল, করেন নাই কেন ?"

গোপাল কহিলেন, "আপনারা বড়মানুষ ; কি জানি, যদি আপনি কথা না কন, এই ভয়ে এতদিন আপনার এখানে আসি নাই। আজ বৃষ্টি এলো, কি করি ?"

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "কৈ আমি বড়মানুষ ? আমি তো আপনার চাইতে অধিক বড় না। যদি অধিক হই, তবে এক ইঞ্চি লম্বা হবো।"

গোপাল হাসিয়া কহিলেন, "আমি সে বড়র কথা বলছি না।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "সে যাহা হউক, এখন এই ধুতিখানা পরুন দেখি।

গোপাল কি করেন, ধুতিখানি পরিলেন এবং আপনার খানি হাতে করিয়া লইতে গেলেন। হেমচন্দ্র লইতে দিলেন না। কহিলেন, "কাপড় ও বই এইখানেই থাকুক, কাল ইস্কুলে যাবার সময় নিয়ে যাবেন।" এই বলিয়া একটি ছাতি দিলেন ও চাকরের হাতে আগে আগে একটি লণ্ঠন দিয়া পাঠাইলেন।

গোপাল যে বাটীতে থাকিতেন, সেই বাটীতে কানাই নামে তাঁহার সমবয়স্ক একটি বালক ছিল। তিনি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। গোপালকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "তবু ভাল, গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা পাওয়া গেল। বাবু বুঝি এখন লণ্ঠন নৈলে চলতে পারেন না ?"

গোপাল কহিলেন, "কানাইবাবু, আমার অপরাধ হয়েছে। বৃষ্টিতে আসতে পারি নাই। একটু চুপ করুন, কর্তাবাবু টের পাবেন।"

কানাই। কর্তাবাবু আর আমি কি পৃথক্ ? তিনি তা টের পেয়েছেন।

কানাইয়ের কথা শুনিয়া বাবু টের পাইলেন—গোপাল আসিয়াছে। তখন কহিলেন, "চাকর বামুনের এত বাবুয়ানা কেন ? বৃষ্টি হয়েছে বলে কি খাওয়া-দাওয়া হবে না ? আমি এমন বাবু বামুন চাই নে। কাল অবধি যেন অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা দেখে।"

গোপাল কিছু না বলিয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। গিয়া দেখিলেন শ্যামা সমুদয় উদ্যোগ করিয়া বসিয়া আছে। গোপালকে দেখিয়া কহিল, "আজ কোথায় ছিলে, দেখ দেখি কত বকছে ?" শ্যামার নেত্রযুগল হইতে ধারা বহিতেছে।

গোপাল কহিলেন, “দিদি, যে বাবুটির কথা রোজ বলি, যাঁর বাড়ীতে অনেক বই আছে, আজ তাঁর বাড়ীর কাছে এসে বৃষ্টি হলো, আর আসতে পারলাম না, সেইখানে গিয়া দাঁড়ালাম। বাবু এসে আমাকে ছাড়েন না, ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ালেন, আর এই ধুতিখানা পরতে দিলেন। আসতে দিতে চান না, বিস্তর বলে-কয়ে চলে এলাম। আসবার সময় একজন চাকর দিয়ে লণ্ঠন পাঠায়ে দিলেন। বাবুটি যেমন দেখতে, তেমনি ভদ্র।”

শ্যামা গোপালের কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে কহিল, “তিনি বেঁচে থাকুন—আমার মাথায় যত চুল, এত প্রমাই তাঁর হউক।”

“দিদি, তাঁর নাম কি জানিস ?”

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, “কি নাম ?”

গোপাল উত্তর করিলেন, “আমার তাঁর নাম জানবার জন্যে বড় ইচ্ছা হলো, কিন্তু একে বড়মানুষ, তাতে আমার চাইতে বয়সে বড়, জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না। তার পর একখান বই খুলে দেখলাম, কিন্তু ভাবলাম, যদি আর এক জনের বই হয়। তার পর দুখানা তিনখানা খুলে দেখলাম একই নাম—হেমচন্দ্র। বেশ নামটি, না দিদি ?”

শ্যামা। হাঁ, কিন্তু নামে কি করে ; গুণ থাকলে খারাপ নামও ভাল হয়।

গোপাল। দিদি, তুমি যদি দেখ, তবে টের পাবে তিনি কেমন ভদ্র, আমাকে বলেছেন, আমার যখন যে বই দরকার হবে আমাকে নিয়ে আসতে দেবেন।

শ্যামা। আমাকে একদিন দেখিয়ে দাও দেখি বাবুটি কে ? তাঁদের বাড়ী পরিবার আছে ?

গোপাল। না।

ক্ষণকাল পরে গোপাল রাঁধিতে রাঁধিতে কহিলেন, “দিদি, হাঁড়িতে একটু তেল দাও।”

শ্যামা। আর তেল নাই।

গোপাল। আমার তেল আর নাই ?

শ্যামা। একটুখানি আছে, কিন্তু তা দিলে তুমি পড়বে কিসে ?

গোপাল। আজ আমার একে দেরি হয়েছে। তায় তেল কম হলে আরও কত বকবে। আজ আর আমি পড়ব না।

গোপাল পড়িবার জন্যে শ্যামার বেতন হইতে পয়সা দিয়া তৈল কিনিয়া আনিতেন। প্রায়ই সেই তৈল হইতে মাঝে মাঝে ঘুস দিতে হইত। তাহা না হইলে বাবুর স্ত্রী বলিতেন, “সব চুরি করিল।”

গোপাল রন্ধনাদি করিয়া থালায় থালায় ভাত বাড়িয়া বাবুকে, বাবুর স্ত্রীকে, কানাইবাবুকে ও খোকা খুকীকে দিয়া আসিলেন। পরে শ্যামার জন্যে ভাত বাড়িয়া নিজে আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় কানাইবাবু কি চাহিলেন; গোপাল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আপনাদের কিছু চাই?"

কর্তাবাবু সক্রোধে কহিলেন, "তুমি যে দিন দিন নবাব সেরাজুদ্দৌলা হচ্ছো। ভাত দিয়ে একটু দাঁড়াতে পার না? অমন করলে আমার এখানে চাকরি করা পোষাবে না।"

কানাইবাবুর মুখে আর হাসি ধরে না। গোপাল অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কানাইবাবু কহিলেন, "সেরাজুদ্দৌলা! মাছ আছে আর?"

গোপাল সে দিবস বাবুদিগের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য যা কিছু ভাল জিনিস ছিল, সকলই বাবুদিগকে দিয়াছিলেন, স্থতরাং কানাইবাবুকে কহিলেন, "আর মাছ নাই।"

বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "চার পয়সার মাছ সব ফুরিয়ে গেল?"

গোপাল। সবই আপনাদের দিয়েছি।

কানাইবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, তরকারির জায়গাখান দেখি।"

গোপাল নিজের জন্যে ও শ্যামার জন্যে যাহা পাতে রাখিয়াছিলেন, একত্র করিয়া কানাইবাবুর কাছে লইয়া দেখাইলেন। কানাইবাবু দেখিয়া বলিলেন, "তুমি নীচে রেখে এসেছ।"

গোপাল দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তবে আমি এইখানে থাকি, আপনাদের আহার হলে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখুন।"

কানাইবাবু রাগ করিয়া কহিলেন, "যত বড় মুখ তত বড় কথা?" গোপাল আর উত্তর করিলেন না। বাবুদিগের আহারাদি হইলে নীচে আসিয়া শ্যামাকে কহিলেন, "দিদি, তুমি খাও; আজ আমি খাব না।"

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খাবে না?"

বাবুদিগের কথা শুনিয়া গোপালের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে কথা না বলিয়া কহিলেন, "আজ হেমবাবুদের বাড়ী জল খেয়ে আমার আর ক্ষুধা নাই।"

গোপাল কি জন্যে আহার করিলেন না, শ্যামা বুঝিতে পারিল এবং নিজেও আহার না করিয়া শয়ন করিতে গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্যামার অভিপ্রায় জানা চাই

হেমচন্দ্র গোপালকে বিদায় দিয়া রামকুমার নামক চাকরকে ডাকিলেন। রামকুমার বাটীর বহুকালের চাকর, হেমকে হইতে দেখিয়াছে, তাঁহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাঁহাকে অপত্যনির্বিশেষে স্নেহ করে ও প্রভুর ন্যায় ভক্তি করে। কলিকাতায় রামকুমার হেমের অভিভাবক-স্বরূপ থাকে, চাকর-স্বরূপ নহে। যুবকেরা প্রায়ই "কর্তাদের" আমলের চাকরদিগের উপর বিরক্ত। কারণ, তাহারা প্রভুকে প্রভুর মতন দেখে না ; স্নেহের পাত্র-স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহাদিগের উপর হুকুম চলে না। যখন তাদের ইচ্ছা হয়, তখনি কাজ করে। কিন্তু রামকুমার বৃদ্ধ, তাহার কাজ করিবার সামর্থ্য নাই। কেহই তাহাকে কিছু করিতে কহে না, সুতরাং তাহার উপর কাহারও রাগ হইবার কারণ নাই।

হেমের ডাক শুনিয়া রামকুমার কাছে আসিয়া তক্তাপোশের উপর বসিল। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "রামকুমার, যে ছেলেটি এসেছিল, তাকে দেখেছ ?"

রামকুমার। হাঁ, এই তো দেখলাম।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন দেখলে ?"

রামকুমার উত্তর করিল, "দেখতে তো ভালই দেখলাম। বেশ শিষ্ট, শান্ত ; কিন্তু পেটে কি গুণ আছে, তা আমি কেমন করে জানতে পারব ?"

হেম একটু হাসিয়া কহিলেন, "রামকুমার, তুমি সহজে কারুকে ভাল বলতে চাও না।"

রামকুমার উত্তর করিল, "তোমারও যখন আমার মতন বয়স হবে, তখন তুমিও সহজে কারুকে ভাল বলবে না। কিন্তু আমি তো নিন্দে করি নাই। ছেলেটির নাম কি ?"

হেমবাবু কহিলেন, "নাম তো জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু লেখাপড়ায় বেশ। কেমন মিষ্টি কথাগুলি, কেমন বিনয় !" এই কথা বলিয়া হেম রামকুমারের মুখের দিকে তাকাইলেন, রামকুমারের অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য।

রামকুমার কথা কহিল না। একবার ঊর্ধ্বাধোভাবে মুখ নড়িল।

হেমবাবু কহিলেন, "রামকুমার, ছেলেটি অতি কষ্টে আছে। এক বাসায় থেকে রেঁধে খেয়ে ইস্কুলে পড়তে হয়। দেখলে ছেলেটিকে গরিব লোকের ছেলে বোধ হয় না। হাত দুটি কেমন নরম। বোধ হয়, কোন দৈব ঘটনায় দরিদ্র হয়েছে।

রামকুমার বিষাদিত মুখে কহিলেন, "হবে।"

রামকুমারের উত্তর হেমের নিকট বড় ভাল লাগিল না। গোপালের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া পর্যন্ত, হেমের ইচ্ছা হইয়াছে, গোপালকে আনিয়া নিজবাটীতে রাখেন। কিন্তু এ প্রস্তাব রামকুমারের মুখ হইতেই প্রথমে নির্গত করাইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং রামকুমার সে সম্বন্ধে কিছু না বলায় কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

একটু পরে আবার কহিলেন, "আচ্ছা রামকুমার, আমরা যদি হঠাৎ গরিব হয়ে যাই, তা হলে কি হবে?"

রামকুমার একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "মা কালীর ইচ্ছায় তা তোমরা হবে না। যদি বিদ্যা শিখিতে পার, তবে তোমার টাকার ভাবনা কি?"

রামকুমার তথাপি পথে আইল না।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আচ্ছা, যদি বিদ্যা না শিখবার আগেই গরিব হই, তা হলে আমাদেরও হয়তো কারুর বাড়ী ভাত রান্‌তে হবে।"

রামকুমার কহিল, "না না। এমন কথা মুখের আগায়ও আনতে নাই।"

এমন সময় আহারের জায়গা করিয়া ব্রাহ্মণ হেমবাবুকে আহার করিতে ডাকিল। হেমবাবু বিরস বদনে আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে রামকুমারও আহার করিয়া উপরে গেল। রামকুমার বাবুর শয়নঘরেই শুইয়া থাকে।

হেমচন্দ্র পান খাইতে খাইতে পুনরায় কহিলেন, "রামকুমার, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে শুলাম; কিন্তু সে ছেলেটি বোধ হয় এখনও রাঁধছে।"

রামকুমার উত্তর করিল, "সকলের অদেষ্ট কি সমান? তা হলে পৃথিবী চলত না। সকলেই তো তা হলে মুনিব হত। চাকর আর পাওয়া যেত না।"

রামকুমারের কথা শুনিয়া হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "রামকুমার, ছেলেটিকে দেখে আমার বড় দুঃখ হয়েছে। আমার ইচ্ছা করছে, ওকে এনে আমার এইখানে রাখি। তা হলে ওর কষ্ট থাকবে না, অনায়াসে চারটি রাঁধা-ভাত পাবে।"

বালককালাবধি হেমচন্দ্রের যাহা যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাই সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষ তাঁহার মাতার কাল হওয়া অবধি তাঁহাকে কেহ উচ্চ কথাটি কহে নাই। রামকুমার হেমের কথা শুনিয়া কহিল, "তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে আন।"

হেম কহিলেন, "বাবা কি কিছু বলবেন?"

রামকুমার উত্তর করিল, "তিনি কি কখন কিছু তোমাকে বলেছেন যে আজ

বলবেন ? না তিনি চারটি ভাত দিতে কাতর ? শত শত লোক দুর্গার আশীর্বাদে তোমাদের বাড়ীতে খাচ্ছে। আজ একজনের কথা শুনেই কি তিনি রাগ করবেন ?"

হেম। তবে তাঁকে একখানা পত্র লিখি ; আর ও ছেলেটিকেও কাল এখানে আনি।

রাম। পত্র লিখলেও হয়, না লিখলেও হয়।

হেম রামকুমারের আশ্বাসবাক্যে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রফুল্লচিত্ত হইয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সহসা নিদ্রা না হওয়ায় উঠিয়া বসিলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে হেমচন্দ্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। একটু এ-পুস্তক ও-পুস্তক পাঠ করিয়া হীরে নামক চাকরকে ডাকিয়া গোপালকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গোপাল প্রাতঃকালে রন্ধনাদিতে ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং হেমের নিকট আসিতে পারিলেন না। কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি ইস্কুলে যাইবার সময় হেমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।

অন্যান্য দিবস অপেক্ষা অদ্য গোপাল সত্বরে পাকশাক সমাধা করিয়া বাবুদিগকে আহার করাইলেন এবং নিজে চারিটি নাকে মুখে দিয়া ইস্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। হেমবাবুর ধুতিখানি যত্নপূর্বক পাট করিয়া একখানি কাগজে মুড়িয়া লইয়া চলিলেন। হেমবাবুর বাসার কাছে আসিয়া গোপালের যেন শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রাস্তায় একটু থামিয়া পুনর্বার চলিলেন। হেমবাবু রাস্তার ধারে জানালার কাছে বসিয়া ছিলেন ; গোপালকে দেখিতে পাইয়া সত্বরে বাহিরে আসিয়া গোপালের হাত ধরিয়া লইয়া তক্তাপোশের উপর বসাইলেন। গোপাল ধুতিখানি আস্তে আস্তে বিছানার উপর রাখিলেন। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "এ কি ? আপনি এ আনলেন কেন ?"

গোপাল কহিলেন, "যখন আপনার চাকর গিয়েছিল, তখন শুখায় নি বলে পাঠিয়ে দিতে পারি নাই।

হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমি হীরেকে কাপড়ের জন্যে পাঠাই নাই। আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম।"

গোপাল কথা কহিলেন না।

হেম পুনরায় কহিলেন, "কাল রাত্রে আমি এক বিষয় স্থির করেছি। আপনাকে বলব মনে করেছি, কিন্তু বলতে শঙ্কা হচ্ছে।"

গোপাল মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সহিত আপনি কথা কন, এ আপনার অনুগ্রহ। শঙ্কা কি ?"

হেম উত্তর করিলেন, "তবুও শঙ্কা হচ্ছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তো বলি।"

গোপাল কহিলেন, "আমি আর কি মনে করব? কিন্তু এই মাত্র অনুরোধ করতে ইচ্ছা করি যে, আপনি আমাকে 'আজ্ঞা মহাশয়' বলে কথা কবেন না।"

হেম হাসিয়া উঠিলেন। গোপালও হাসিয়া কহিলেন, "আমি রসুয়ে বামুন; আমাকে 'আজ্ঞা মহাশয়' বলে কথা কইলে আমার বড় লজ্জা হয়; আর লোকেই বা শুনে কি বলবে?"

হেম হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তবে কি বলব?"

গোপাল কহিলেন, "আমার নাম ধরে ডাকবেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তবে আমার একটা কথা আপনার রাখতে হবে।"

গোপাল। কি কথা?

হেম বলিতে গিয়া একটু হাসিয়া আর বলিলেন না। ইতিমধ্যে হীরে তামাক দিয়া গেল। হেম তামাক খাইতেছেন আর ভাবিতেছেন, কি প্রকারে তাঁহার মনোগত বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন। ক্ষণকাল তামাক টানিয়া গোপালকে হুঁকা দিয়া কহিলেন, "খান মহাশয়।"

গোপাল হুঁকাটি লইয়া বৈঠকে রাখিলেন।

হেম কহিলেন, "তাও তো বটে, আপনি তামাক খান না। তবে আমাকে দিলেন না কেন, আমিই রাখতাম।"

এই কথার পর উভয়ে একটু চুপ করিয়া রহিলেন। গোপাল হেমের আলমারির দিকে চাহিতে লাগিলেন। হেম এই অবকাশ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলেছিলেন বই নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না? হয়তো এক সময়ে আপনার ও আমার এক বইয়েরই দরকার হতে পারে।"

গোপাল কহিলেন, "আপনার দরকার হলে অবশ্য আমি নেব না। তবে আপনার যে-সমস্ত বই দরকার না হবার সম্ভব, তাই যদি মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে দেন, তাহা হলেই আমার যথেষ্ট উপকার হয়।"

হেম উত্তর করিলেন, "আমি সে অভিপ্রায়ে বলি নাই। আমার মনোগত ভাব এই যে, দু-জনে এক স্থানে থাকলে ভাল হয়।"

গোপাল হেমের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার না এক জন ব্রাহ্মণ আছে?"

হেম। আপনাকে কি আমি ব্রাহ্মণ হয়ে থাকতে বলছি? আমিও যেমন থাকব, আপনিও তেমনি থাকবেন, এই আমার ইচ্ছা।

গোপাল কথা কহিলেন না। অবনত মুখে মাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। হেমও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেন?"

গোপাল গাঢ়স্বরে কহিলেন, "মহাশয় আমি একলা নই। আমার এক দিদি আছে। আমরা দু-জনেই এক জায়গায় থাকি।"

হেম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনার কেমন দিদি?"

গোপাল ছল ছল নেত্রে উত্তর করিলেন, "মহাশয় আমাদের অবস্থা চিরকাল এরূপ ছিল না। আমার মায়ের শ্যামা নামে এক জন দাসী ছিল, সে-ই আমাকে প্রতিপালন করেছে বল্লে হয়। যত মায়ের ধার না ধারি, শ্যামার কাছে তদপেক্ষা সহস্র ঋণী আছি। এককালে কোন দুর্ঘটনাবশতঃ আমাদের অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা হয়েছিল; তখন শ্যামার পূর্বসঞ্চিত কিঞ্চিৎ ধন ছিল, তাতেই আমাদের জীবন রক্ষা হয়েছে। মা মরবার সময় আমাকে শ্যামার হাতে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। সেই অবধি আমরা যেখানে যাই, দুজনেই একত্র যাই, শ্যামা আমাকে না দেখলে তিন দিনেই মরে যাবে।"

গোপালের কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল।

রামকুমার এমন সময় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। হেম কহিলেন, "রামকুমার, আমি যা বলেছিলাম তাই।"

রামকুমার জিজ্ঞাসিল, "বাবু কবে বাসা তুলে আনবেন?"

হেম শ্যামার বৃত্তান্ত রামকুমারকে কহিলেন। রামকুমার কহিল, "সে তো ভালই। তুমি তো বলেছিলে, একজন দাসী রাখবে। শ্যামা একটু একটু যদি কাজকর্ম করতে পারে, তা হলে আর একজন রাখবার দরকার হবে না।"

গোপাল কহিলেন, "আমি কেমন করে ওখান থেকে ছেড়ে আসব?"

হেম। তারা কি তোমাকে এত ভালবাসে?

গোপাল কহিলেন, "না।"

হেম পুনর্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

গোপাল উত্তর করিলেন, "চাকরকে কে ভালবাসে মহাশয়? কাল আপনি যেতে দেন নাই বলে কত বকলে, আর—" এই বলিয়া থামিলেন।

হেম একটু চুপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আর—কি?"

গোপাল। না মহাশয়! যার অন্ন খেয়েছি, তার নিন্দা করব না।

হেম। আচ্ছা সে কথা যাক্, এখন আসবার কি?

গোপাল। দিদির কাছে না জিজ্ঞাসা করে বলতে পারি না।

হেম। তবে কখন বলবেন?

গোপাল। আজ সন্ধ্যার সময় ইস্কুল থেকে এসে বলব।

গোপাল ইস্কুল হইতে বাটী আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া শ্যামার নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শ্যামার চক্ষু হইতে ধারা বহিতে লাগিল। একটু পরে কহিল, "হেমবাবুর বাড়ী গেলে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তার বাড়ীর অন্যান্য লোক কেমন? তারা যদি দূর ছাই করে, তা হলে কি হবে? এখানে তবু এক রকম চাকরের মত থাকি, কেহই জানতে পারে না। কিন্তু সেখানে তুমি সব কথা বলে ফেলেছ, সেখানকার চাকর-বাকরের উঁচু কথা বরদাস্ত হবে না।"

গোপাল কহিলেন, "দিদি, তিনি এমনি করে জিজ্ঞাসা করতে লাগিলেন, আমি যে না বলে থাকতে পারলাম না।"

শ্যামা। আমি সেজন্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না।

ক্ষণকাল উভয়ে চুপ করিয়া থাকিয়া শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মত কি?"

গোপাল কহিলেন, "আমার সেইখানে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তুমি যদি যেতে না বল, তবে যাব না; আমি তো কখন তোমার অবাধ্য হয়ে কোন কাজ করি নাই।"

শ্যামা কহিল, "আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু এদের তো খবর দেওয়া উচিত। কাল সকালে যদি আমরা চলে যাই, তবে এদের কি উপায় হবে?"

শ্যামার কথা শুনিয়া গোপালের যার-পর-নাই আহ্লাদ হইল। রন্ধন শেষ হইলে এক দৌড়ে হেমবাবুর বাটীতে গিয়া শ্যামার মত বলিয়া আসিলেন। হেমবাবুও শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নবনারী

পূজা আসিতেছে। শরতের সমাগমে বসুন্ধরা উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। বৃদ্ধেরা সম্বৎসরের পর মহামায়ার শ্রীচরণে জবা বিল্বদল দিবে বলিয়া আনন্দে ভাসিতেছে। বিদেশস্থ যুবকেরা প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে; বিরহিণী মনে মনে কতই রসপূর্ণ কথার হার গাঁথিতেছে। বালকেরা ইস্কুল বন্ধ হইবে বলিয়া কতই আমোদ করিতেছে। দীন দুঃখী সম্বৎসরের পর একখানি নূতন বস্ত্র পরিতে পাইবে বলিয়া মনে মনে কতই উল্লসিত হইতেছে।

এক স্থানে বাসজনিত গোপাল ও হেমের পরস্পর অত্যন্ত সৌহার্দ্য জন্মিল।

গোপাল হেমকে দাদা বলিয়া ডাকেন এবং হেমও গোপালকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "গোপাল, তুমি কি বাড়ী যাবে? যদি না যাও, তাহলে আমাদের বাড়ী চল।"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আমার বাড়ী যাওয়া হবে না। আপনি যদি নিয়ে যান, তবে আপনাদের বাড়ী যাই।"

হেম ও গোপাল বাড়ী আসা অবধি স্বর্ণলতা গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া ডাকেন। গোপাল দাদা না পড়াইলে স্বর্ণলতার পড়া হয় না। কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে গোপাল দাদার কাছে যান। গোপাল যেন যথার্থই স্বর্ণের সহোদর।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "স্বর্ণ, তুমি আজ ক'দিন পড়লে না?"

স্বর্ণলতা হাসিয়া কহিলেন, "পড়ব না কেন? আমি তো রোজই পড়ি।"

হেম। তোমার বই আন দেখি, আমি পড়াই।

স্বর্ণ হাসিতে হাসিতে একখানি নবনারী আনিয়া হেমের সম্মুখে রাখিলেন।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় পড়বে?"

স্বর্ণ উত্তর করিলেন, "সীতা।"

হেম সেইখানে খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এক এক ছেদ পর্যন্ত পড়িয়া স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বুঝেছ তো?"

স্বর্ণ ক্ষণকাল মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি বড় তাড়াতাড়ি পড়, আমি তোমার কাছে পড়ব না। গোপাল দাদার কাছে পড়ব।"

হেম। তবে ডাক তোমার গোপাল দাদাকে।

স্বর্ণ হেমের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গোপালকে ডাকিবার আজ্ঞা পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন। গোপাল বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন।

স্বর্ণলতা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, তোমাকে দাদা ডাকছে।"

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?"

স্বর্ণ। এস তো তবে টের পাবে।

স্বর্ণ গোপালের হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, গোপাল হাসিতে হাসিতে স্বর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যে ঘরে হেমচন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে লইয়া গিয়া স্বর্ণ গোপালকে হেমের নিকটে বসাইলেন। গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "দাদা, আমাকে ডেকেছ কেন?"

হেম কহিলেন, "গোপাল, তুমি অমন পরের মতন বাইরে বাইরে থাক কেন? তুমি কি এ পরের বাড়ী মনে কর?"

গোপাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "বৈঠকখানায় সকলে বসে আছে, আমিও ছিলাম।"

হেম। "স্বর্ণ তো আর আমার কাছে পড়বে না। আমার পড়ান ওর মনোমত হয় না।"

গোপাল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। একটি একটি কথা পড়িয়া তাহার একটি একটি প্রতিশব্দ দিয়া স্বর্ণলতাকে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বর্ণের চক্ষু পুস্তকে নাই। তিনি একদৃষ্টে গোপালের মুখপানে চাহিয়া আছেন। এক ছেদ সমাপ্ত হইলে পুস্তক হইতে চক্ষু উত্তোলনপূর্বক স্বর্ণলতাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝেছেন তো?" স্বর্ণলতার মুখপানে দৃষ্টি করিবার সময় গোপালের মুখ আরক্তিম হইল। স্বর্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "গোপাল দাদা, তুমি 'আপনি' বল কারে?"

গোপালের মুখ কর্ণ পর্যন্ত লোহিতবর্ণ হইল।

তিনি পূর্বে স্বর্ণলতাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আজ 'আপনি' বলিলেন কেন?

হেমচন্দ্র বিছানায় শয়ন করিয়া গোপালের পড়া শুনিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে গোপাল কহিলেন, "দাদা কোথায় যাও? একটু দেরি কর, আমিও যাব, এইটুকু পড়ানো হলেই হয়।"

হেম কহিলেন, "তুমি পড়াও, আমি এখনই আসব।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

গোপাল অবনত মুখে স্বর্ণলতাকে পড়াইতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল দাদা, আজ তোমার কি হয়েছে? তুমি মাটির দিকে চেয়ে আছ কেন?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "না, কিছু হয় নি। আপনি পড়ুন।"

স্বর্ণ কহিলেন, "গোপাল দাদা, আজ আবার ও একটা নূতন কথা শিখলে কোথা থেকে? আমাকে তো আগে তুমি 'আপনি' বলতে না।"

গোপাল একবার স্বর্ণলতার মুখপানে নিরীক্ষণ করিলেন। পুনরায় মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আমি বড় গরিব মানুষ। আমি একজনের বাড়ী রসুয়ে বামুন ছিলাম। আমার মতন লোকের মান্য করে কথা কওয়া উচিত।"

এই কথা কহিয়া গোপাল পুনরায় স্বর্ণলতার মুখপানে চাহিলেন। স্বর্ণ দেখিলেন, তাঁহার গোপাল দাদার চক্ষে জল আসিয়াছে।

স্বর্ণ গোপালের মন অন্যদিকে লইয়া যাইবার জন্য জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল দাদা তোমাদের বাড়ীতে পূজা হবে ?"

গোপালের দুঃখ যে এ কথায় দ্বিগুণ হইবেক, তাহা স্বর্ণ বুঝিতে পারেন নাই।

গোপাল ম্লানমুখে কাতর স্বরে কহিলেন, "আমরা গরিব মানুষ, আমাদের বাড়ী কেমন করে পুজা হবে ?" গোপালের চক্ষে জল আসিয়াছিল, তাহা এক্ষণে ঝরঝর ঝরিতে লাগিল। গোপাল মাটির দিকে চাহিলেন।

উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল দাদা, তোমার ঠাকুর-মা কোথায় ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আমার ঠাকুর-মা নাই।"

স্বর্ণ। মা ?

গোপাল। মা-ও নাই।

স্বর্ণলতার মুখ ম্লান হইল। কাতর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল দাদা, আমার মা-র কথা কিছু জান ?"

গোপাল। কেন ?

স্বর্ণ। আমি পাড়ায় যাদের সঙ্গে খেলা করতে যাই, সকলেরই মা আছে, আমারই নাই। ঠাকুর-মাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সকলের মা থাকে না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কাঁদেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কথা কন না। তুমি আমার মা-র কথা কিছু জান ?

গোপাল কহিলেন, "স্বর্ণ, তোমার মা মরেছেন।"

স্বর্ণ। তোমার মাও কি মরেছেন ?

গোপাল। হাঁ, তিনিও মরেছেন।

স্বর্ণ। তবে আমরা দু-জনেই সমান।

স্বর্ণলতার কথা শুনিয়া গোপালের শোকাবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। অধোবদনে বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, তুমি কাঁদ কেন ? আমার তো মা নেই; কিন্তু আমি তো কাঁদি না।" এই বলিয়া স্বর্ণলতা গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, চল যাই ঠাকুর দেখি গে। তোমাদের দেশে এমন ঠাকুর হয় ?"

গোপাল কথা কহিলেন না।

স্বর্ণলতা পুনর্বার কহিলেন, "গোপাল দাদা, শীঘ্র চল না। তুমি কি চলতে পার না ?"

কিছুদূর আস্তে আস্তে গিয়ে গোপালের চক্ষের জল শুকাইল, পরে একটু হাসিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আমার এ কান্নার কথা দাদার কাছে বলো না।"

স্বর্ণ কহিলেন, "তবে আমি যে মা-র কথা বল্লাম, এও কারু সঙ্গে বলো না।" গোপাল কহিলেন, "না, আমি বলব না।" স্বর্ণ কহিলেন, "তবে আমিও বলব না।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন নূতন ভাব

এই অবধি স্বর্ণলতার সহিত গোপালের এক গোপনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। গোপাল স্বভাবতই লাজুক; কিন্তু এই অবধি তাহার লজ্জা যেন সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইল। গোপাল আর অন্তঃপুরে যান না। সর্বদাই বহির্বাটীতে বসিয়া থাকেন। পূর্বে পূর্বে সর্বদাই কথাবার্তা কহিতেন, কিন্তু এখন আর কথাবার্তা কহিতে ভালবাসেন না। যেখানে অধিক লোকজন বসিয়া থাকে, আস্তে আস্তে তথা হইতে গিয়া অন্য এক স্থানে বসেন। হেমচন্দ্র একবৎসর পর বাটী আসিয়াছেন। এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাইতেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। যখন গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হয় গোপালের বিরস বদন দেখিয়া মনে করেন, গোপাল বাটীর ভাবনা ভাবিতেছে। হঠাৎ দুই এক দিবস গোপালের অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার চক্ষের জল দেখিলেন। দুই এক দিবস গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন; গোপাল জানিতে পারেন নাই। শব্দ করিলে চমকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কেও?"

একদিবস হেম জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল, তুমি এমন হয়ে গেলে কেন? তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে?" গোপাল উত্তর করিলেন, "অনেকদিন বাবার কোন সমাচার পাই নাই, তিনি কেমন আছেন টের পেলাম না।"

হেমচন্দ্র, গোপাল যে তক্তাপোশে বসিয়াছিলেন, তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, তিনি ভালই আছেন। তুমি তাঁকে পত্র লিখেছ?" গোপাল কহিলেন, "না।"

হেমচন্দ্র বলিলেন, "তবে একখান পত্র লেখা উচিত।" এই বলিয়া কাগজ কলম আনিয়া পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খানিক লিখিয়া কহিলেন, "গোপাল, আমার লেখাটা ভাল বোধ হচ্ছে না; হয়তো আমার হাতের পত্র পেয়ে তিনি মনে করবেন, তোমার কোন পীড়া হয়েছে, তাই তুমি লিখতে পারলে না। তুমিই পত্রখান লেখ।" গোপাল পত্র লিখিলেন।

চিঠির জবাব আসিল। বিধুভূষণ লিখিয়াছেন, "আমি ভাল আছি, সেজন্য চিন্তা করিবে না। হেমবাবু ও তোমার কুশল সমাচার লিখিবে।" আগে হেমবাবুর নাম, পরে "তোমার কুশল সমাচার।" হেমবাবুর তাহাতে বড় আহ্লাদ হইল। পিতার চিঠি পাইয়া গোপালের চিত্তও অপেক্ষাকৃত ভাল হইল।

যে দিবস গোপাল ও স্বর্ণলতার পূর্বপ্রকাশিত কথোপকথন হইয়া যায় সেই অবধি স্বর্ণলতারও অন্তরে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইল। সে কোন্ ভাব? স্বর্ণলতা বলিতে পারে না, সে কোন্ ভাব। গোপালকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আর গোপালের কাছে যাইতে পারেন না। আর পূর্বের মতন তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার ক্ষমতা হয় না, হেম অন্তঃপুরে আসিলে যদি গোপাল সঙ্গে না থাকিতেন, তাহা হইলে স্বর্ণলতা পূর্বে পূর্বে জিজ্ঞাসা করিতেন, "দাদা, গোপাল দাদা কোথায়?" কিন্তু এখন আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। হেমকে দেখিলেই তাঁহার হৃদয় কম্পিত হয়। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর কেহ আসিতেছে কি না, উঁকি মারিয়া দেখেন। যদি আর কাহাকে না দেখিতে পান, তবে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কার্যান্তরে, কি স্থানান্তরে, গমন করেন। গোপাল যখন হেমের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেন, স্বর্ণলতা আর সেদিকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন না। দৈবে তাঁহার ও গোপালের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইলে উভয়েই অন্যদিকে চাহিতেন। কিন্তু অন্যদিকে চাহিয়াও অধিকক্ষণ থাকিতেন না। স্বর্ণলতা আর গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া সম্বোধন করেন না। নাম উল্লেখ দূরে থাকুক, কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে গোপালের সহিত এক স্থানে থাকেন না। হঠাৎ একাকিনী গোপালের সম্মুখে পড়িলে তাঁহার মুখ চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে। পুস্তকে মন লাগে না; গোপাল দাদাকে আর পড়িবার জন্য ডাকেন না। গোপাল দাদাকে না দেখিলে চিত্ত যার-পর-নাই চঞ্চল হয়, কিন্তু গোপাল সম্মুখে থাকিলে তাহার মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে ভরসা হয় না।

স্বর্ণলতা যেন হঠাৎ বালিকাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে অধিরূঢ়া হইলেন। পূর্বে যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইত, এক্ষণে তাহাতে ঘৃণা জন্মিল; খেলা আর ভাল লাগে না। খেলিবার নাম শুনিলে তাঁহার হাসি পায়। ঠাকুরমার উপন্যাস আর সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চিন্তাই যেন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

পূজা অন্তে গোপাল ও হেম এক দিবস বসিয়া আছেন। বিপ্রদাস তথায় আসিলেন। কর্তাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের কথা বন্ধ হইল। বিপ্রদাস হেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় যাবার দিন স্থির করা হলো?"

হেম উত্তর করিলেন, "আপনি যে দিন স্থির করে দেবেন, সেই দিনই যাব।"

বিপ্রদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণর তো আর বিবাহ না দিলে নয়, তার কি বলো দেখি ?"

হেম। সে বিষয়ে আমি কি বলব ? আপনার যে অভিপ্রায়, তাই হবে।

এই কথায় গোপালের বোধ হইল, যেন আপনার মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তথা হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। বিপ্রদাস কহিলেন, "কোথা যাও বাবা ? বসো বসো, উঠে যাবার দরকার নাই।"

হেম কহিলেন, "না, গোপাল একটু বেড়াক। ওর শরীর বড় ভাল নাই।"

গোপাল কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, "তিন চার জায়গা থেকে প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু আমার কোনটাই মনোমত হয় না। শ্রীরামপুরের কাছে একটি পাত্র আছে; সে না-জানে লেখাপড়া, না তাকে দেখতে শুনতে ভাল ; কিন্তু ঠাকুরমহাশয়" (বলিয়া বিপ্রদাস গুরুচরণে প্রণাম করিলেন) "সেইখানেই শুভকর্ম করতে অনুরোধ করেছেন।"

হেম উত্তর করিলেন,, "সে পাত্র যদি ভাল না হয়, আর যদি লেখাপড়া না জানে, তা হলে সেখানে শুভকর্ম করা কোন মতেই উচিত নয়।"

"আমিও তো বাপু তাই বলি" বিপ্রদাস কহিলেন। "আমিও তো তাই বলি। এইজন্যে আমি কোন জবাব দিই নাই, বলেছি—তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কথা বলতে পারি না।"

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোথা থেকে প্রস্তাব এসেছে ?"

বিপ্রদাস। আরও দুই তিন স্থান হতে এসেছিল, কিন্তু আমি তাহাদের জবাব দিয়েছি। কোনখানের পাত্রই ভাল বোধ হয় না।

হেমচন্দ্র একটু বিলম্বে কহিলেন, "গোপালের সহিত বিবাহ দিলে হয় না।"

বিপ্রদাস। কোন্ গোপাল ?

হেম। এই যে আমাদের গোপাল ; এই মাত্র উঠে গেল।

বিপ্রদাস হেমের কথা শুনিয়া একটু চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, "তুমি বল্লে না, ওদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ? পাত্রটি মনোমত বটে। যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি লেখাপড়া বোধ আছে। কিন্তু বড় গরিব।" এই বলিয়া বিপ্রদাস একটু মুখ বাঁকাইলেন।

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি স্বর্ণকে যে টাকা উইল করে দিলেন, তা পেলে আর স্বর্ণের ভাবনা কি ? ঐ রেখে খেতে পারলে কত পুরুষ বড়মানুষের ন্যায় চলতে পারবে। বিশেষ, রূপ, গুণ ও ধন, তিনই একত্রে মেলা সুকঠিন।"

বিপ্রদাস আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাও বটে। গোপাল কুলীনের সন্তান, স্বভাব ভাল। আজকাল অমন কুলীন মেলা ভার।" এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু অবিলম্বে পুনরায় কহিলেন, "তোমার প্রস্তাব সঙ্গত বটে। আমি বিবেচনা করে দেখি; কিছু বিষয়-আশয় থাকলে আর কথাই ছিল না অর্থাৎ সে-ই উৎকৃষ্ট হইত। কিন্তু তুমি যা বল্লে সে সত্য, তিনই এক স্থানে মেলে না।" এই বলিয়া বিপ্রদাস ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। হেমও গোপালের অনুসন্ধানে গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দায়মাল—কিন্তু ধরা পড়িল না

গোপাল, হেমচন্দ্র ও বিপ্রদাসের নিকট হইতে বৈঠকখানার দিকে আসিলেন। দীন নয়নে গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহাকে দেখিতে পাইলেন? স্বর্ণলতাকে। স্বর্ণলতা সেখানে কিজন্তে আসিয়াছিলেন?

প্রাতঃকালে দূর হইতে গোপাল ও হেমকে দালানের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইয়া স্বর্ণলতা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতা কোথায়? একটু পরে তাঁহাকেও দালানের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইলেন। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সত্বর তথা হইতে স্থানান্তরে যাইবেন না। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন কেহই নাই। কম্পিত হৃদয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কোন শব্দ করিব না, কিন্তু যত জিনিসপত্র, আজি যেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দিবার জন্যই তাঁহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল। একখানা চেয়ারের কাছ দিয়া যাইতে সেখানা পড়িয়া যাইবার জো হইল। সেখানাকে ধরিতে গিয়া একখানা পুস্তক মেজের উপর হইতে পড়িয়া গেল। পুস্তকখানি তুলিয়া দেখিলেন, সেখানি মেঘনাদবধ কাব্য। প্রথমের সাদা পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে "গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" লেখা রহিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া একটু পুস্তকখানি সাদর নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে আস্তে আস্তে সেখানিকে মেজের উপর রাখিয়া বৈঠকখানার ধারে কাপড় রাখিবার আলনার নিকট গেলেন। আলনার উপর গোপালের ধুতি ও চাদর রহিয়াছে। ধুতিখানি ও চাদরখানি স্বর্ণলতার পিতা পূজার সময় গোপালকে দিয়াছিলেন। গোপাল সেইখানি পরিয়া ভাসান দেখিতে গিয়াছিল। স্বর্ণলতা তাহা জানেন। কিন্তু হেমচন্দ্র কোন্

কাপড়খানি পরিয়া ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণের স্মরণ নাই। গোপালের চাদরের এক পার্শ্ব মাটিতে পড়িয়াছিল; যত্নপূর্বক চাদরখানি তুলিয়া রাখিলেন। পরক্ষণেই আবার সেখানিকে পাড়িলেন। পাড়িয়া নিজের গায়ে দিলেন। পরে অস্ফুট বচনে কহিলেন, "এইরকম করে গায়ে দিয়েছিলেন।"

যেই স্বর্ণলতার মুখ হইতে উল্লিখিত কথা নিঃসৃত হইল, অমনি তিনি বৈঠকখানার বহির্দ্বারে পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, গোপাল। স্বর্ণলতার কণ্ঠার মূল অবধি কর্ণের অগ্রভাগ পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া চাদরখানি ফেলিয়া দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রস্থান করিলেন। সেখানি তুলিয়া আলনায় রাখিবার অবকাশ পাইলেন না। গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কি স্বর্ণলতা?" স্বর্ণলতা সে দেশেও না। তখন তিনি আস্তে আস্তে চাদরখানি তুলিয়া আলনায় রাখিলেন এবং বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

উপুড় হইয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া গোপাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে কহিলেন, "বামন হয়ে চাঁদে হাত কেন তোমার? দুরাশা ভাল নয়। দুরাশা করে কারও কখন ভাল হয় নাই। কি আশ্চর্য! লোকের সহিত কিছু বলবার জো নাই, বল্লেই পাগল বলবে।" (দীর্ঘনিশ্বাস) "টাকা না থাকলে বেঁচে থাকা বৃথা! আজ টাকা থাকলে আমার ভাবনা কি?" (দীর্ঘনিশ্বাস) "কবিরা বলেন, টাকা অনর্থের মূল। কিন্তু তাঁরা বই লিখে মরেন কেন? বিক্রি না হলেই বা দুঃখ করেন কেন? পৃথিবী শঠতায় পরিপূর্ণ, এখানে কেহই মনের কথা কহে না। কহিবেই বা কেন? মনের কথা প্রকাশ করলেই লোকে যেখানে পাগল বলে, সেখানে চুপ করে থাকাই ভাল।" (দীর্ঘনিশ্বাস) "স্বর্ণলতার বাপ যদি উইল করে এত টাকা স্বর্ণকে না দিতেন, তা হলে এক দিন কারুকে দিয়ে বলাতে পারতাম। কিন্তু উইল করেই সে পথ বন্ধ হয়েছে!" (দীর্ঘনিশ্বাস) "আমি টাকা চাই না। এখনও তো উইল ওলটান যায়। কিন্তু আমি টাকা চাই নে বলে স্বর্ণ টাকা ছাড়বে কেন? আমি তাকে যেমন ভালবাসি, সেও কি আমাকে তেমনি ভালবাসে? কখনই হতে পারে না। আমি গরিবের ছেলে, আমাকে বড়মানুষে কেন ভালবাসবে? সেদিন আমার অবস্থার কথা শুনে অবধি আর আমার সঙ্গে কথা কহে না, আমাকে ডাকে না, আমি যেখানে যাই সেখান থেকে চলে যায়।" (দীর্ঘনিশ্বাস) "সে যদি আমার জন্য না ভাবে, আমি কেন তার জন্যে ভেবে মরি? ভেবেই বা ফল কি? আর দুই তিন দিন পরে আমি চলে যাব। হয়ত আর এ জন্মে দ্বিতীয় বার দেখা হবে না।" (দীর্ঘনিশ্বাস) "দূর করো

ভাবনা।” এই বলিয়া একখানি পুস্তক হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু হাতে লওয়াই সার। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তিন চারি পংক্তি পর্যন্ত মনসংযোগ করিয়া পাঠ করিলেন। পরে মন অন্যদিকে গেল। খানিক পড়িয়া দেখেন, যা পড়িয়াছেন সকলই মিথ্যা হইয়াছে। এক বর্ণও মনে নাই। আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলেন। পুনর্বার তিন চারি পংক্তি পড়িয়া অন্যমনস্ক হইলেন। আবার খানিক পড়িয়া টের পাইলেন, কিছুই মনে নাই। সেই প্রথমকার তিন পংক্তি ভিন্ন আর বুঝিতে পারেন নাই। বিরক্ত হইয়া সেখানা ফেলিয়া দিয়া আর একখানা পুস্তক লইলেন। সেখানিও পড়িতে গিয়া ঐরূপ হইতে লাগিল। পূর্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইয়া সেখানিও রাখিয়া দিলেন। মনে করিলেন পত্র লিখি। কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপরে তারিখ দিলেন। দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কাহাকে লিখি। এ, ও, সে, এক এক করিয়া কত নাম উপস্থিত হইতে লাগিল। কাহাকেও লিখিতে ইচ্ছা হইল না। পরে পিতাকে পত্র লিখিবেন স্থির করিলেন। কাগজের উপর ইংরাজীতে তারিখ দিয়াছিলেন, সেটুকু ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। পরে বাঙ্গলায় লিখিতে লাগিলেন। খানিক লিখিয়া পড়িয়া দেখিলেন, অনেক ভুল হইয়াছে। এক এক করিয়া ভুলগুলি সংশোধন করিলেন, কিন্তু তাহাতে চিঠিখানি অত্যন্ত অপরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। এজন্য সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আর একখানি কাগজ লইলেন, তাহাতেও ভুল হইতে লাগিল, “দূর হোক” বলিয়া সেখানিও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

হেমচন্দ্র এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। গোপালকে বৈঠকখানার বিছানায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “গোপাল তুমি এইখানেই আছ, তবে আমার ডাকে উত্তর দাও নাই কেন?”

গোপাল কহিলেন, “তুমি কখন ডাকলে?”

হেম। বিলক্ষণ; ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙে যাবার জো হয়েছে যে? (গোপালের হাত ধরিয়া) চল যাই, স্নান করি গিয়ে।

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, “কলিকাতায় যাবার দিন কবে স্থির হলো?”

হেম। এখনও হয় নাই। বাবা পাঁজি দেখবেন, তবে স্থির হবে।

গোপাল। “স—র—” স্বর্ণের বিবাহের বিষয় কি কথা হইল, জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু “সর” বলিয়া চুপ করিলেন, আর অধিক কহিতে পারিলেন না। ভাগ্যক্রমে হেমের মন অন্য বিষয়ে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং গোপালের কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

উভয়ে স্নান করিয়া আসিলেন এবং আহারাদি করিয়া বৈঠকখানার বিছানায় বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল ও বিধুভূষণ তথা শশিভূষণ

গোপালকে কলিকাতায় রাখিয়া বিধুভূষণ একজন ডেপুটী-কলেক্টরের সহিত ঢাকায় গিয়েছিলেন, তাহা পাঠককে বলা হইয়াছে। যে ডেঃ কলেক্টরবাবু বিধুকে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বড় গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। বিধুভূষণকে ঢাকা জেলায় লইয়া গিয়া তাহাকে এক মুহুরিগিরি কর্ম দিলেন। বিধুভূষণ প্রথমতঃ সে কর্ম সুচারুরূপে চালাইতে পারিতেন না, কিন্তু সত্বরই সে বিষয়ে তাঁহার পটুতা জন্মিল। দিবসে কাজকর্ম করিতেন। সায়ংকালে ডেপুটীবাবুকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গীতবাদ্য শিক্ষা দিতেন। যে বেতন পাইতেন, তাহাতে নিজের খরচপত্র চলিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, গোপালকে পাঠাইয়া দিতেন।

এক দিবস বিধুভূষণ বাজারে এক দোকানে কাপড় খরিদ করিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় কোলাহল শুনিতে পাইলেন। সকলেই বাহির হইয়া দেখিতে গেল। বিধুভূষণও সেই সমভিব্যাহারে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, আগে আগে এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ আসিতেছে ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি বালক "বাছা হনুমান" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতেছে ও রাস্তার ধূলি লইয়া তাহার গায় দিতেছে। দেখিবামাত্রেই বিধুভূষণ নীলকমলকে চিনিতে পারিলেন। নীলকমলের আর সে পূর্বের শরীর নাই। তাহার কেশ লম্বা হইয়াছে, দাড়ি বক্ষঃস্থল ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে ও শরীর যার-পর-নাই কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। নীলকমল অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। বালকেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিৎকার করিতেছে। যখন বরদাস্ত করিতে না পারিতেছে, তখন এক একবার বালকদিগকে প্রহার করিবার জন্য ফিরিতেছে এবং তদ্দর্শনে তাহারা প্রথমে পলাইতেছে; কিন্তু অবিলম্বেই একত্রিত হইয়া পূর্ববৎ "বাছা হনুমান" বলিতেছে।

বিধুভূষণ নীলকমলকে চিনিতে পারিয়াই তাহার নিকটে গেলেন। নীলকমল বিধুভূষণকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিবামাত্রই কহিল, "দাদাঠাকুর! আমি টের পাই নাই। আমাকে যে

জালাতন করেছে, আমার আর আপন পর ঠাওর নাই। এখন আমি মরতে পারলেই বাঁচি।”

বিধুভূষণ কহিলেন, “নীলকমল! কি হয়েছে? তুমি এখানে এলে কবে?”

পশ্চাৎ হইতে নিয়ত “বাছা হনুমান, বাছা হনুমান” শব্দ হইতেছে। নীলকমলের কান সেই দিকেই রহিয়াছে, বিধুভূষণ কি কহিলেন, শুনিতে পাইল না। একটু পরে কহিল, “দাদাঠাকুর, আমারে আগে রক্ষা কর, পরে সব কথা শুনব।”

বিধুভূষণ বালকদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এক দিক্ হইতে তাড়াইয়া দিলে অপর দিকে গিয়া জোটে। বিরক্ত হইয়া তিনি নীলকমলের হাত ধরিয়া দোকানের মধ্যে লইয়া গেলেন। বালকেরা দোকানে প্রবেশ করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

নীলকমলকে লইয়া বিধুভূষণ এক স্বতন্ত্র গৃহে গেলেন। গিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন। নীলকমল শ্রান্তি দূর করিয়া কহিল, “দাদাঠাকুর, তুমি এখানে কোথা হতে এলে?”

বিধুভূষণ কহিলেন, “আমি তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি কোথা থেকে এলে? তোমার দিব্যি কর্ম্ম ছিল, তা ছেড়ে দিলে কেন?”

নীলকমল উত্তর করিল, “দাদাঠাকুর, অদেষ্টে না থাকলে অতি বড় সুখও অনেক দিন থাকে না। তোমাদের বাড়ী থেকে বাড়ী গেলাম। সেখানে এই গোলের সুরু হলো। তারপর যেখানে যাই, সেইখানেই এই গোল। দাদাঠাকুর, তুমি আমাকে বারণ করা অবধি আমি সে গানও গাই নে, তার কথাও কই নে, তবু আমাকে লোকে ছাড়ে না।”

বিধুভূষণ বুঝিতে পারিলেন, নীলকমল পদ্মআঁখির গানের উল্লেখ করিতেছে। তিনি আর কথা কহিলেন না।

নীলকমল জিজ্ঞাসিল, “দাদাঠাকুর, এখন কোথায় গেলে বাঁচি, আমাকে বলে দাও।”

বিধুভূষণ কহিলেন, “নীলকমল, তুমি খেপো কেন? তাতেই ওরা খেপায়।”

নীলকমল। দাদাঠাকুর, ঐ কথা আমিও বলি যে, আমি খেপি কেন? কিন্তু কথাটা শুনলে যেন আমার বুদ্ধি লোপ পায়, আমি যেন পাগল হই।

নীলকমল কথাটা শুনিয়া যে পাগলের মত হয়, তাহা আর বলিবার সাপেক্ষ রহিল না। বিধুভূষণ তাহার চেহারা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয়ে সেই দোকানঘরে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পরে বিধুভূষণ কহিলেন, “নীলকমল, চল আমাদের বাসায় যাই। সেইখানে খেয়ে শুয়ে থাকবে।”

নীলকমল। দাদাঠাকুর, আমার কি আর খাওয়াদাওয়া আছে?

বিধুভূষণ। সে কি?

নীলকমল। আজ তিনদিন জলবিন্দুও খাই নাই, তবু খিদে নেই।

নীলকমলের কাতরোক্তি শুনিয়া বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, তুমি এইখানে বসো, আমি এখুনই খাবার আনি।"

নীলকমল। না না।

চন্দ্রের আলোকে বিধুভূষণ দেখিতে পাইলেন, নীলকমলের চক্ষু এই কথা কহিবার সময় ভয়ানক হইয়া আসিল। বিধুভূষণ বিস্তর সান্ত্বনা-বাক্যের দ্বারা বাসা পর্যন্ত আনিলেন। বাহিরের ঘরে বসাইয়া নিজে কিঞ্চিৎ খাবার আনিবার জন্যে বাটীর মধ্যে আসিলেন; কিন্তু ফিরিয়া গিয়া দেখেন, গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে। নীলকমল নাই। এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান করিলেন, কোন স্থানেই তাহার উদ্দেশ পাইলেন না।

বিধুভূষণ ডেপুটী বাবুর সহিত যেরূপ সুখে আছেন, বোধ হয় ইহার পূর্বে তিনি কখনও এমন সুখে কালযাপন করেন নাই। কিন্তু শশিভূষণ ঐশ্বর্যশালী হইয়া অট্টালিকায় শয়ন করিয়া কেমন আছেন দেখা যাউক।

রামসুন্দরবাবুর ষড়যন্ত্রের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কর্ত্রীঠাকরুণ দরখাস্ত করিয়াছেন। মেজেস্টর সাহেব দরখাস্ত পাইয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন।

মেজেস্টর সাহেব বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাবু মাটিতে বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন। তাহার বামভাগে একটি বনাত-মোড়া টেবিল। টেবিলের উপর কতকগুলি হাতীর দাঁতের পুতুল; তাহার পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি চীনে-মাটির পুতুল, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ার রহিয়াছে, বাবুর সম্মুখে আমলাবর্গ বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। মেজেস্টর সাহেব আসিবেন বলিয়া বাবু আজি স্বয়ং কাজকর্ম করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত ও জবাফুলের মত লাল। কথা কহিতে গেলে কথা স্পষ্ট নির্গত হয় না। অনবরত পাখার বাতাস করিতেছেন, তথাপি মুখে মাছি বসা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

বাবুকে দর্শন করিয়াই মেজেস্টর সাহেবের অভক্তি হইল। পরে দুই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু নিজের বুদ্ধিতে কোনটির উত্তর দিতে পারিলেন না। শশিভূষণ যাহা শিখাইয়া দিলেন, তাহাই বলিলেন। মেজেস্টর সাহেব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, শশিভূষণই সর্বময় কর্তা। তদ্দর্শনে মেজেস্টর সাহেব হুকুম দিলেন যে, যত দিন পর্যন্ত সরকার হইতে ম্যানেজার না নিযুক্ত হয়, তত দিন কাছারির কার্য

বন্ধ থাক। আর শশিভূষণ কি প্রকারে জমিদারি শাসন করিয়াছেন, তাহার হিসাব তলব করিলেন।

শশিভূষণের শিরে বজ্রাঘাত হইল; ভবিষ্যতে কাজ করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা হইল না। তাঁহাকে যে পূর্বের হিসাব দিতে হইবেক, এ-ই তাঁহার প্রধান ভয়ের কারণ। যদি তাঁহাকে একেবারে কর্মচ্যুত করিয়া দিত, তাহা হইলে তিনি ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী হইতেন।

শশিভূষণ বিরসবদনে বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন তিনি কাছারি হইতে উঠিলে সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইত, আজি সকলেই নিজ নিজ কর্ম করিতে লাগিল। তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য করিল না। রাস্তা দিয়া বাটী চলিয়া যাইবার সময় দু-ধারের লোকে সেলাম করিল না। শশিভূষণ ভরসা করিয়া উর্ধ্বে দৃষ্টি করিতে পারিলেন না। হেঁটমুখে বাটী আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "সাহেব এসে কি বল্লে?"

শশিভূষণ কহিলেন, "আর কি বলবে? আমার সর্বনাশ করে গেল।"

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "কি সর্বনাশ?"

শশী উত্তর করিলেন, "আমার কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। আর যতদিন বুঝানো শেষ না হবে, ততদিন অন্য কার্যে হাত দিতে পারব না।"

প্রমদা শুনিয়া আর কোন প্রশ্ন বা উত্তর করিলেন না।

সন্ধ্যার পূর্বে শশিভূষণ গিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, আজ আর আমলাবর্গের মধ্যে কেহই আসিল না। এক এক বার দ্বারে শব্দ হয় আর শশিভূষণ উৎসাহে চাহিয়া দেখেন, কিন্তু কি দেখিতে পান? হয়তো চাউলের মহাজন, নতুবা কাপড়ের দোকানদার আপনাপন প্রাপ্য টাকা লইতে আসিয়াছে। রাত্রি ৮টার সময়ে শশিভূষণ আমলাদিগের বাটী লোক পাঠাইয়া দিলেন।

পূর্বে যাহারা তাঁহার বাটী ছাড়িত না, আজি তাহাদের সকলেরই "প্রয়োজন আছে।" কেহই আসিতে পারিবে না। ৯টার সময় শশিভূষণ রামসুন্দরবাবুর বাটীতে গেলেন। সেইখানে গিয়া সকলকে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন। অন্য অন্য দিবসের মত অন্ত আর কেহ উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল না। রামসুন্দরবাবু অগ্রে শশিভূষণের সম্মুখে তামাক খাইতেন না; আজ বুঝি পূর্বক্ষতি পূরণ করিবার জন্যেই অনবরত হুঁকা টানিতেছেন। শশিভূষণ যে তামাক খান, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

শশিভূষণ বসিয়া আছেন। কেহই তাঁহার সহিত কোন কথা কহে না।

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন; তদ্দর্শনে শশিভূষণ কহিলেন, "আমি আপনাদের কাছে এলাম।"

খাতাঞ্চি ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "এত অনুগ্রহ? আমার নিকট কি কোন প্রয়োজন আছে?"

মুহুরি খাতাঞ্চিকে কহিলেন, "আসুন, রাত হলো।"

শশিভূষণ কহিলেন, "একটু অনুগ্রহ করে বসুন। আমি আপনাদের সকলেরই কাছে এসেছি।"

শশিভূষণের কথা শুনিয়া সকলে বসিলেন। শশিভূষণ কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, "আপনারা রক্ষা না করলে তো আমার নিস্তার নাই, তাই আপনাদের শরণ নিতে এলাম।"

রামসুন্দরবাবু উত্তর করিলেন, "আমার সাধ্যই বা কি, ক্ষমতাই বা কি? আমি কেরানী মানুষ; আমার হাতেও কেউ নাই, আমিও কারু হাতে নই।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তা সত্য, কিন্তু এ বিপদে আপনি না রক্ষা করলে আর আমার উপায়ান্তর নাই।"

অন্যান্য যাঁহারা বসিয়া ছিলেন, এই কথা শুনিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; কহিলেন, "তবে আমাদের কাছে কোন প্রয়োজন নাই?"

শশিভূষণ কহিলেন, "আপনাদের সকলেরই কাছে আমার দরবার" এই বলিয়া তিনি গলায় বস্ত্র দিয়া জোড়হস্তে এক পার্শ্বে বসিলেন। শশিভূষণের চক্ষু হইতে ধারা বহিতে লাগিল।

খাতাঞ্চি প্রভৃতি সকলেই শশিভূষণকে গলবস্ত্র দেখিয়া নরম হইলেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, শশিভূষণ চারি জনকে চারি হাজার টাকা দিতে পারিলে তাঁহারা শশিভূষণের অপরাধ ঢাকিয়া লইবেন, কিন্তু এই কড়ারে যে, শশিভূষণের নির্দোষিতা সপ্রমাণ হইলে তিনি স্বেচ্ছাপূর্বক কার্য ত্যাগ করিয়া যাইবেন। শশিভূষণ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"গোপাল কোথায়"

বিপদ কখন একক আইসে না। একবার আসিতে আরম্ভ করিলে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে। হেমচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পরিবারেরা সে কথা

বিস্মৃত হইতে না হইতেই হেমচন্দ্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। সে বৎসর কলিকাতায় ভয়ানক বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং ঐ রোগে বহুসংখ্যক লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। কালেজের একজন সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার তৎকালে কলিকাতার বায়ু পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে বসন্তের পুঁজ দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাহাদের একবার বসন্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদেরও পুনরায় বসন্ত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্রের জ্বর হইয়া তৃতীয় দিবসে তাঁহার শরীরে বসন্তের গুটি দেখা দিল। হেমচন্দ্র গোপালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল, তোমার টীকা হয়েছে?" গোপাল উত্তর করিলেন, "হাঁ হয়েছে।" তখন হেম কহিলেন, "আমার শরীরে বসন্ত দেখা দিয়েছে; তোমরা সাবধান হয়ে থাক।"

গোপাল হেমের শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; দেখিলেন, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ছোট ছোট লাল রঙের ঘামাছির ন্যায় গুটি হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার শরীর কম্পিত হইল। কিন্তু হেমকে কিছু বলিলেন না, নিজে চাদর লইয়া অবিলম্বে ডাক্তারের নিকট গেলেন। ডাক্তারসাহেব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বসন্তই বটে।"

দুই তিন দিবসের মধ্যে হেমের সর্বশরীর স্ফীত হইল। কণ্ঠার বেদনায় কথা কহিতে পারেন না এবং জলটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিবার শক্তি রহিল না। সমস্ত দিবস অনাহারে নীরবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন।

গোপালের আর আহার নিদ্রা নাই। নিয়ত হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। আহারের সময় সেইখানে তাঁহাকে চারিটি অন্ন দিয়া যায়; কোন দিন খান, কোন দিন বা যেমন ভাত তেমনি পড়িয়া থাকে। হেম এক দিবস অতি কষ্টে কহিলেন, "গোপাল, ভাই, তুমি এখানে সমস্ত দিন বসে থেক না, কি জানি যদি তোমার বসন্ত হয়।" গোপাল কোন উত্তর করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, আমার ব্যারামের কথা বাড়ীর কি কারুকে লিখেছ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "না। কাহাকেও লিখি নাই।"

হেম কহিলেন, "তবে আর কারুকে লিখো না।"

একটু পরে গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, বাড়ী থেকে দুখানা চিঠি এসেছে, পড়বে কি?"

হেম উত্তর করিলেন, "তুমি খুলে পড়। পড়ে যে উত্তর লিখতে হয়, লিখে দাও। আমার পীড়ার কথা উল্লেখ করো না।"

গোপাল চিঠি পড়িয়া জবাব দিলেন, "সকলে ভাল আছে।"

ইহার দুই তিন দিবস পরে হেমের আর সংজ্ঞা রহিল না, সমস্ত দিন রাত কেবল প্রলাপ বকেন। তন্মধ্যে স্বর্ণ ও গোপালের নামই অধিক। গোপাল শিয়রে উপবেশন করিয়া ক্রমাগত নেত্রযুগল হইতে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে থাকেন।

শ্যামা আপনার কাজকর্ম সমাধা করিয়া হেমের নিকট সমস্ত দিবস বসিয়া থাকেন। এক দিবস অশ্রুপূর্ণ নয়নে গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এমন হয়ে কেউ কি বাঁচে ?"

শ্যামা উত্তর করিল "ভয় কি? এ তো সামান্য বসন্ত হয়েছে। আমি এর অপেক্ষা কত বেশী বসন্তওয়ালা রোগীকে বাঁচতে দেখিছি।"

গোপাল কহিলেন, "আমার মাথার দিব্বি, বল দেখি বাঁচে কি না ?" শ্যামা কহিল, "আমি মিথ্যা কথা বলছি ? কত লোক এর চাইতে বেশী বসন্ত হয়ে বেঁচে উঠেছে।"

গোপাল ক্ষণকাল অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীরবে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হইল এবং হেমচন্দ্রের বাসার কাছে আসিয়া শব্দ থামিয়া গেল। গোপাল শ্যামাকে কহিলেন, "দিদি, দেখ দেখি, বুঝি ডাক্তারসাহেব এসেছেন ?"

শ্যামা উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ডাক্তারসাহেবই এসেছেন। ডাক্তার সাহেব রোগীর শয্যার নিকট আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া নাড়ীর গতি দেখিলেন। পরে মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, "এরূপ অজ্ঞানের ভাব কতক্ষণ পর্যন্ত হয়েছে ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আজ সকালবেলা পর্যন্ত আর একটিও কথা কন নাই।"

ডাক্তারসাহেব আবার মুখ বক্র করিলেন।

গোপাল ডাক্তারসাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন, "রোগ কি কঠিন হয়েছে ?"

ডাক্তারসাহেব উত্তর করিলেন, "খালি কঠিন নয়, রোগ সাংঘাতিক হয়েছে।"

গোপালের চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ডাক্তারসাহেব কহিলেন, "কেঁদ না। যত্নপূর্বক রোগীর সেবা শুশ্রূষা কর; এখনও বাঁচবার আশা আছে।"

গোপাল আশ্বাসিত হইলেন। ডাক্তারসাহেব যাহা করিতে বলিলেন, সে-সমস্ত লিখিয়া লইলেন এবং ঠিক সেইরূপ রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারসাহেব চলিয়া গেলে গোপাল শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এত দিন বাড়ীতে কোন খবর পাঠাই নাই, কিন্তু এখন আর চুপ করে থাকা যায় না। তুমি কি বল ?"

শ্যামা কহিল, "খবর পাঠান উচিত। যদি এখানে ভালমন্দ ঘটে, তা হলে তাঁরা ভাববেন যে, পরের হাতে পড়ে কিছু শুশ্রূষা হয় নাই, বিনা-চিকিৎসায় বিনা-যত্নে মারা পড়েছে।"

গোপাল শ্যামার কথা শুনিয়া স্বর্ণলতাকে একখানি পত্র লিখিলেন।

স্বর্ণ!

দাদার অত্যন্ত বসন্ত হইয়াছে। এতদিন তোমাদিগকে বলিতে দেন নাই। অদ্য প্রাতঃকাল অবধি তাঁহার এক রকম চৈতন্য নাই বলিলে হয়। ডাক্তার বলিয়াছেন, এখনও জীবনের আশা করা যাইতে পারে। যদি তোমরা আসিতে ইচ্ছা কর, তবে আসিবে, আমি ও শ্যামা যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতেছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পত্র ডাকে পাঠাইয়া গোপালের চিত্তচাঞ্চল্য পূর্বাপেক্ষা অনেক লাঘব হইল। কোন অনিষ্ট হইলে পাছে লোকে বলে, বিনা-চিকিৎসায় কিংবা বিনা-যত্নে মারা পড়িয়াছে, এই ভয়ে তিনি প্রায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন।

গোপাল নিয়তই হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। তাঁহার আহার-নিদ্রা নাই। আর কাহাকেও হেমের নিকট রাখিয়া তাঁহার মন স্বচ্ছন্দে থাকে না। হেম ওষ্ঠ নাড়িলেই তিনি টের পান—কোন্ দ্রব্য চাহিতেছেন। আর কেহই তাহা টের পায় না।

গোপালের চিঠি পাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন। গৃহে যা যেখানে ছিল, সেইখানেই রাখিয়া দুই জনে পালকি করিয়া রেলওয়ে স্টেশনে আসিলেন। কিন্তু কলিকাতার মধ্যে হেমের বাসা কোথায়, তাঁহারা কেহই জানেন না। শ্রীরামপুরের নিকটে তাঁহাদিগের গুরুঠাকুরের বাড়ী। স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "স্বর্ণ, চল আমরা প্রথমে গুরুঠাকুরের বাড়ী যাই। আমি তাঁর বাড়ী চিনি। সেখান থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব।"

স্বর্ণ সম্মত হইলেন। উভয়ে টিকিট লইয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে সন্ধ্যার সময় গুরুঠাকুরের বাটী পৌঁছিলেন।

গুরুদেবের নাম শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি। তিনি স্বর্ণলতার ও তাহার পিতামহীর আগমন শ্রবণ করিয়া আগ্রহ সহকারে দ্বারে গিয়া তাঁহাদিগকে আনিলেন। স্বর্ণলতার পিতামহী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিবলন, "গুরুদেব, হেমের অত্যন্ত পীড়া হয়েছে, জীবন সংশয়। আমরা তার বাসায় যাব। কিন্তু তার বাসা কোথায় তা জানি না। এজন্য আপনার এখানে এসেছি। একজন চাকর যদি সঙ্গে

দেন, তা হলে আমরা অনায়াসে বাসা অনুসন্ধান করে নিতে পারি।” গুরুদেব কহিলেন, “চাকর দরকার কি, আমি নিজেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পীড়াটা কি? তজ্জন্য কিছু দৈবকার্য করলে ভাল হয় না?”

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, “পীড়া বসন্ত। আপনার অভিপ্রায়ে যদি দৈব-শান্তি করলে ভাল হয়, তাই করুন। খরচপত্রের জন্য সঙ্কুচিত হবেন না।” এই বলিয়া অঞ্চল হইতে একখানি ৫০ টাকার নোট খুলিয়া দিলেন।

গুরুঠাকুর আলোকের নিকট গিয়া নোটখানি দর্শন করিলেন। আহ্লাদে হাসি তাঁহার আর অধরে ধরে না, কিন্তু মনোগত ভাব গোপন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, আপাততঃ যা দিয়াছ, তাতেই ব্যয় সমাধা হবে, কিন্তু সমস্ত স্বস্ত্যয়ন যে ঐ খরচে হবে, তাহা আমার বোধ হয় না।”

স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, “আপনি ঐ টাকায় আরম্ভ করুন, এর পর যা লাগবে, তা দেওয়া যাবে।”

ঠাকুরমহাশয় কহিলেন, “তা যেন হলো, কিন্তু আজ রাত্রে তোমরা কি প্রকারে কলিকাতায় যাবে, আমি স্থির করতে পারছি না।”

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, “কেন, আর গাড়ী নাই?”

গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন, “না।”

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, “তবে একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া দিন। আমাদের না গেলেই নয়।”

স্বর্ণলতার পিতামহীর আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া গুরুদেব গঙ্গাতীরে এক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। একটু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “আজ নৌকা যাবে না।”

স্বর্ণলতা ও তাহার পিতামহী অগত্যা গুরুদেবের আলয়ে সে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে সূর্য না উঠিতে উঠিতে উভয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ক্ষণকাল বিলম্বে শশাঙ্কশেখর গাত্রোত্থান করিলেন; এবং শিষ্য বাড়ী আসিয়াছে বলিয়া, কপালময় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কাটিয়া স্বর্ণলতা ও তদীয় পিতামহীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুঠাকুরকে দর্শন পাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শশাঙ্কশেখর “দীর্ঘায়ুরস্তু” বলিয়া উভয়কেই কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “স্বর্ণের টীকা হয়েছে?”

স্বর্ণের পিতামহী উত্তর করিলেন, “আমাদের পুরুষানুক্রমে টীকা নাই। স্বর্ণের টীকা হয় নাই।”

গুরুঠাকুর কহিলেন, "তবে স্বর্ণের কলিকাতায় যাওয়া আমার মতে উচিত বোধ হচ্ছে না।"

স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমরা সেই মতেই কার্য করব।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "তবে স্বর্ণকে আমার বাটী রেখে তুমি কলিকাতায় যাও। নচেৎ স্বর্ণেরও নিশ্চয় বসন্ত হবে।"

স্বর্ণলতার পিতামহী তাহাতে সম্মত হইলেন। স্বর্ণ কহিলেন, "আমি কলিকাতায় যাব, তাহাতে আমার বসন্ত হয় তাও স্বীকার।"

তাহার পিতামহী কহিলেন, "স্বর্ণ, তোমার যাওয়া হয় না। প্রথমতঃ তোমার টীকা হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ গুরুদেব নিষেধ করছেন। এ অবস্থায় তোমাকে কি করে কলিকাতায় নিয়ে যাই?"

স্বর্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। গুরুদেব কহিলেন, "মা, তুমি এখানেই থাক। হেম কেমন থাকে, তুমি প্রত্যহই খবর পাবে।"

স্বর্ণলতা অগত্যা গুরুর আলয়ে বাস করিতে সম্মত হইলেন। শশাঙ্কশেখর স্বর্ণের পিতামহীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় উপনীত হইলেন।

অদ্য তিন দিবস হেমচন্দ্র অজ্ঞান হইয়া আছেন। ডাক্তারসাহেব প্রাতঃকালে নিয়মিতরূপে রোগীকে দেখিতে আসিলেন। হেমের চেহারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে। ডাক্তারসাহেব প্রফুল্লিত হইলেন। ঘড়ি খুলিয়া হাত দেখিয়া কহিলেন, "আর ভয় নাই, এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।"

শুনিয়া গোপাল যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। এমন সময় হেমের পিতামহী ও শশাঙ্কশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌছিবামাত্রই তাঁহারা হেমের শয়নাগারে গমন করিলেন।

হেম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া গোপালকে দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, "গোপাল?"

তাঁহার পিতামহী কহিলেন, "এই দাদা, আমি এসেছি, কি চাও?" এই বলিয়া তিনি শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

হেম কহিলেন, "গোপাল কোথায়?"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি

শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি হেমের পিতামহীকে কলিকাতায় রাখিয়া সেই দিবসই বাটী আসিলেন। স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরকে জিজ্ঞাসিলেন, "দাদাকে কেমন দেখে এলেন?"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "কোন চিন্তা নাই, তাঁর পীড়া অনেক বিশেষ হয়েছে। সত্বরই আরোগ্য লাভ করবেন।"

শশাঙ্কশেখরের কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা অনেক আশ্বস্ত হইলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "আমি সেখানে কবে যেতে পারব?"

শশাঙ্কশেখর উত্তর করিলেন, "তিনি ভাল করে আরোগ্য না হলে তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। কি জানি, যদি তোমারও বসন্ত হয়, কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন স্বর্ণ? তোমার কি এখানে অযত্ন হচ্ছে?"

স্বর্ণলতা আগ্রহ সহকারে উত্তর করিলেন, "না না, আমার কোনই অযত্ন হয় নাই। আমি ভাবছি, দাদার পাছে কোন অযত্ন হচ্ছে। সেইজন্যই আমি যেতে এত ব্যগ্র হয়েছি।"

শশাঙ্কশেখর বলিলেন, "সে বিষয়ে কোন চিন্তা করো না মা; সেখানে যে গোপাল নামে ছেলেটি আছে, সে থাকতে তোমার দাদার কোন অযত্ন হবে না। স্বর্ণ, গোপাল তোমার দাদার যেরূপ সেবাশুশ্রূষা করছে, অমন কেউ কারুকে করে না।"

শশাঙ্কের কথা শুনিয়া স্বর্ণের হৃদয়ে অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তিনি আর কিছু কহিলেন না। শশাঙ্কও তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

বহির্দ্বারে গিয়া শশাঙ্ক আপন ভৃত্যকে দিয়া তাঁহার প্রতিবাসী হরিদাস মুখোপাধ্যায়কে ডাকাইলেন। হরিদাস আসিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে ডাকলে কেন?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "একটা বড় গোপনীয় কথা আছে।"

হরিদাস। এইখানে বলবে, না অন্যত্রে যেতে হবে?

শশাঙ্ক। চল ঐদিকে গিয়া বলি।

উভয়ে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। সূর্যদেব অস্তাচলে চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রাচীদেশ হইতে

পরম রমণীয় কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। বসন্তের সমীরণহিল্লোলে শরীরে অনির্বচনীয় উৎসাহ অনুভূত হইতেছে। কলকল রবে কর্ণ শীতল করিয়া গঙ্গা সাগরসঙ্গমে যাইতেছেন। নিকটবর্তী উদ্যান হইতে নানাবিধ পুষ্পের সৌরভ আসিয়া দশদিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পরম রমণীয় সময়ে কত স্থানে কত লোক ঈশ্বরের করুণায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কিন্তু শশাঙ্ক-শেখর ও হরিদাস সে সময়ে কি পরামর্শ করিতেছেন?

উভয়ে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া ঘাসের উপর উপবেশন করিলেন। হরিদাস জিজ্ঞাসিলেন, "কি কথা বলবে বল। রাত্রি হলো, এর পর সন্ধ্যাহ্নিক করতে হবে।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "এত ব্যস্ত হলে কেন? এসব কি ব্যস্তের কাজ?"

হরিদাস। তোমার কাজই কি, তাই টের পেলাম না; তা কেমন করে জানব ব্যস্তের কি সুস্তের?

শশাঙ্ক কহিলেন, "তবে শুন। আমরা এতকাল যার পরামর্শ করে আসছি, আজ দেবতাই তার আনুকূল্য করেছেন। সেই বর্ধমানের কন্যাটি, যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিবার প্রস্তাব হয়েছিল; সেটি হস্তগত হয়েছে।"

হরিদাস আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "সে কেমন?" শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "বিপ্রদাস জীবিত থাকতেই এ প্রস্তাব করা হয়, তাহা তুমি তো জানই। বোধ হয় বিপ্রদাসের মতও হয়েছিল। আমার কথা সে কখনও লঙ্ঘন করত না। কিন্তু তার পুত্রের জন্যই কার্যটা হতে পারে নাই। সে বৎসর পূজার আগে আমাকে বলেছিল, "আপনি যে আজ্ঞা আমাকে করেছেন, আমার তাহাই কর্তব্য, কিন্তু আমার পুত্রটি এখন যোগ্য হয়েছে, একবার তাহার পরামর্শ লওয়া উচিত।"

হরিদাস কহিলেন, "ওসব কথা তো বহুকাল শুনেছি, এখন কিছু টাট্‌কা থাকে, তবে বল।"

শশাঙ্ক। অত ব্যস্ত হইও না। এসব ব্যস্তের কাজ নয়। আমি যা বলি, মনোযোগপূর্বক শোন। সেই পূজার পর যখন আমি গেলাম, তখন বিপ্রদাস কহিল, "মহাশয়, আমার কোন অপরাধ নাই। আমি নিজে বৃদ্ধ লোক; এখন উপযুক্ত পুত্রের কথা না-শোনা ভাল নয়। হেমের কোনমতেই ইচ্ছা নয় যে, আপনার প্রস্তাবিত কর্ম করা হয়।"

হরিদাস। তারপর।

শশাঙ্ক। তারপর তো তুমি জানই। কত স্থান হতে সম্বন্ধ এল, কত স্থান হতে ফিরে গেল। বিপ্রদাসের ইচ্ছা এই, পাত্রটির আর কোন গুণ থাকে না-থাকে,

ঐশ্বর্য থাকলেই হলো। আর ইংরাজিতে দু-চারটা কথা বলতে পারলেই হলো। আজকাল যে সকলেরই দালান গোত্র ইংরাজি গাঁই চাই।

হরিদাস। আমার ছেলে ইংরাজিও জানে। আমার বাড়ীতে দালানও আছে, তবে আমার ছেলের সহিত হলো না কেন?

শশাঙ্ক। হাঁ, যা বলছ যথার্থ। কিন্তু আমি পুর্বেই তো বলেছি, এতে বিপ্রদাসের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিপ্রদাস এমনি পুত্রবৎসল যে, সেই পুত্রটির কথাতেই ভুলে গেল। তাহার মত এই, স্বর্ণের টাকার ভাবনা নাই। বাপের মৃত্যুর পর যে ধনের উত্তরাধিকারিণী হবে, তাতেই যথেষ্ট। কিন্তু পাত্রটির লেখাপড়া ভালমতে জানা চাই ও দেখতে শুনতে ভাল হওয়া চাই।

হরিদাস। তাতেও আমার ছেলে ফেলা যায় না। ইংরাজিতে বি. এ. পাস করেছে, দেখতে শুনতেও দশটির মধ্যে একটি।

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া কহিলেন, "সে তোমার চক্ষে। যদি সকলেই তোমার চোখ দিয়ে দেখত, তা হলে আর তোমার ছেলের ভাবনা কি?"

হরিদাস কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন, "কেন, কেন? আমার চক্ষে কেন?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "চোটো না। চটবার প্রয়োজন নাই, আমরা যে কাজ হাতে নিয়ে বসেছি, ব্যস্তসমস্ত কিংবা চটাচটি করলে এ সমাধা হবার নয়। তোমার ছেলে মন্দ, তা আমি বলছি না। সে যে দশটির মধ্যে একটি, তাও মিথ্যা নয়। পৃথিবীতে কত কুরূপ আছে, তা বলা যায় না। তাদের মধ্যে ছেড়ে দিলে, দশটি কেন, হয়ত ৫০টির মধ্যে তোমার ছেলে একটি হতে পারে।" এইসময় আবার হরিদাসের চক্ষু গরম দেখিয়া শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "চোটো না। এ চটবার কাজ নয়। আর যা বলি, মনোযোগ করে শোন।"

হরিদাস কহিলেন, "আচ্ছা, বল বল।"

শশাঙ্কশেখর পুনর্বার আরম্ভ করিলেন, "হেমের মত ছিল, যেটির সঙ্গে বিবাহ দেয়, সেটির কাছে তোমার পুত্র বানরটি।"

হরিদাস রাগত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, বিবেচনা করে কথা কবেন।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "আমি অবিবেচনার কোন কথা বলি নাই। তুই সেই ছেলেটিকে দেখ নাই, সেইজন্য এমন কথা বলছ। আমি তাকে দেখেছি। ছেলেটি যেন কার্তিকবিশেষ। লেখাপড়াতেও বিলক্ষণ চতুর। ছেলেটির সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ দেবার জন্য হেমের ইচ্ছা ছিল। বুঝতে পেরেছ তো? ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই বল্লেই হয়; কারণ, যার ইচ্ছা ছিল, সে-ই এক্ষণে বসন্তরোগে শয্যাগত। এখন তখন। যদি সে পাত্রটির ঐশ্বর্য থাকিত, তা হলে তো এতদিন

বিবাহ হয়েই যেত। কিন্তু তা যেখানে হয় নাই, সেখানে আর না হবারই সম্ভব।”

হরিদাস আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, “কিসে টের পেলে না-হবার সম্ভব আছে।”

শশাঙ্ক কহিলেন, “এইজন্য বলি, যদি হেমের মৃত্যু হয়, তা হলে তার পিতামহী এ কর্ম করবে না। তার ইচ্ছা টাকা। যে বরের টাকা বেশী, তাহারই সহিত বিবাহ দেবে। আর বোধ হয় আমি একটা অনুরোধ করলেও রাখতে পারে। এখন তোমার ভরসা হেমের মৃত্যু; যদি হেম মরে, তা হলে নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ায়ে দিতে পারব।”

হরিদাস কহিলেন, “কে কত দিন বাঁচে, তার তো স্থিরতা নাই। কত লোক অন্তর্জল হতে ফিরে আসে। আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে যে, যে—”

গুরুঠাকুর মহাশয় শিষ্যদিগের বড় হিতৈষী কিনা, তিনি অবলীলাক্রমে হেমের মৃত্যুর কামনা করিলেন। হরিদাসের মনে মনে যে ভাব, তাহা তো জানাই গিয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রকাশে তিনি অমন দুরূহ কথাটি কহিতে পারিলেন না।

শশাঙ্কশেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, “যা বল্লাম, তা যদি ঘটে, তবে তো কোন কথাই নাই; কিন্তু তা না ঘট্‌লেও আর এক উপায় আছে; তাতে তুমি সম্মত আছ কি না?”

হরিদাস কহিলেন, “সকলে প্রাণে প্রাণে বজায় থেকে যদি কোন উপায়ে শুভ কর্ম হতে পারে, আমার মতে তাই করা কর্তব্য। তাতে কিঞ্চিৎ কষ্ট, কি ব্যয় বেশী হলেও আমি কাতর হব না।”

শশাঙ্ক কহিলেন, “হেমের পীড়া এক্ষণে সাংঘাতিক বলতে হবে। তিন-চারি দিবসের মধ্যে, কি হবে টের পাওয়া যাবে। যদি অধোগতি দেখা যায়, তবে তো কথাই নাই। সেইখানে বসে দুই চারি বিন্দু চোখের জল ফেলতে পারলেই কাজ হাঁসিল হলো; কিন্তু যদি ক্রমশঃ আরোগ্য দেখা যায়, তা হলে আমার মতে গোপনে বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য।”

হরিদাস কহিলেন, “গোপনে বিবাহ কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে? বড়মানুষের মেয়ে, একে আনা আর বামী শামীকে আনা সমান নয় তো? সে দিবস আমার এক প্রজার বিবাহ দিলাম। কন্যাটি তার বাপের সহিত শুয়ে ছিল। নিতান্ত শৈশব, পাঁচ বৎসর বয়স। অনায়াসে দুয়ার ভেঙ্গে তার বাপকে তিন চারি জনে ধরে রইল, মেয়েটিকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও গোটা দুই পুতুল দিয়ে কাজ সমাধা করে দেওয়া গেল। কিন্তু এ স্থলে তো আর সেটি খাটবে না। পাত্রী কি প্রকারে হস্তগত করবে?”

শশাঙ্ক কহিলেন, “পাত্রী হস্তগত করা আমার ভার রইল। টাকা হলে বাঘের

দুধ পাওয়া যায়। তুমি খরচ করতে যদি কুণ্ঠিত হও, সে দোষ তোমার। আমার হবে না। তোমার টাকা চাই আর সাহস চাই। আমার কৌশল চাই।"

হরিদাস। তা তো আমি বুঝি, কিন্তু তুমি কি কৌশলে মেয়েটিকে আনবে বল দেখি? তারপর অন্য সব কথা।

শশাঙ্ক। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হলো না? আমি বল্লাম, মেয়ে আনা আমার ভার রইল; তুমি এখন টাকার কথা বল।

হরিদাস। আগে আমি কন্যাটি দেখতে চাই, কিংবা কি উপায়ে আনবে তা শুনতে চাই, পরে যদি সঙ্গত বোধ হয়, তবে আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হব।

হরিদাস শশাঙ্কের প্রতিবাসী বলিয়া তাঁহার চরিত্র বুঝিতেন। প্রবঞ্চনা করিয়া লোকের নিকট হইতে টাকা লওয়া শশাঙ্কের নিত্যকর্ম। এইজন্যই তিনি এত সতর্কতাপূর্বক কথা কহিতেছিলেন।

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "আমি বলেছি, তোমার মেয়ের জন্যে ভাবনা নাই, তুমি টাকার কথা বল, তবু তুমি শুনবে না। তুমি টাকার কথা কইলেই তো আর আমি পেলাম না। আগে বন্দোবস্ত কর। তুমি কন্যা দেখে আমাকে টাকা দিও।"

হরিদাস কহিলেন, "হাঁ এ কথা সঙ্গত বটে। কিন্তু টাকার কথা তুমিই বল। তোমার যা বিবেচনা হয়, আমি তাই দেব।"

শশাঙ্ক কহিলেন, "এ তো বাজারের দর নয়। এর তো মূল্য নাই। আমি যৎ-কিঞ্চিৎ পেলেই সাহায্য করব।"

হরিদাস শশাঙ্কের কথায় ভুলিবার লোক নন। যদি তাঁহার চরিত্র না জানিতেন, তাহা হইলে এমন কথা শুনিলে ভাবিতেন যে, যথার্থ অল্প টাকায় শশাঙ্ক সম্মত হইবেন। কিন্তু গুরুদেবের চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তিনি ইহাতে হর্ষিত হইলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন, "তা বটেই তো।"

শশাঙ্ক। তা বটেই তো বলে যে চুপ করলে? কাজের কথা কও।

হরিদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "শুভকর্ম সমাধা হলে আপনাকে এক হাজার টাকা দেব।" এই বলিয়া শশাঙ্কের মুখের দিকে চাহিলেন।

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন, "ভায়া, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছ না কি?"

হরিদাস কহিলেন, "কেন কেন?"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "বলি উইলখানায় কত টাকা আছে, তা জানা আছে তো?"

হরিদাস। উইলের টাকা আর জলের মাছ সমান। হাতে না আসলে বিশ্বাস না। সেই টাকা পাব বলেই কি আমি এ বিবাহে এত যত্নবান হয়েছি মনে করলে?

শশাঙ্ক। না, তা মনে করব কেন, তা মনে করব কেন! কন্যাটির বিবাহ হচ্ছে না, কেউ গ্রহণ করতে চায় না, নানান দোষ আছে; তাই তুমি অনুগ্রহ করে তোমার ছেলের সহিত বিবাহ দিতে চাচ্ছ।

চাতুরিতে হরিদাস কম নন; শশাঙ্ক তো সে বিদ্যায় বিশারদ। "শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।"

হরিদাস কহিলেন, "না, তা নয়, তা নয়।"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "তাই বটে। মেয়েটির বিবাহ হচ্ছে না, তুমি কৃপা করে ক্ষতি স্বীকার করে আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিবে। আর আমি কন্যাটির পক্ষে একটু উপকার করব বলে আমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকার করছ। তুমি একজন পরম দয়াবান দেশহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তি কি না?"

হরিদাস বলিলেন, "আমি ঠাট্টা করেছিলাম।"

শশাঙ্ক। তবে এখন ঠাট্টা ছেড়ে প্রকৃত কথা কও।

হরিদাস। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব।

শশাঙ্ক। এবারও ঠাট্টা হলো। এবার ঠাট্টা ছাড় না?

হরিদাস বললেন, "না, এবার ঠাট্টা করি নাই। মনে কর, পনের হাজার টাকার অধিক আর উইলে নাই। কিন্তু প্রথমতঃ এই চুরি করে বিবাহ দিয়ে তা নিয়ে মোকর্দমা করতে হবে; পরে যদি উইলে কোন গোলমাল হয়—যদি কেন? হবেই নিশ্চয়। হেম কিছু সহজে পনের হাজার টাকা ছেড়ে দেবে না। তা নিয়ে কত মামলামোকর্দমা করতে হবে; এ ছাড়া হাজার অন্য খরচ আছে। মনে কর দেখি, সে সব বাদ দিলে আমার কি কিছু থাকবে? অগ্রপশ্চাৎ দেখতে হয়।"

শশাঙ্ক। তোমার মোকর্দমা করতে হবে, আর আমি কি ফাঁকে যাব নাকি? সে হেমও ইংরাজিম্যান। সে গুরুপুরুত কেয়ার করে না। তাদের সঙ্গে দেখা করতে এখন ভয় হয়, পাছে প্রণাম না করে। সে কি আমাকে সহজে ছাড়বে? তবে যদি পেটে খাই তো পিঠে সবে। আমি এক কথা বলে যাই, যদি অর্ধেক দিতে পার, তবে এর মধ্যে আছি, নচেৎ না।

হরিদাস। তা পারি নে।

শশাঙ্ক। তবে আর ও বিষয়ে কথা বলে ফল কি? চল যাই।—এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; হরিদাস তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে বিবেচনা করে কাল বলব। এখন তুমি মেয়ে কেমন করে আনবে বল দেখি?"

শশাঙ্ক। মেয়ে আমার ঘরেই আছে।

হরিদাস। না?

শশাঙ্ক। যথার্থ, আমি এই গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা কি মিথ্যা বলছি?

হরিদাস। যাবার সময় দেখাতে পারবে?

শশাঙ্ক। হাঁ, পারব।

এই কথার পর শশাঙ্ক ও হরিদাস উভয়ে গঙ্গাতীরে নামিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন।

যাহার যে ব্যবসায়, তাহার তাহাতে ভক্তি হয় না। গয়লারা দুগ্ধ খায় না, ময়রারা সন্দেশ খায় না, চিকিৎসকেরা ঔষধ খায় না, শুঁড়ীরা মদ খায় না, আর যদি লোকজন সম্মুখে না থাকে, তবে ভট্টাচার্যরা সন্ধ্যাহ্নিক করেন না।

শশাঙ্ক গঙ্গাতীরে দু-এক বার জল নাড়িয়া কহিলেন, "হরিদাস, চল যাই। সংক্ষেপে সেরে নাও।"

পূজা করা হরিদাসের ব্যবসায় নহে, সুতরাং তিনি প্রতি দিন যেরূপ করিয়া জপ করেন, অদ্যও সেইরূপ করিয়া, উভয়ে একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন।

রাস্তায় শশাঙ্কশেখরের বাটী গিয়া হরিদাস স্বর্ণলতাকে চাক্ষুষ দেখিয়া প্রত্যয় করিলেন, "কন্যা যথার্থই হস্তগত হইয়াছে।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"আনায় মাঝারে"

হেমচন্দ্র এক্ষণে আরোগ্য হইতে লাগিলেন। আজ যেরূপ থাকেন, কাল তদপেক্ষা ভাল হন। কিন্তু এ পর্যন্ত বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিতে পারেন নাই। গোপাল পূর্ববৎ সমস্ত দিন রাত্রি হেমের শয্যার নিকট বসিয়া থাকেন। হেম আর কাহারও নিকট কিছু চান না। গোপাল তাঁহাকে খাওয়াইবে, তাঁহার হাত ধুইয়া দিবে, তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া বসাইবে, তাঁহার সহিত গল্প করিবে। গোপাল হেমের জীবনসর্বস্ব।

শশাঙ্কশেখর প্রত্যহ রেলগাড়ীতে কলিকাতায় যান, আবার সন্ধ্যার সময় বাটী আইসেন। হেমের পিতামহীর কৃতজ্ঞতা আর রাখিবার স্থান নাই, কিন্তু শশাঙ্ক কি অভিপ্রায়ে প্রত্যহ আইসেন যান, তাহা তো টের পান না!

স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরের নিকট কতই কৃতজ্ঞ হইতেছেন। অন্য লোককে বিশ্বাস না করিয়া প্রত্যহ আপনি গিয়া হেমচন্দ্রের খবর আনেন। ইহা অপেক্ষা দয়ার কার্য

আর কি হইতে পারে? শশাঙ্কের আসিবার সময় হইলে স্বর্ণলতা বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকেন। শশাঙ্কশেখরকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। এক দিবস স্বর্ণলতা কহিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, আপনার ঋণ আমি এ জন্মে দূরে থাকুক, জন্ম-জন্মান্তরেও পরিশোধ করতে পারব না। আপনি প্রত্যহ এত কষ্ট স্বীকার করে খবর আনেন বলেই বোধ হয় আমি এত দিন এখানে আছি। তা না হলে হয়ত এতদিন লুকিয়ে কলিকাতায় যেতাম।" শশাঙ্কের দয়ার কথা কহিতে কহিতে স্বর্ণলতার চক্ষু হইতে দু-এক বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি কথায় যেন শশাঙ্কের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। দস্যুরা কোন বাটী আক্রমণ করিবার সময় বালকদিগকে কিছু বলে না। মৎস্য ধরিতে বসিলে লোকে ছোটগুলিকে পুনরায় জলে ছাড়িয়া দেয়। শশাঙ্ক অতিশয় নিষ্ঠুর হইলেও সরল-হৃদয়া স্বর্ণলতার কথায় তাহার অন্তঃকরণ দমিয়া গেল। একবার আত্মগ্লানিও উপস্থিত হইল। স্বর্ণের চক্ষের জল যেন উত্তপ্ত দ্রবীভূত লৌহবিন্দুর ন্যায় শশাঙ্কের হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল।

কিন্তু মরুভূমিতে সিঞ্চিত বারি কতক্ষণ থাকে? স্বর্ণলতা তথা হইতে চলিয়া গেলেই আবার যে শশাঙ্ক, সেই শশাঙ্কই হইলেন। রজতের মোহিনী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তিনি হরিদাসের বাটী গমন করিলেন। দেখিলেন, হরিদাস বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "কি মহাশয়, বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করেছেন না কি?"

হরিদাস কহিলেন, "আসুন; আমি জমাখরচটা লিখে রাখছিলাম।"

শশাঙ্ক কহিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং। এদিকে আর সময় নাই। আর এক সপ্তাহ দেরি করলে সব অভিসন্ধিই মিথ্যা হবে।"

হরিদাস কহিলেন, "আমার কোন দেরি নাই। কিন্তু তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ দেখে আমি অগ্রসর হতে পারছি না। উইলের অর্ধেক টাকা আমার দেবার শক্তি নাই।"

শশাঙ্ক দেখিলেন, দেরি করিলে কিছুই পাওয়া যাইবে না। অতএব যা হাতে আইসে, সেই ভাল। এই ভাবিয়া কহিলেন, "তবে তুমি কি দিতে ইচ্ছা কর?"

হরিদাস। আমি ছয় হাজার দিতে চাই।

শশাঙ্ক তাহাতেই সম্মত হইলেন; কহিলেন "তবে পাত্রের গায়ে হলুদ দাও, পরশ্ব দিবস শুভকর্ম সম্পন্ন করা যাইবেক।"

যেমন বিহঙ্গম ব্যাধবিন্যস্ত জালের মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে নৃত্য করিয়া বেড়ায়, স্বর্ণলতা তেমনি প্রফুল্লচিত্তে শশাঙ্কের বাটীতে বাস করেন। হেম প্রত্যহ আরোগ্য

হইতেছেন ; তাঁহার সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইতেছে না, স্বর্ণের আর ভাবনা কি ? প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গুরুকন্যা ও প্রতিবাসী সমবয়স্ক বালিকাদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে আরম্ভ করেন। স্নানাহারের পর পানভোজন করিয়া রাত্রে প্রফুল্লচিত্তে নিদ্রা যান। তিনি যে "আনায় মাঝারে" নিপতিত হইয়াছেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না।

সন্ধ্যা হইল। শশাঙ্ক গঙ্গাতীরে নিত্যসায়ংক্রিয়া সমাধা করিতে গেলেন। শশাঙ্কের একটি ছোট ছেলে অত্যন্ত রোদন করিতেছে। স্বর্ণলতা কাছে না বসিলে সে বিছানায় শুইবে না। শশাঙ্কের স্ত্রী বিস্তর চেষ্টা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইতে না পারিয়া স্বর্ণকে ডাকিলেন। স্বর্ণ দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাকে ডাকলে কেন ?" শশাঙ্কের স্ত্রী গুরুপত্নী ; স্বর্ণ তাহাকে মাতৃসম্বোধন করেন।

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, "মা, এস দেখি একবার ; এ ছেলেটার কাছে বসো, একে তো বিছানায় শোয়াতে পারি না।"

স্বর্ণলতা নিকটে গেলে ছেলেটি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া শয়ন করিল। স্বর্ণলতাও সে বিছানায় শয়ন করিলেন। ঝিরঝির করিয়া বসন্তের বাতাস তাঁহার গায়ে লাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা আস্তে আস্তে নিদ্রিত হইলেন।

শশাঙ্ক নিয়মিত সময়ে বাটী আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন। উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলে শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকার কাছে শুল্লে কে ?"

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, "স্বর্ণ।"

শশাঙ্ক। জেগে আছে, না ঘুমিয়েছে ?

স্বর্ণ, শশাঙ্ক বাটী আসিবামাত্র জাগ্রত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছেন শুনিয়া কপট-নিদ্রিত হইলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী স্বর্ণের কাছে আসিয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "ঘুমিয়েছে।"

শশাঙ্ক। (অস্ফুট স্বরে) তবে তুমি একবার আস্তে আস্তে এইদিকে এস।

শশাঙ্কের স্ত্রী অগ্রসর হইলেন। শশাঙ্ক মৃদুস্বরে দুইটা চাবি দেখাইয়া কহিলেন, "এই দুইটা চাবি দেখছ, একটা সদরে, একটা খিড়কির। আমি দু-দিকেরই দ্বার বন্ধ করেছি ; দেখো, যেন বাড়ী হতে অন্য কোনরূপে বাহির হতে না পারে।"

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, "সেকি ? বাড়ী থেকে বেরোবে কেন ?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "তোমার সে কথায় কাজ কি ?"

শশাঙ্কের স্ত্রী। আমার কাজ আছে। আমাকে বলতে হবে, না বল্লে আমি এখনই একথা প্রকাশ করে দেব।

শশাঙ্ক সমুদয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহার স্ত্রী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

এবং স্বর্ণলতার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। শশাঙ্কের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে শশাঙ্ক কহিলেন, "তুমি তো আমাকে জানই; যদি তোমা কর্তৃক আমার মনস্কামনা বিফল হয়, তা হলে তোমাকে—।" এতদূর পর্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া, পরে অস্ফুট. স্বরে দুই-তিনটি কথা কহিয়া শশাঙ্ক বহির্বাটিতে গমন করিলেন।

স্বর্ণের যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু জাগ্রত থাকিয়া কি প্রকারে নিদ্রাভঙ্গের ভান করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, ক্রোড়স্থ শিশুটির গায়ে একটি টিপ দিলেন। ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কাতর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "মা, তুমি ঘুমিয়েছিলে?" স্বর্ণ "হাঁ" বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। খিড়কির দ্বারে গিয়া দেখেন, দ্বার রুদ্ধ। দৌড়িয়া সদর দরজায় গেলেন। সদর দরজা বাহির দিক হইতে বন্ধ দেখিলেন। স্বর্ণলতা যেন পিঞ্জরে বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় হইলেন। এতদিন ঐ বাড়ীর মধ্যে ছিলেন, তাহাতে কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। কিন্তু আজি তথাকার বায়ু তাঁহার নিকট বিষময় বোধ হইতে লাগিল, সে বায়ু সেবন করিয়া জীবন ধারণ করা ক্লেশকর হইয়া উঠিল। দৌড়িয়া যে ঘরে ছিলেন, পুনরায় সেই ঘরে আসিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী স্বর্ণলতাকে দেখিয়া ভরাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মূর্তি এতই পরিবর্তন হইয়াছে। স্বর্ণলতা অবশেন্দ্রিয়ের মতন হইয়া ঘরের মেজেয় বসিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি মা, ক হয়েছে?"

স্বর্ণ আর মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "আমি সকলি শুনেছি। আমারে তোমরা মেরে ফ্যালো। বিষ খাওয়ায়ে দাও।"

স্বর্ণের কথা শুনিয়া শশাঙ্কের স্ত্রীর অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া গেল। ফলতঃ তিনি তাঁহার স্বামীর ন্যায় নির্দয় ছিলেন না। শয্যা হইতে উঠিয়া স্বর্ণের নিকট উপবেশনপূর্বক স্বর্ণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি কেঁদ না মা, আমি তোমার উদ্ধারের উপায় করে দেব।"

শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা শুনিয়া স্বর্ণ অমনি তাঁহার পা ধরিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি সাদরে স্বর্ণকে ভূমি হইতে তুলিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। কহিলেন, "মা, তুমি তো লেখাপড়া জান?"

স্বর্ণ কহিলেন, "একটু একটু জানি।"

"পত্র লিখতে পারবে তো?"

"পারব; কিন্তু কাকে লিখব? দাদার বিছানা হতে উঠিবার জো নাই। তাঁহাকে লেখাও যে, না-লেখাও সেই।"

"আর কোন লোক নেই? যাকে লিখলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া স্বর্ণের মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। মাটির দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "আর কাকেই বা লিখব।"

"এই যে শুনেছি, তোমাদের বাসায় আর একটি কে থাকে? কি না তার নামটা? গোপাল। হাঁ হাঁ, গোপালকে লেখ না কেন?"

স্বর্ণের মুখ আরও লাল হইল। তিনি কহিলেন, "না, দাদাকেই লিখি, তা হলে তিনি দেখতে পাবেন।"

"তোমার দাদাকে লেখায় লাভ কি? তিনি তো শয্যাগত।"

স্বর্ণলতা মাটির দিকে মুখ করিয়া কহিলেন, "দাদাকে লিখলে গোপাল দাদা দেখতে পাবেন।"

শশাঙ্কের স্ত্রী কালি কলম কাগজ আনিয়া দিলেন। স্বর্ণলতা চিঠি লিখিলেন।

পরদিবস প্রাতে যখন শশাঙ্কের দাসী বাজার করিতে যায়, চিঠিখানি গোপনে লইয়া গিয়া ডাকঘরে দিয়া আসিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গোপালের কারাবাস

পোস্ট-অফিসের সনাতন নিয়মানুসারে অগ্রে সাহেবদিগের চিঠি বিলি হয়, তৎপরে যদি সময় থাকে এবং যদি মহানুভব হরকরা মহোদয় ক্লান্ত না হন, তাহা হইলে অন্যান্য সকলের চিঠি বিলি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি হরকরা মহাশয় ক্লান্ত হন, বিশেষ যদি দূরের কোন স্থানের একখানি চিঠির অতিরিক্ত না থাকে, তবে সুবিবেচক হরকরা সে চিঠিখানিকে ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দেন। ক্রমে সেই স্থানের দশ পাঁচখানি একত্র হইলে এক দিবস অপরাহ্ণে গজেন্দ্রগমনে সেগুলিকে বিলি করিতে যান। স্বর্ণলতা যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, সাধারণ নিয়মানুসারে সেখানি পরদিবস প্রাতেই হেমের বাসায় পৌঁছান উচিত ছিল; কিন্তু উল্লিখিত সনাতন নিয়মের কোন এক "ধারার মর্মে" চিঠিখানি দেরি করিয়া তিনটার সময় দর্শন দিল। চিঠিখানির শিরোনামায় হেমের নাম। গোপাল ইতিপূর্বে স্বর্ণলতার হস্তাক্ষর দেখেন নাই। বাটী হইতে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসিত, তাহা বাটীর গোমস্তাই লিখিত। সুতরাং এখানি বাটীর চিঠি নয় ভাবিয়া তিনি খুলিলেন না। হেম নিদ্রিত আছেন, তাঁহাকেও জাগাইলেন না।

একটু পরে হেমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গোপাল চিঠিখানি হেমের হস্তে দিলেন। শিরোনামা দেখিয়া হেম কহিলেন, "স্বর্ণের চিঠি, গোপাল।" গোপাল কম্পিতকরে চিঠিখানি গ্রহণ করিয়া মনে মনে পাঠ করিলেন। কিন্তু কি পড়িলেন, হেমকে কহিলেন না। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কি লিখেছে?"

গোপাল তাচ্ছিল্য করিয়া চিঠিখানি খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আর কি লিখবে, তুমি কেমন আছ তাই জিজ্ঞাসা করে পাঠায়েছে।"

হেম সন্তুষ্ট হইয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইলেন, কিন্তু তখন যদি গোপালের মুখপানে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখ জবাফুলের ন্যায় লাল ও কপালে ঘর্ম দেখিতে পাইতেন। "আমি আসি" বলিয়া গোপাল চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া নীচে হেমের পিতামহীর নিকট আসিলেন এবং শ্যামাকে হেমের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পরে চিঠিখানি হেমের পিতামহীকে পড়িয়া শুনাইলেন। হেমের পিতামহী শুনিয়া রাগে কম্পিতকলেবরা হইয়া গুরুদেবকে গালি দিতে লাগিলেন।

গোপাল কহিলেন, "আপনি অত গোলমাল করবেন না। দাদা শুনলে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন। আমি চল্লাম, চারটা বেজেছে, ছটার সময় বিবাহ। এখনি না গেলে গাড়ী পাব না।" এই বলিয়া একখানি চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া ও একগাছি ছড়ি লইয়া হেমের পিতামহীকে পুনরায় কহিলেন, "আপনি এ কথা কারুকেও কইবেন না। আপনি এইখানেই থাকুন, নচেৎ উপরে গেলে প্রকাশ করে ফেলবেন। দাদা আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, আমার কোন নিজের বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ ভবানীপুরে চল্লাম। হয়ত আসতে পারব না।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আমাকে কিছু খরচ দিন। শীঘ্র, দেরি না হয়।"

পিতামহী বাক্স খুলিয়া একখানি নোট দিলেন। গোপাল নোটখানি পকেটে রাখিয়া দৌড়িয়া ঘরের বাহির হইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন, একখানি খালি গাড়ি যাইতেছে। গাড়োয়ানকে কহিলেন, "আমাকে গাড়ী ছাড়বার আগে যদি হাবড়া-ঘাটে পৌঁছিয়ে দিতে পার, তবে তোমাকে ভাল বকশিশ দেব।"

গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল। গোপাল অবিলম্বে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিবামাত্রই গাড়ী প্রবল বেগে চলিল। দেখিতে দেখিতে হাবড়া-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল হাবড়া-ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ষ্টীমার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। পকেট হইতে নোটখানি বাহির করিয়া দেখেন

কুড়ি টাকার। গাড়োয়ানকে কহিলেন, "তোমার কাছে টাকা আছে? সে কহিল, "না"।

নিকটে একজন ভাগে ভাগে পয়সা রাখিয়া বিক্রয় করিতেছে। গোপাল নোটখানি তাহাকে দিয়া কহিলেন, "আমাকে পনের টাকা আর গাড়োয়ানকে পাঁচ টাকা দাও।" টাকাগুলি লইয়াই দৌড়িয়া ঘাটে গেলেন। দোকানী গাড়োয়ানকে পাঁচ টাকা দিল।

গোপালও নদীর ধারে গেলেন, অমনি ষ্টীমার "হুস হুস" করিয়া যেন তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গোপাল নিরুপায় ভাবিয়া একখানি নৌকায় উঠিলেন। মাঝিকে কহিলেন, "গাড়ী ছাড়বার পূর্বে যদি আমাকে পার করে দিতে পার, তাহলে তোমাকে এক টাকা বকশিশ দেব।" এই বলিয়া টাকাটি ফেলিয়া দিলেন।

মাঝি কহিল, "হয় কর্তা, তা পারমু। আপনি বৈসেন।'' এই বলিয়া টাকাটি কুড়াইয়া লইয়া নৌকা খুলিয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার পূর্বক্ষণ, বংশীধ্বনিসদৃশ শব্দ হইতেছে, এমন সময় নৌকা কূলে লাগিল। গোপাল তদ্দণ্ডে লাফ দিয়া তীরে উঠিয়া যাইবেন, কিন্তু মাঝিরা আসিয়া ভাড়া চাহিল। গোপাল কহিলেন, "একবার দিয়েছি তো?"

মাঝি কহিল, "হয় কর্‌তা, ও তো বক্‌শিশ দিছেন। এখন ভাড়া দ্যান্ না।"

গোপাল মাঝির কথা শুনিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। গাজি বন্দরের চর গোপালের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল।

গোপাল পকেট হইতে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিলেন। তিনিও ষ্টেশনে পৌঁছিলেন, গাড়ীও ছাড়িল। গোপাল দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া লাফ দিয়া গাড়ীর চরণাধারে চড়িলেন এবং পরক্ষণেই দুয়ার খুলিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। টিকিট লওয়া হইল না।

গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গোপালের মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং সর্বাঙ্গ শরীর অবশ হইয়া আসিল। হেমের পীড়া হওয়া অবধি তাঁহার সুচারুরূপে আহার নিদ্রা হয় নাই। তদ্ব্যতীত রেলওয়ে আসিতে যে কষ্ট হইয়াছিল, এই সমস্ত কারণে গোপাল মূর্ছিত হইবার উপক্রম দেখিয়া গাড়ীতে শয়ন করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে সমীরণ সঞ্চালনে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। গোপাল নিদ্রিত হইলেন।

কোথায় বা শ্রীরামপুর, কোথায় বা স্বর্ণলতা! গোপাল নিদ্রা যাইতেছেন। এমন গাঢ় নিদ্রা গোপালের কখনও হয় নাই। কত স্থানে গাড়ী থামিল, কত নূতন লোক আসিল, কত পুরাতন লোক চলিয়া গেল, গোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

রাত্রি নয়টার সময় গাড়ী গিয়া বর্ধমানে উপস্থিত হইল। জনৈক রেলওয়ের কর্মচারী এক এক করিয়া গাড়ী খুলিয়া টিকিট লইতেছে। লোকজন চতুর্দিকে গোলমাল করিতেছে। তথাপি গোপালের ঘুম ভাঙ্গে না। পরে যে গাড়ীতে তিনি ছিলেন, রেলওয়ে কর্মচারী তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে আলোক নিক্ষেপ করিল। গাড়ীতে এক মাত্র গোপাল। রেলওয়ে কর্মচারী "বাবু" "বাবু" বলিয়া দুইচারি বার ডাকায় গোপাল উঠিলেন। "এই শ্রীরামপুর?"

কর্মচারী কহিল, "তুমি স্বপ্ন দেখছ নাকি? এ বর্ধমান।"

কর্মচারীর কথা শুনিয়া গোপালের মাথা ঘুরিয়া গেল; মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ড দেখিলেন। যেমন বসিয়া ছিলেন, অমনি বসিয়া রহিলেন। উঠিবার শক্তি রহিল না।

কর্মচারী কহিল, "এখন এস, টিকিট দাও।"

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমার কাছে টিকিট নাই। দাম লও।"

কর্মচারী কহিল, "টিকিট নাই অনেকক্ষণ টের পেয়েছি; এখন চল স্টেশনে সাহেবের কাছে চল।" এই বলিয়া তাহার হস্তধারণপূর্বক স্টেশনে লইয়া চলিল।

কিন্তু সাহেব তৎকালে তথায় উপস্থিত না থাকায় বড়বাবু গোপালকে সে রাত্রি গারদে রাখিবার জন্য হুকুম দিলেন।

সে রাত্রি গোপালের কষ্ট অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু বর্ণনাতীত। প্রথমতঃ ভাবিলেন, 'স্বর্ণলতা হইতে জন্মের মতন বঞ্চিত হইলাম'। গোপাল স্পষ্ট কিছুই শোনেন নাই, তথাপি তাঁহার মনের কেমন এক বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্বর্ণলতা লাভ হইবেক। এক্ষণে একেবারে সে বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। দ্বিতীয় ভাবনা এই —'কেন আমি দাদাকে চিঠির মর্ম বলিলাম না? কেন আমি আপনার ইচ্ছামত এই গুরুতর কার্যের ভার গ্রহণ করিলাম? হয়ত দাদা শুনিলে অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার করিতে পারিতেন। গ্রহণ করিয়াই বা কেন আমি প্রাণপণে সে কার্যসাধনে যত্ন করিলাম না? হায়! কেন বা নিদ্রিত হইয়াছিলাম? এখন কি প্রকারে ফিরিয়া গিয়া দাদার নিকট মুখ দেখাইব? দাদা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি কি কৃতঘ্নের কাজ করিলাম। স্বর্ণলতাকে আমি চিরদুঃখিনী করিলাম। আমি যদি তাঁহার চিঠি তাঁহাকে দিতাম অথবা পড়িয়া শুনাইতাম, তাহা হইলে হয়ত কখনই এরূপ হইতে পারিত না। স্বর্ণলতা এ বিবাহের পর আত্মহত্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমারও তাই করা উচিত। এ পাপে আর তাহা ভিন্ন কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? হায়! এতক্ষণ স্বর্ণলতা দাদাকে নিন্দা

করিতেছে, কিন্তু আমিই যে তাহার সর্বনাশ করিলাম, তাহা জানিতে পারিতেছে না।"

গোপাল এইরূপ বিলাপ করিয়া রজনী প্রভাত করিলেন। কিন্তু নিজে যে কারাগারে আছেন, সেজন্য তাঁহার চিন্তার লেশমাত্র হইল না। মনে করিলেন, "আমি তো রজনী অবসান হইলেই মুক্ত হইব, কিন্তু স্বর্ণলতার শৃঙ্খল আর এজন্মেও ভাঙিবে না।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তরী ডুবু ডুবু

আজি স্বর্ণের বিবাহ ; বরের বাড়ীতে মহাধুম। কলিকাতা হইতে ইংরাজী বাদ্য আসিয়াছে। পাড়ায় ছেলেতে এবং রাস্তায় লোকে সদরবাটীর উঠান পরিপূর্ণ। পাত্রটি সহজেই দেখিতে সুশ্রী নয়। একে কালো, তাহার উপরে লাল চেলী পরিয়া শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধের রক্তবীজের ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সমপাঠী বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, বর তাঁহাদিগের মধ্যে বসিয়া আছেন।

বিবাহের দিবস বর-কন্যার কতই আদর? দীন-দুঃখী হইলেও সেদিন লোকে তাহাদিগকে যত্ন করে ; যার-পর-নাই কুৎসিত হইলেও তাহাদিগকে দেখিতে আইসে। যাহারা জন্মাবধি প্রত্যহই দেখিতেছে, তাহারাও আজি একবার নূতন করিয়া বর দেখিতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে একজন লোক গিয়া বরকে ডাকিয়া আনিতেছে। বর বয়স্কদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশপূর্বক উঠিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে অনিচ্ছাটি আন্তরিক নয়।

শশাঙ্কশেখর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আজ তুমি কিছু আহার করো না।"

স্বর্ণ যেন আশ্চর্য হইয়াছেন ভান করিয়া কহিলেন, "কেন ?"

শশাঙ্ক বিকট হাস্য হাসিয়া কহিলেন, "আজ তোমার বিবাহ।"

শশাঙ্কের বিকট হাস্যে স্বর্ণের হৃৎকম্প হইল। অন্যান্য দিন শশাঙ্কের যেরূপ চেহারা দেখিতেন, আজ যেন তাঁহার চক্ষে আর সে চেহারা নাই। তিনি পুস্তকে যেসব দৈত্য-দানবের কথা পাঠ করিয়াছেন, শশাঙ্ক যেন তাহারই একজন বলিয়া স্বর্ণের বোধ হইতে লাগিল।

শশাঙ্ক পুনর্বার কহিলেন, "আজ তোমার বিবাহ স্বর্ণ" এবং কথা সমাপন করিয়া আর একবার পূর্বাপেক্ষা ভীষণতর বিকট হাস্য হাসিলেন।

শশাঙ্কের ভাব ও মূর্তি দেখিয়া স্বর্ণলতার লজ্জা পলায়ন করিল। রোষে কম্পিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমার বিবাহ কে দেবে? কোথায় হবে?"

শশাঙ্ক পূর্ববৎ হাসিয়া কহিল, "তোমার বাপ বেঁচে থাকলে তিনিই দিতেন, তাঁর অবর্তমানে আমিই দেব, যেখানে বিবাহ হবে তা তুমি জান, সেদিন রাত্রে সব শুনেছ।"

স্বর্ণের শরীর রাগে ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কপট-নিদ্রিত ছিলেন, এ কথা শশাঙ্ক কি প্রকারে জানিতে পারিল? কোনও বিদ্যাবলে কি মনের ভাব গণনা করিয়া স্থির করিতে পারে?

স্বর্ণ কহিলেন, "তুমি পরম হিতকারী গুরুঠাকুরই বটে!"

শশাঙ্ক উত্তর করিল, "পরের হিত না করি, নিজের হিত তো করি!" একটু পরে আবার কহিল, "পরেরই বা হিত কিসে না করলাম! যে বিবাহের সম্বন্ধ করেছি, তাতে তোমার বাপেরও মত ছিল।"

স্বর্ণ সরোষে কহিলেন, "কখনও না।"

শশাঙ্ক আবার বিকট হাস্য হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাঁর না ছিল, আমার আছে।"

স্বর্ণ কহিলেন, "তোমার মত থাকল আর না-থাকল, তাতে কার বয়ে গেল? যার বে, তার মত নাই।"

শশাঙ্ক। তারও আছে। পাত্রের মত সর্বাগ্রে হয়েছে।

স্বর্ণ। পাত্রের মত হলো না হলো, তাতে আমার কি? আমার মত নাই।

"ঐ তো তোমাদের দোষ!" শশাঙ্ক আরম্ভ করিলেন, "কি দু-এক পাতা পড় আর শোন; সেই পড়ার জোরেই একবারে এত আত্মবিস্মৃত হও যে লজ্জাসরম থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তোমার ভালর তরে বলছি, গোলমাল করো না। শুভকর্মে গোলমাল করা ভাল নয়।" শশাঙ্ক এই বলিয়া তথা হইতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

স্বর্ণ কহিলেন, "তুমি কোথায় যাও? কাল অবধি আমাকে চাবি বন্ধ করে রেখেছ, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও। আমি এখনই কলিকাতায় যাব।"

শশাঙ্ক। আজ না। বিবাহের পর কলিকাতায় যেও।

স্বর্ণ গৃহের দরজার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমি এইখানে খুন হলো বলে চেঁচাই, রাস্তার লোক দুয়ার ভেঙে বাটির মধ্যে আসবে।" স্বর্ণ এই বলিয়া

যেমন বাহির হইবেন, শশাঙ্ক তাহার হস্ত ধরিয়া ঘরের দিকে টানিতে লাগিল। স্বর্ণ দু-এক বার বাহিরের দিকে টানিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধ্য কি যে, শশাঙ্কের সহিত জোরে পারেন? গুরুদেব তাঁহাকে গৃহমধ্যে রাখিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজায় চাবি বন্ধ করিল। স্বর্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। শশাঙ্ক কহিল, "এখন তোমার যত খুশি কাঁদ।" এই বলিয়া আবার একবার বিকট হাস্য হাসিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

বরের বাটীতে গিয়া শশাঙ্ক বাদ্যকরদিগকে আপন বাটীতে আনিল এবং কহিয়া দিল, "যখন বাড়ীর মধ্যে কান্না শুনবে তখন বাজাবে।"

স্বর্ণলতা কত কাঁদিলেন, কত রাগ করিয়া তিরস্কার করিলেন, কত করজোড়ে স্তুতি করিলেন, নিষ্ঠুর শশাঙ্ক কিছুতেই শুনিল না।

স্বর্ণ শশাঙ্ককে কহিলেন, "আমার বিবাহ দিয়ে তুমি যত টাকা পাবে, আমি তোমাকে তার দ্বিগুণ দেব, আমাকে ছেড়ে দাও। বাবা আমাকে যত টাকা দিয়ে গিয়েছেন, আমি সকলি লিখেপড়ে দিচ্ছি; আমাকে দাদার কাছে পাঠায়ে দাও।"

শশাঙ্ক কহিল, "তোমার সে টাকা দেবার অধিকার অদ্যাপি হয় নাই, নচেৎ আমার কোন আপত্তি ছিল না।"

স্বর্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি—আমি দেব।

শশাঙ্ক কহিল, "শশাঙ্কশেখর শর্মা প্রতিজ্ঞায় ভোলেন না।"

স্বর্ণলতা কহিলেন, "তবে তোমার কিসে প্রত্যয় হয় বল, আমি তাই করব"

শশাঙ্ক। তোমাকে পাত্রস্থ করতে পারলেই আমার প্রত্যয় হয়।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "তোমার তো মেয়ে আছে? আমাকেও তোমার মেয়ের মতন মনে কর। তোমার মেয়ের কি জোর করে বে দেবে?"

"আমার মেয়ে তোমার মতন নির্লজ্জ নয় যে, বের কথা নিয়ে এত গোল করবে। আমি যেখানে তার বিয়ে দেব, তার সেইখানেই বিবাহ হবে। তার এ বিষয়ে তোমার মতন মতামত নাই। সে পড়াশুনা করে নি, তার ভাইও ইংরাজি জানে না।"

স্বর্ণলতা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চুপ করিলেন।

শ্রীরামপুর দিয়া রেলওয়ে গাড়ী আসিতেছে যাইতেছে, নিয়মিত কাল পর্যন্ত তথায় থামিতেছে। এক এক বার গাড়ীর শব্দ হয় আর স্বর্ণলতা মনে করেন, "এইবার আমাকে নেবার জন্য লোক আসছে।" আহা! কয়টা আশা সুফলবতী হয়? সমস্ত আশাই সুফলবতী হইলে পৃথিবী স্বর্গসম হইত। স্বর্ণলতা একবার নৈরাশ হন, আর মনে করেন—এ গাড়ী কলিকাতায় যাচ্ছে, এখানা কলিকাতা হতে আসছে না। ইচ্ছা

হইলে কল্পনানুরূপ অনুভব করা যায়, স্বর্ণলতার কানে এমনি শব্দ হইতে লাগিল যেন আজি সমুদয় গাড়ী কলিকাতায় যাইতেছে। কলিকাতা হইতে একখানিও আসিতেছে না।

ক্রমে দিবা অবসান হইতে লাগিল। সূর্যদেবের দয়া মমতা নাই। কত শত রোগী শয্যায় শয়ন করিয়া রজনীর সমাগম দেখিয়া কম্পিত-কলেবর হইতেছে। সমুদ্রে কত শত তরী বিপথগমনের ভয়ে সূর্যদেবের পশ্চিম গতি দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছে। রজনী আসিলে স্বর্ণলতা চিরজীবনের জন্য শোকসাগরে নিমজ্জিতা হইবেন ভাবিয়া কতই রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কি দিনকরের হৃদয়ে একবারও করুণার সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কি পিতা-পুত্র উভয়েই সমান? হায়! যে সময় তোমার পুত্র অন্তর্জলে, সেই সময়ে কত শত লোকের পুত্রের বিবাহ হইতেছে। কত শত লোকের রাজ্যলাভ, ধনলাভ হইতেছে। সূর্যদেবের কি পক্ষপাত করিলে চলে? জয়দ্রথের জন্য তিনি এক দণ্ড আগেও অস্তাচলে যান নাই। সূর্যদেবের বংশে পক্ষপাতিত্ব নাই, তাঁহারা পিতাপুত্র উভয়েই সমান।

যতই সন্ধ্যা হইতে লাগিল, ততই স্বর্ণলতার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক্ষণে আবার আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, হয়ত তাঁহার দাদার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, কিংবা—ভাবিতে হৃদয় কম্পিত হয়—তদপেক্ষা গুরুতর অশুভ ঘটনা হইয়াছে। শশাঙ্ক অদ্য দুই দিবস আর কলিকাতায় যায় নাই। স্বর্ণ আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। হেমের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য জানিবার জন্য তাঁহার চিত্ত যার-পর-নাই ব্যগ্র হইল। কেহই নিকটে আসিতেছে না, যাহার কাছে খবর লইতে পারেন। শশাঙ্ক এক্ষণে অত্যন্ত ব্যস্ত; তাহার আর স্বর্ণের নিকট আসিবার অবকাশ নাই। শশাঙ্কের স্ত্রী ও কন্যাকে প্রাতঃকাল অবধি অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। আকাশে স্থানে স্থানে একটু একটু মেঘ দেখা দিল। বসন্তের সমীরণ বহিতে লাগিল। মালা, চন্দন ও পট্টবস্ত্রে বিকট মূর্তি ধারণ করিয়া বর আসিল, ইংরাজি বাদ্য বাজিল। শঙ্খধ্বনি হইল। বর সভায় বসিল। বালকেরা বরকে লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। পুরোহিত আসিলেন। শশাঙ্ক এ সকলের একটু দূরে বসিয়া হরিদাসের নিকট হইতে টাকা গণিয়া লইতে লাগিল।

স্বর্ণলতা আপন কারাগারে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যে কিছু পরিত্রাণের আশাভরসা ছিল, সন্ধ্যা হইলে দূরীভূত হইল। "হা ঈশ্বর। আমার অদৃষ্টে এই ছিল" বলিয়া স্বর্ণলতা আর্তনাদ করিতেছেন। কে তাঁর কান্না শোনে? সকলেই

আমোদ-প্রমোদে মত্ত। শশাঙ্ক এখনও হরিদাসের নিকট হইতে টাকা গণিয়া লইতেছে।

টাকা গণিয়া লইয়া শশাঙ্ক ও হরিদাস উভয়ে সভায় গেল। দেখিল, সমুদয় প্রস্তুত। কন্যা আনিলেই হয়। শশাঙ্ক কন্যা আনিতে আসিল।

দ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র স্বর্ণলতা দৌড়িয়া শশাঙ্কের চরণে পড়িলেন। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "আগে আমাকে বল, দাদা কেমন আছেন, তা না হলে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

শশাঙ্ক কহিল, "তোমার দাদা ভাল আছেন।"

স্বর্ণ কহিলেন, "আমার মাথা খাও, তোমার ছেলের মাথা খাও, সত্যি কথা বল।"

স্বর্ণের তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছে। কি বলেন, তাহার ঠিকানা নাই।

শশাঙ্ক কহিল, "আমি যথার্থ বলছি, তোমার দাদা ভাল আছেন। তিনি ভাল আছেন বলেই তো তোমার এত শীঘ্র বিবাহ দিচ্ছি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হলে কি আর এ বিবাহ দিতে দেবেন? তাঁর যদি কোন অশুভ হতো, তা হলে তো তুমি আমাদের হাতেই থাকতে, এত ব্যস্ত কখনই হতেম না।"

স্বর্ণলতা দেখিলেন, শশাঙ্কের কথা সঙ্গতই বটে। তখন তিনি কহিলেন, "আমার অসম্মতিতে বিবাহ দিও না, দিলে তোমার ভাল হবে না। আমি নিশ্চয়ই গলায় ফাঁসি দিয়ে মরব।"

পাষণ্ড শশাঙ্ক কহিল, "একবার সাতপাক দিয়ে দিলে তারপর তুমি বিষই খাও, আর গলায়ই ছুরি দাও, আমার তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সাত পাক পর্যন্ত।" এই বলিয়া শশাঙ্ক পূর্বের ন্যায় হাসিল।

স্বর্ণলতা শশাঙ্কের পা ধরিয়াছিলেন। শশাঙ্ক হেঁট হইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত ধরেন, এমন সময় স্বর্ণ উঠিয়া দৌড়িয়া গৃহের কোণে গিয়া আপনার অঞ্চল দ্বারা গলদেশ বন্ধনপূর্বক কহিলেন, "তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ওখান থেকে যদি এক পা আগে এস, তা হলে আমি ফাঁসি টেনে মরব।"

শশাঙ্ক কহিল, "স্বর্ণ, তুমি ছেলেমানুষ, তাতেই এত জোর করছ। তোমার আর কি সাধ্য আছে, আমার হাত থেকে উদ্ধার হও। এইবেলা সহজে এস। লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তোমার বিবাহ এই রাত্রেই দেবই দেব, লগ্ন বহির্ভূত হলে ভবিষ্যতে তোমারই অমঙ্গল।" এই বলিয়া শশাঙ্ক এক পদ অগ্রসর হইল।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "এই টানিলাম ফাঁসি। আমার মৃত্যুও যে, এমন বিবাহও সেই।" এই বলিয়া ফাঁসি টানিবেন, এমন সময় বহির্বাটী হইতে এক প্রকাণ্ড আলোক

দেখা গেল। উভয়ে চমকিয়া সেইদিকে দৃষ্টি করিলেন। আলোক মুহূর্তমধ্যে দশদিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শশাঙ্ক টের পাইল, তাহার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শশীর চক্ষু ফুটিল

শশিভূষণ রামসুন্দরবাবুর বাটী হইতে নিজবাটী আগমন করিয়া প্রমদার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। প্রমদা শুনিয়া দুই চারি বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। ক্ষণকাল নীরবে পতির নিকট বসিয়া থাকিয়া তথা হইতে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। শশিভূষণ জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় যাও? আমার কথা শুনে চুপ করলে যে?" প্রমদা উত্তর করিলেন, "আমি আসি।" এই বলিয়া নীচে মায়ের নিকট আসিলেন।

শশিভূষণের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সকলই প্রমদার নামে। প্রমদার নামে কাগজ, প্রমদার নামে বাটী, প্রমদার নামে জমিজমা। নগদ টাকাও প্রমদার কাছে। প্রমদা শশিভূষণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, স্ত্রীর নামে ধন রাখিলে সে ধনে কোন সারকের অংশ থাকে না, দায়-বিবাদের সময় সে বিষয় কেহ নিলাম করিয়া লইতে পারে না; পুরুষের নামে থাকিলে কোন একটা দাবিতে লোকে বিষয় বেচিয়া লইতে পারে; স্ত্রীর নামে থাকিলে তাহার কোনই ভয় থাকে না। শশিভূষণ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কায়মনোবাক্যে এতকাল ইহারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। বিধুভূষণের জমিজমার খাজনা দিবার উপায় ছিল না, এজন্য প্রথমতঃ শশিভূষণ সমুদয় খাজনা দিতেন। না দিলে যদি বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়েরই ক্ষতি। প্রমদার পরামর্শে ক্রমে তিনি খাজনা দেওয়া বন্ধ করিলেন; পরে নিলাম হইবার সময় সেগুলি সমুদয় প্রমদার নামে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। নগদ টাকা যখন যাহা হাতে থাকিত, প্রমদার উপদেশক্রমে তদ্দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেন। প্রমদা কহিতেন, 'হাতের টাকা একবার গেলে আর পাওয়া যায় না। একখান গয়না গড়ে রাখলে সে টাকা মজুত থাকে। দরকার হলেই বন্ধক দেওয়া যায়, বিক্রি করা যায়। আবার টাকা হাতে আসিলে ছাড়াইয়া লওয়া যায়।' শশিভূষণের ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণা।

আজি শশিভূষণের চারিহাজার টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। শশিভূষণ নিঃশঙ্ক-চিত্তে

বাটী আসিলেন। প্রমদাকে বলিলেই টাকা পাইবেন। এমন কি, চাহিতেও হইবে না। তাঁহার মুখে সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়াই প্রমদা টাকা দিবেন। কিন্তু প্রমদা যখন কথা না কহিয়া উঠিয়া গেলেন, তখন শশিভূষণের কিঞ্চিৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য হইল। চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি? প্রমদা কি টাকা দেবেন না? শশিভূষণের মনে যখন এই প্রশ্ন উদিত হইল, তখন মাথা নাড়িয়া ভাবিলেন, "তাও কি কখনও হইতে পারে?"

প্রমদা নীচে গিয়া মাতাকে ডাকিলেন। মাতা অবিলম্বে প্রমদার নিকট আসিলেন। প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "মা, ওদিকে কেও আছে কি?" তাঁহার জননী উত্তর করিলেন, "না।" প্রমদা কহিলেন, "তবে এই তক্তাপোশে বসে শোন।"

প্রমদার মাতা অস্ফুটস্বরে "কি কি" বলিয়া প্রমদার পার্শ্বে বসিলেন। তাঁহার শরীর প্রমদার শরীরে স্পর্শ হইল। প্রমদা কহিলেন, "একেবারে গায়ের উপর চেপে পড়লে যে?"

প্রমদার জননী সকাতরে কহিলেন, "না মা, না মা, আমি দেখতে পাই নাই।"

প্রমদা। তোমার চোখ নাই বুঝি? এর মধ্যে কানা হলে? কান থাকে শোন; না থাকে তো বল, আমি চুপ করি।

জননী। বল মা বল, আমি শুনছি।

প্রমদা জননীকে ক্ষমা দানে বাধিত হইয়া কহিলেন, "শুনেছ, কি হয়েছে?

জননী। না।

প্রমদা। তুমি কি সমস্ত দিন কানে ছিপি দিয়ে বসে থাক?

জননী কাতর স্বরে কহিলেন, "আমাকে তোমরা না বল্লে আমি কার কাছে শুনব? তুমি তো আমাকে কোন কথাই কও নাই।"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "তবে আর ভূমিকায় কাজ নাই, এখন শোন। সেদিন সাহেব এসেছিল; সে হুকুম দিয়ে গিয়েছিল, 'যদি ওরা (অর্থাৎ তাঁর স্বামী) কাগজ না বুঝে দিতে পারে, তবে কর্ম থাকবে না'।"

জননী আশ্চর্য হইয়াছেন ভান করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কি সর্বনাশ! এখন কি হবে?"

প্রমদা। তুমি যদি অমন করে চ্যাচাও, তা হলে এখান থেকে উঠে যাও।

জননী। না মা, আর চ্যাচাব না।

প্রমদা আবার ক্ষমা করিয়া কহিলেন, "কাগজ তো বুঝবার জো নাই। বাবুকে মাতাল পেয়ে যে যা পেরেছে তাই চুরি করেছে, আমাদের এরা চুরি করেন নি, কিন্তু পরে যা নিয়েছে তার তো ভাগ পেয়েছেন; এখন হয় জেলে যেতে হবে, নয় পুলিপোলাও

যেতে হবে।" পিলোপিনাংকে লোকে প্রায়ই পুলি ও পোলাওকে দ্বন্দ্ব সমাস করিলে যে রূপ হয়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকে।

জননী আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "এর আর কি উপায় নাই ?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "আছে এক উপায়, কিন্তু সেও না থাকার মধ্যে। এখন যদি চার হাজার টাকা অন্য অন্য আমলাদের ঘুষ দেওয়া যায়, তবে রক্ষা হয়। এঁরা বলছেন রক্ষা হয়, কিন্তু আমার মনে তো ভরসা হয় না।"

জননী দরিদ্রের কন্যা, দরিদ্রের বধূ, ৫০টি টাকা একত্র কখনও দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। চারি হাজার টাকার নাম শুনিয়া তিনি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। চারি হাজার কি ঢেঁকি, না কুলো, তা জানেন না। কিন্তু কথা কহিলে পাছে প্রমদা রাগ করেন, এজন্য চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "কথা কও না যে ?"

জননী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কত টাকা বল্লে ?"

প্রমদা। চার হাজার।

জননী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "সে ক' কুড়ি ?"

প্রমদা সক্রোধে কহিলেন, "মরণ আর কি ? তুমি কচি মেয়ে নাকি ?"

জননী নীরব।

প্রমদা পুনরায় কহিলেন, "চার হাজার টাকা দিতে হলে আর প্রায় কিছু বাকি থাকে না। কোম্পানির কাগজগুলি আর গহনাগুলি সব যায়, এখন উপায় কি ?

জননী বিষম বিপদে পড়িলেন। লোকে বলে, বোবার শত্রু নাই, কিন্তু কার্যতঃ সে কথা প্রলাপবাক্য মাত্র। তিনি কথা কহিলেও প্রমদা তিরস্কার করেন, না কহিলেও তিরস্কার করেন। আকাশপাতাল ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না—কি বলিলেন। এমন সময় প্রমদা কহিলেন, "আমার বিবেচনায় এ টাকা দিলেও নিস্তার নাই। লাভের মধ্যে টাকাও যাবে, প্রাণও যাবে। তাই আমি বলি, কোম্পানির কাগজ, নগদ ও গয়না যা কিছু আছে একদিন নিয়ে চলে যাই। এখানে থাকলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে দিতে হবে, তফাতে থাকলে আর চক্ষুলজ্জা থাকবে না। আজ যদি টাকাগুলি দি, আর কাল উনি পুলিপোলাও যান, তবে আমরা ভিক্ষে করে বেড়াই আর কি ? তা হবে না। মা, কি বল তুমি ?"

মাতার এক্ষণে দিঙনির্ণয় হইল ; এখন যতই চাবুক মার ততই দৌড়াইবেন। কহিলেন, "তার কি ভুল আছে ? আপনার পাঁজি-পুঁথি পরেরে দিয়ে দৈবজ্ঞি বেড়ায় হাবাতে হয়ে। সে কাজে যেন আমার বংশের কেউ না যায়।"

পরামর্শ স্থির করিয়া প্রমদা শশিভূষণের নিকট আসিলেন। শশী জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

প্রমদা। ঐ একবার মার কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর ব্যাম হয়েছে, তাই দেখে এলাম।

শশী। এই টাকাগুলি দিতে হবে, তার কি?—শশী অত্যন্ত কাতর স্বরে কথাটি কহিলেন।

প্রমদা উত্তর করিলেন, "যখন দিতে হয়, তখন দেওয়া যাবে।" শশিভূষণের আর অধিক কথা কহিতে সাহস হইল না।

পরদিন প্রাতে রামসুন্দরবাবু দুইজন পেয়াদা সমভিব্যাহারে শশীবাবুর বাটী আসিয়া শশীবাবুকে ডাকিলেন। শশী নীচে আসিয়া রামসুন্দরবাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। রামসুন্দর কহিলেন, "যদি কারুকে কিছু দেবার ইচ্ছা থাকে, এইবেলা আমার কাছে দাও। নচেৎ আর সময় পাবে না। হিসাব বুঝে নিতে সরকার থেকে একজন ম্যানেজার এসেছে। ঐ পেয়াদা তোমার তলবে এসেছে। এখন না দিলে কাছারিতে সকলই প্রকাশ হবে।"

শশিভূষণ এই কথা শুনিয়া উপরে স্ত্রীর নিকট আসিয়া প্রমদাকে কহিলেন, "তবে দাও, সেই ক'খানা কাগজ দাও। আর যাতে হাজার টাকা হয়, এমন খানকতক গয়না দাও।"

প্রমদা কহিলেন, "এখনই না দিলে নয়?"

শশী। না।

প্রমদা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "দিলে কিছু লাভ হবে?"

শশী। আমি তা হলে বেঁচে যাব, নচেৎ আমাকে পুলপোলাও যেতে হবে।

প্রমদা আবার খানিক নীরবে থাকিয়া কহিলেন, টাকা দিলে কেমন করে বেঁচে যাবে, আমি বুঝতে পারি না। আবার মনে নিচ্চে, টাকা দিলে টাকাও যাবে, তুমিও যাবে।"

শশিভূষণের তখন হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অতি কাতর স্বরে কহিলেন, "আমিই যদি যাই, তবে আর আমার টাকা থেকে কি হবে?"

প্রমদা মুখখানি আঁধার করিয়া কহিলেন, "তা হলে আমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খেতে হবে; সে কি তোমার পক্ষে ভাল হবে?"

শশিভূষণের বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা বিনীত ভাবে প্রমদার কাছে বসিয়া কহিলেন, "তোমরা ভিক্ষা করবে কেন? আমার জমিজমা

আছে, বাটি থাকলে, তোমাদের স্বচ্ছন্দে চলবে। আর এই টাকা দিলে আমিও নিষ্কৃতি পাব।"

প্রমদা অবনত-বদন হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শশিভূষণ কহিলেন, "শীঘ্র দাও —লোক এসে বসে আছে। দেরি হলে পর দেওয়া না-দেওয়া সমান হবে।"

প্রমদা তথাপি কথা কহিলেন না। তখন শশিভূষণ একটু রাগত হইয়া কহিলেন, "দেবে কি না বল?"

শশিভূষণকে রাগত দেখিয়া প্রমদার কথা কহিবার অবকাশ হইল। কহিলেন, "অমন জোর কর যদি, তবে দেব না।"

শশিভূষণ পুনরায় কাতর স্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ হয়েছে, এখন দাও।"

প্রমদা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমাদের মতন কঠিন লোক আর নাই। কতক দিন তোমার ভায়া জ্বালাতন করলেন, এখন তিনি গেলেন, তুমি লাগলে, আমার কপালে আর সুখ হলো না। বাবা কেনই বা আমাকে এমন জায়গায় বিয়ে দিলেন?" প্রমদা আর কথা কহিতে পারিলেন না। অনতি-উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রমদা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "তুমি তো চললে, রাঁড়ের কি করে গেলে?"

শশিভূষণ কহিলেন, "আমাকে তুমিই ভাসালে। তুমি টাকা দিলে আর আমার বিপদ থাকে না।" প্রমদা ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

নীচে থেকে রামসুন্দরবাবু ডাকিতেছেন, "শশীবাবু আসুন, বেলা হলো।"

শশী উচ্চৈঃস্বরে "এই যাই" বলিয়া প্রমদার পদযুগল ধরিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রমদা, আমাকে রক্ষা কর। তুমি না রক্ষা করলে আমি আর রক্ষা পাই নে। প্রমদা, তোমার পায়ে পড়ি, রক্ষা কর।"

প্রমদাকে যেন কে কতই প্রহার করিতেছে, এইরূপ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন,—"বাবা আমার স্বপ্নেও জানতেন না, আমার এমন দুরাদৃষ্ট হবে। আমার জীবনটা দুঃখে দুঃখেই গেল। আমাকে কেন এখানে বিয়ে দিলেন?"

প্রমদার কান্না শুনিয়া প্রমদার জননী দৌড়িয়া আসিলেন এবং প্রমদার শেষ কথাটা শুনিতে পাইয়া তাহারই উপর দ্বিতীয় মল্লিনাথের ন্যায় টীকা করিতে আরম্ভ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমি তখনই তোমার বাপকে বলেছিলাম, এ কাজে সুখ হবে না। তোমার বাপ আমার কথা না শুনে বাছা তোমাকে এখানে বিয়ে দিলেন। আমাকে গালি দিও না বাছা। ওরে গদাধরচন্দ্র, তুই

এখন কোথায় ?" প্রমদা ও প্রমদার মা ঝড় আর আগুন একত্র হইয়া শশিভূষণের সর্বনাশ করিতে বসিলেন।

রামসুন্দরবাবু বৈঠকখানা হইতে কহিলেন, "শশীবাবু সত্বর আসুন, নইলে পেয়াদারা বাটীর মধ্যে চল্লো।"

রামসুন্দরের কথা শুনিয়া শশী উন্মত্তের মতন হইয়া কহিলেন, "প্রমদা, এতদিন তোমার সব সৎপরামর্শের অর্থ বুঝতে পারলাম। তুমি আমাকে বোকা বলতে, আমি যথার্থই বোকা, তা না হলে তোমার মতন পাপীয়সীর কথায় আমার প্রাণের ভাই বিধুকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেব কেন? আমার ঘরের লক্ষ্মী সরলাকেই বা মেরে ফেলব কেন? সরলা আমার ঘরে আসা পর্যন্ত আমার দুঃখ হয় নাই, ক্লেশ হয় নাই, আমার সংসার রাজার সংসার ছিল। তোর পরামর্শে আমি এমন সরলাকে পৃথক করে দিলাম। সে যখন অন্নাভাবে মরে, তখন তোরই পরামর্শে আমি অন্ন দিলাম না। সরলা যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে, তখনই আমি জানতে পারলাম, আমার আর ভদ্রত্ব নাই। তুই সরলাকে মেরেছিস, তুই আমার সোনার ভাইকে পথের ভিখারী করেছিস। অবশেষে আমি ছিলাম, তুই আমাকেও খুন করলি। আমার যেমন কর্ম, তেমনি ফল। তোরই বা দোষ কি? আমার সোনার প্রতিমা সরলাকে বিসর্জন দেবার ফল এতদিনে ফলল।"

এই কথা বলিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ভীষণ নেত্রে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শশিভূষণ গৃহের অভ্যন্তর হইতে চলিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে বহির্দ্বারে গিয়া রামসুন্দরবাবুর সহিত একত্র হইলেন। কাছারিতে সকলে শশিভূষণের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইল। কেহ কোন কথা না বলিতে তিনি নিজেই সমুদয় আত্মদোষের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি এই অপরাধ করেছি, আমার উচিত দণ্ড বিধান করুন।" সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

ম্যানেজার একজন ডেপুটি কলেক্টর, শশিভূষণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু ন্যায়মত কার্য না করিলেও নয়, সুতরাং শশিভূষণ যাহা যাহা বলিলেন, তিনি সকলই লিখিয়া লইলেন, শশিভূষণের কথায় অল্প অধিক পরিমাণে সকলে দোষী হইলেন। মুহুরি, খাতাঞ্চি, হিসাবনবিস ও রামসুন্দরবাবু, এঁরা সকলেই শশিভূষণের সহিত হাজতে চলিলেন।

সকলকে গারদে দিয়া ডেপুটি কলেক্টর মনে করিলেন, শশিভূষণের অপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরুতর, তাহার বিষয়-আশয় বিক্রি করিয়া জমিদারের ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত, কিন্তু পাছে অস্থাবর বস্তু সমুদয় স্থানান্তর হয়, এই ভয়ে শশীর বাটীতে পুলিস-পাহারা রাখিয়া দিলেন।

সন্ধ্যাবেলা। আকাশমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া বেগে বায়ু বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অল্প একটু বৃষ্টি হইয়া গেল। বৃষ্টি হইয়া কিঞ্চিৎ শীত বাড়িল। দারোগা দীনবন্ধুবাবু ও কনস্টেবল রমেশ, শশিভূষণের বাটী পাহারা দিতেছেন। দারোগা আজি নিজে আসিয়াছেন, অপরকে পাহারা রাখিয়া তাঁহার প্রত্যয় হইল না। শীতে পাহারা দেওয়া বড় আমোদজনক কাজ নহে। বিশেষ অনভ্যাসপ্রযুক্ত অল্পক্ষণের মধ্যেই দীনবন্ধুবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "রমেশ, তুমি তো জান ভাই, আমি কোন সরকারী লোক দিয়া নিজের কাজ করিয়ে লই না। কিন্তু তোমাকে যে দুই একটা কথা বলি, সে কেবল তোমাকে স্নেহ করি বলে। তুমি ভাই, আজ রামধনার দোকান থেকে আদ পোয়া এনে দিতে পার? বড় শীত-শীত করছে।" 'রামধনের' নাম উল্লেখ করিয়া পরে ওজন বলিয়া দিলে আর জিনিসের নাম বলিতে হয় না।

রমেশ কহিল, "আজ্ঞা, আপনার একটা কাজ করব, তার জন্যে এত কথা বলছেন কেন? আপনার অনুগ্রহ থাকলেই হলো।"

ক্ষণকাল বিলম্বে আদ পোয়া আসিল। দারোগাবাবু বোতলের গলায় তর্জনী প্রবেশপূর্বক বোতলটি উপুড় করিলেন, পরে সেটিকে আবার স্বাভাবিক ভাবে রাখিয়া নিজের অঙ্গুলিটি দীপ-শিখায় ধরিলেন। ভাল জ্বলিল না। ঈষৎ মুখ বক্র করিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, "রমেশ, তোমাকে নূতন লোক পেয়ে ব্যাটা ঠকিয়ে দিয়েছে।" কিন্তু দারোগাবাবু সেজন্য আদ পোয়া ফেরত দিলেন না। অল্প অল্প করিয়া সেটুকু সেবন করিলেন।

দারোগাবাবু একটু পান করিতেছেন, এমন সময় রমেশকে কে ডাকিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমেশ শুনিয়া আসিলেন।

দারোগাবাবুর আদ পোয়ায় কিছু হইল না, এজন্য রমেশকে পুনরায় কহিলেন, "তুমি তো জান ভাই, আমি সরকারী লোক দিয়ে নিজের কাজ ইত্যাদি।" অর্থাৎ আর আদ পোয়া আন।

রমেশের এবার মদ আনিতে দেরি হইল।

দারোগাবাবু আবার সেটুকু সেবন করিলেন, এবার আর অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করেন নাই, কেমন জিনিস, সেবন করিয়া এক মিনিটের মধ্যেই দারোগাবাবুর মনে হইতে লাগিল যেন তিনি দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় বসিয়া আছেন। যাই এই কথা মনে হইল, অমনি দারোগাবাবু তথায় শয়ন করিলেন। যাই শয়ন করিলেন, অমনি নাসিকাধ্বনি হইল, যাই নাসিকাধ্বনি হইল, অমনি রমেশবাবু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারে শব্দ করিলেন। যাই শব্দ করিলেন, অমনি দ্বার খুলিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রন্থকর্তারা সর্বস্থানেই যাইতে পারেন। যাই রমেশবাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকর্তাও প্রবেশ করিলেন। করিয়া কি দেখিতে পাইলেন? প্রমদা ও তাঁহার জননী সমুদয় গয়নাপত্র, টাকাকড়ি, কাপড়-চোপড় একত্র করিয়া মোট বাঁধিয়া প্রস্তুত! রমেশবাবুকে প্রমদার মাতা ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কোন্ দরজা দিয়ে যাব? খিড়কি, না সদর?"

রমেশ। সদর।

তখন প্রমদার জননী প্রমদাকে কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব করো না মা।"

প্রমদা রমেশবাবুর হাতে টাকা গণিয়া দিলেন। রমেশবাবু গণিয়া লইলেন।

অনন্তর প্রমদার মাতা কাপড়ের মোট লইলেন, এবং প্রমদা একটি বড় হাত-বাক্স লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। রমেশবাবু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাদিগকে বাটীর বাহিরে রাখিয়া গেলেন।

বিপিন, কামিনী, দাসদাসী, সকলেই বাটীতে রহিল।

প্রমদা নিজে পিত্রালয়ে গিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া আসিবেন মানসে, দিন থাকিতেই নৌকা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘাটে গিয়া দেখিলেন, নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছে; নিঃশব্দে দু-জনে নৌকায় উঠিলেন। নাবিকেরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সন্ধ্যাবধি যে ঝড় হইতেছিল, তাহার বেগ পূর্বাপেক্ষা শতগুণ প্রবল হইল। গগনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে ঘোরতর ঘনঘটায় আবৃত হইল, দশ দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। তড় তড় শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলো চক্ষুকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদয় উৎপাটিত হইতে লাগিল। ভীষণ বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। শীতে শরীর জড়সড় হইয়া আসিল। পবনের গর্জনে কর্ণে তালা লাগিল। বৃক্ষ হইতে রাশি রাশি বিহঙ্গম মরিয়া নদীতে পড়িল। বাটী-ঘর সমুদয় দেখিতে দেখিতে সমভূম হইয়া গেল। প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল। মুহূর্তমধ্যে হাহাকার উঠিয়া গেল। কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, কাহারও কথা কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। নাবিকেরা সাঁতার দিয়া কূলে উঠিল। প্রমদার মাতা কাপড়ের মোটে ভর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

প্রমদার বাক্স অত্যন্ত ভারী ছিল। বাক্স ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল; এবং তাঁহার হস্ত হইতে বাক্স খসিয়া জলমগ্ন হইল। পরক্ষণেই একটি প্রবল তরঙ্গ কর্তৃক তিনি কূলে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"অসৎ কার্যের বিপরীত ফল"

শশাঙ্ক চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে অগ্নি ও আলোকের বৃদ্ধি দেখিয়া দৌড়িয়া সেদিকে গেল। স্বর্ণলতার গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দ্বার খুলিয়া চাবি সহ তালাটি চৌকাটের মাথায় আংটায় রাখিয়াছিল; যাইবার সময় লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইল। স্বর্ণলতাও জানালা দিয়া দেখিলেন, শশাঙ্কের চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িতেছে এবং তাহার পরক্ষণেই তাহার নিকটবর্তী আর একখানি ঘর জ্বলিয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া স্বর্ণের অন্তর কাঁপিতে লাগিল। হু হু করিয়া ঘর জ্বলিতেছে, লোকজন কোলাহল করিয়া পলাইতেছে; কেহ কাহারও অন্বেষণ করিবার অবকাশ নাই; নিজ নিজ প্রাণ লইয়াই সকলে শশব্যস্ত। স্বর্ণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরে কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। একবার সদরের দিকে গমন করিলেন, কিন্তু সম্মুখে লোকের সমারোহ দেখিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক খিড়কির দিকে গমন করিলেন। খিড়কির দিকে ভাল আলো আসিতেছে না। স্বর্ণ ত্রস্ত হইয়া চলিয়া যাইতে দুই তিন বার পড়িয়া গেলেন। কিন্তু জীবনের ভয়ে পলায়ন করিতেছেন, একটু আঘাতে তাঁহার কি হইবে? খিড়কির দরজার কাছে গিয়া দেখিলেন, দরজা খোলা। হরষিতচিত্তে শশাঙ্ক কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন। রাস্তার বায়ু সেবন করিয়া তাঁহার দেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। সেখানেও অত্যন্ত লোকসমারোহ দেখিয়া সম্মুখে দৌড়িয়া গেলেন। স্বর্ণলতা কোন্ দিকে যাইতেছেন তাহা টের পাইতেছেন না, অথচ চলিতেও ক্ষান্ত হইতেছেন না। বিবেচনা করিলেন, শশাঙ্কের বাটী হইতে যে-কোন স্থানে যাইবেন, সেইখানেই আশ্রয় পাইবেন। এমন সময় এক দ্বিশাখা রাস্তায় আসিলেন। কোন্‌টিতে যাইবেন, স্থির করিবার জন্য ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বাম দিকে চলিলেন। অনুমান অর্ধরশি গমন করিয়াছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার অঞ্চলাকর্ষণ করিয়া কহিল, "কোথায় যাও?" স্বর্ণলতা আতঙ্কে চিৎকার করিয়া পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক। দেখিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ সাহস হইল। স্ত্রীলোকটিও আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। স্বর্ণলতা দেখিলেন, শশাঙ্কের বাটীর দাসী। সে তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে ভাবিয়া স্বর্ণলতা পুনর্বার আতঙ্কে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না। না ছাড় তো আমি চ্যাচাব।" দাসী কহিল, "ভয় কি? আমি তোমাকে

ধরতে আসি নাই। আমিও তোমার মতন পালাচ্ছি। এই দেখ, বামুনের সর্বনাশ করে এসেছি।" এই বলিয়া একটি বাক্স দেখাইল। স্বর্ণলতা বাক্স দেখিয়া মনে স্থির করিলেন, দাসী যাহা বলিতেছে যথার্থ। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ দিকে যাবে?"

দাসী কহিল, "রেলের রাস্তায় যাওয়া হবে না, তা হলে ধরা পড়ব। চল আমরা বাঁ-দিকে যাই। নদী পার হয়ে ওপারে আমার এক মাসীর বাড়ী আছে, আজ সেইখানে গিয়া থাকি। পরে কাল যেখানে হয় যাব।"

দাসীর কথা সঙ্গত মনে করিয়া স্বর্ণলতা দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এ-গলি ও-গলি করিয়া উভয়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু স্বর্ণলতা যেখানে যান, নৈরাশ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। গঙ্গার ঘাটে প্রথমতঃ নৌকা পাইলেন না। অনেকক্ষণ কূলে প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে পার হইলেন।

গঙ্গা পার হইয়া স্বর্ণলতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এতক্ষণে রক্ষা পেলাম।" দাসী কহিল, "তোমার আর ভয় কি? কিন্তু আমার এখন বিপদ্ আছে।"

স্বর্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এ কর্ম করলে কেন? চুরি করলে কেন?"

দাসী কহিল, "চুরি করব না? খুব করেছি। ওর মতন পাষণ্ড কি আর আছে? রাজ্যের লোকের টাকা চুরি করে করে বড়মানুষ হচ্ছে। আমি ওর কী-ই বা নিয়েছি।" স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এ কেমন করে নিলে?"

দাসী কহিল, "বামুন যে সিন্দুকে টাকা রাখত, তা আমি জানতেম। অনেক বার নিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও সুবিধা পাই নাই। আজ যখন তোমার ঘরে এল, তখন বাইরে তালার গায়ে চাবি রেখে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম তখনই নি। কিন্তু নিতে গিয়েও ভরসা হলো না। তারপর যখন ঘরে আগুন লাগল, তখন ও দৌড়ে গেল; চাবি পড়ে রইল। আমি ভাবলাম, এই সময়; এখন যদি না নি, তবে আর কখনও নিতে পারব না। বামুন যাই চলিয়া গেল, আমিও অমনি চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে এই বাক্সটা নিয়ে বেরুলাম। তুমি আমার আগে আগে বেরিয়েছিলে। তার পর তুমি যখন সদর-দরজার দিকে গেলে, তখন আমি খিড়কির চাবি খুলে বেরুয়ে এলাম। তাইতেই তুমি দুয়ার খোলা পেলে। আমিই বেরুয়ে দেখলাম, জনকতক লোক যাচ্ছে, অমনি আবার খিড়কির পিছু এলাম। তোমাকে এত ডাকলাম, তুমি শুনতে পেলে না। তারপর তুমি যখন উত্তরের দিকে যাও, তখন দেখলাম তোমাকে না ফিরালে হয় না, তাই তোমার আঁচল ধরে টানলাম, তুমি মনে করলে, আমি তোমাকে ধরতে এসেছিলাম।" এই বলিয়া দাসী হাসিয়া উঠিল।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "আমার যথার্থই মনে হয়েছিল, তুমি আমাকে ধরতে এসেছিলে।"

দাসী স্বর্ণলতাকে কহিল, "চল, ঐ আমার মাসীর বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গিয়ে আজ রাত্রে থাকি।"

স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কলিকাতায় যাব কেমন করে? আবার তো কাল পার হতে হবে, নইলে গাড়ী পাব না। আমার সঙ্গেই বা কে যাবে?"

দাসী কহিল, "কালকার কথা কাল হবে, আজ তো এখন চল।" এই বলিতে বলিতে উভয়ে দাসীর মাসীর বাটী পৌঁছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে-গৃহে স্বর্ণলতা ছিলেন, শশাঙ্ক সেই গৃহ হইতেই প্রথমে অগ্নি দেখিতে পায়। শশাঙ্ক তাহার পূর্বক্ষণেই চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বস্থ ঘরে তক্তাপোশের দেরাজের মধ্যে হরিদাস-দত্ত টাকাগুলি রাখিয়া আসিয়াছে। শশাঙ্ক অব্যবস্থিতচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে দ্রুতগতিতে গমন করিল। ফাল্গুন মাস; সমুদয় জিনিস শুষ্ক হইয়া আছে, অগ্নিস্পর্শ মাত্রেই জ্বলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্ববর্তী ঘরে আগুন লাগিল। লাগিবামাত্রেই হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে দুই ভয়ানক অগ্নিস্তম্ভ হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই বায়ু পূর্বাপেক্ষা প্রবল হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য লোকের ঘর জ্বলিয়া উঠিল। সকলে কোলাহল করিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হরিদাস এক হাতে পুত্রের হস্ত ও অপর হাতে পুরোহিতের হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অগ্নি নির্বাণ হইলে পুত্রের বিবাহ দিবেন।

শশাঙ্ক বহির্বাটী আসিয়া দেখিল, যে-ঘরে টাকা রাখিয়াছে, সে ঘর হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। কিন্তু তথাপি সেই ঘরে প্রবেশপূর্বক তক্তাপোশের উপর হইতে বিছানা দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে দেরাজ খুলিবার জন্যে আপনার ঘুন্‌সিতে চাবির অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কোমরে চাবি পাইল না। কি মনস্তাপ! দৌড়িয়া যে-ঘরে স্বর্ণলতা ছিলেন, পুনরায় সেই ঘরের দ্বারে গেল। গিয়া দেখিল, তালাটি পড়িয়া আছে, কিন্তু চাবি নাই। তদ্দর্শনে কপালে করাঘাত করিয়া শশাঙ্ক কাঁদিয়া উঠিল, "হায়! আমার সর্বনাশ হলো!" একখানি কুঠারের জন্যে ক্ষিপ্তের ন্যায় চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রয়োজনের সময় কোন দ্রব্যই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান করিয়া কুঠার মিলিল। তখন সেই কুঠার-স্কন্ধে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল, তখনও ঘরে প্রবেশ করা যাইতে পারে। প্রবেশ করিবে, এমন সময় হরিদাস পশ্চাৎ হইতে তাহার বস্ত্রাকর্ষণপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, "পাত্রী কোথায়? চল, অন্য এক বাড়ী গিয়ে বিবাহ দি।"

শশাঙ্ক বাক্য দ্বারা তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া তাহার মস্তকোপরি কুঠার উত্তোলন করিল। হরিদাস 'বাবা রে' বলিয়া দূরে পলাইল। শালকাষ্ঠের তক্তাপোশ সহজে ভাঙ্গিতেছে না। এদিকে শশাঙ্কের মস্তকোপরি অগ্নি প্রবল বায়ুভরে নৃত্য করিয়া জ্বলিতেছে। শশাঙ্ক শরীরের সমস্ত পরাক্রমে তক্তাপোশের উপর এক ভীষণ প্রহার করিল। প্রহারে ঘর কাঁপিয়া উঠিল ও তৎক্ষণাৎ চাল হইতে এক জ্বলন্ত আড়কাঠা ভাঙ্গিয়া শশাঙ্কের পৃষ্ঠদেশে পড়িল; শশাঙ্কও অমনি তক্তাপোশের উপর নিপতিত হইল। হস্তস্থিত কুঠারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। ক্ষতস্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিত বহিতে লাগিল। এদিকে জ্বলন্ত আড়কাঠার আগুনে শশাঙ্কের বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিল। শশাঙ্ক ভীষণ রবে আর্তনাদ করিয়া কহিল, "আমার প্রাণ যায়, রক্ষা কর, আমাকে টেনে বার কর।" বাহিরের লোকেরা পরস্পর পস্পরের মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শশাঙ্ক পুনর্বার আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "আমাকে রক্ষা কর, আমার যথাসর্বস্ব তোমাদিগকে দেব।" ঘর পড়ে পড়ে হইয়াছে। বাহির হইতে কেহই তাহার মধ্যে যাইতে সাহস করিল না। দেখিতে দেখিতে মহাশব্দে অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় জ্বলন্ত চাল শশাঙ্কের উপর নিপতিত হইল। শশাঙ্কের জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

হরিদাস শেষ পর্যন্ত আশা করিয়াছিলেন, অগ্নি নির্বাপিত হইলে তনয়ের বিবাহ দিবেন। এক্ষণে সে ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। হরিদাসের পুত্র ক্ষুণ্ণমনে সহপাঠী বয়স্যদিগের সহিত ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় বেড়াইয়া পরিশেষে তিনিও পিতার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার উপবাস মাত্র লাভ।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ হবো হবো

যে রাত্রে প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল, তাহার পরদিন প্রাতে তিনি উক্ত সংবাদ থানায় পাঠাইয়া দিলেন। হেড্ কনস্টেবল সেই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করণার্থে দারোগাবাবুর নিকটে আসিলেন। দারোগাবাবু তখন বেহুঁস। বড় বড় নিশ্বাস বহিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, ডাকিলে কথা নাই, হস্ত পদ অবশ। রমেশবাবুকে প্রশ্ন করিলে, রমেশ উত্তর দিলেন, তিনি কিছুই জানেন না। তিনি খিড়কির দুয়ারে পাহারায় ছিলেন, সকালবেলা পাহারা বদলি হইয়া আসিয়া

দেখিলেন বাবু অজ্ঞান ও শুনিলেন যে বাড়ীর মধ্য হইতে লোক বাহির হইয়া গিয়াছে। পরে জানিতে পারিলেন, বাহির হইয়া যাইবার সময় তাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে। হেড্ কনস্টেবল ও রমেশ, উভয়ে একত্র হইয়া দারোগাবাবুর পদদ্বয় পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কি জানি, সর্পাঘাতই বা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। শরীরে কোন আঘাতের দাগও নাই। কপালে একটা পুরাতন দাগ মাত্র আছে। হঠাৎ রমেশ দারোগাবাবুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলে তাঁহার বোধ হইল যেন দারোগাবাবুর নিশ্বাসে মদের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি হেড্ কনস্টেবলকে ডাকিয়া কহিলেন, "জমাদারসাহেব, আমার বোধ হচ্ছে যেন বাবুর নিশ্বাসে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে! আপনি একবার দেখুন দেখি?"

হেড্ কনস্টেবল দারোগাবাবুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, "রমেশ ঠিক ধরেছ।"

রমেশ কহিলেন, "মহাশয়, আমরা পুলিশের লোক কি না। কত ফন্দি করে মকর্দমা আস্কারা করতে পারি।"

হেড্ কনস্টেবল কহিল, "তবে এখন উপায়? এস, কেউ না টের পেতে পেতে বাবুর মাথায় জল ঢেলে দেখি, তাতে আরাম হন কি না!"

রমেশ কহিলেন, "মহাশয়, এটা কি ভাল কথা বল্লেন? শেষে যদি ভদ্রাভদ্র হয়, তা হলে আমাদের ঘাড়ে ঝুঁকি পড়বে। আমার মতে ডেপুটি কলেক্টরবাবুর নিকট গিয়া এৎলা দেওয়া উচিত।"

হেড্ কনস্টেবল কহিল, "তা হলে বাবুর চাকরির উপর দোষ পড়বে।"

রমেশ উত্তর করিলেন, "যিনি যে কর্ম করবেন, তিনিই তার ফলভোগ করবেন। আমার ঘাড়ে ঝুঁকি রাখব কেন?"

রমেশের মুখ কালির মত। কথা কহিতে ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে, কিন্তু হেড্ কনস্টেবল সেরূপ হইতেছে না। উভয়ে ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ডেপুটিবাবুর কাছে খবর দেওয়াই উচিত। লোকজন আনিয়া দারোগাবাবুকে তুলিয়া লইয়া যাইবার সময় তিনি যেখানে শুইয়াছিলেন, তাহার নিকট একটা বোতল দেখা গেল। ঘ্রাণ লইয়া রমেশ কহিলেন, "বোধ হয় এই বোতলেই মদ ছিল। বোতলটা আর কি হবে, ফেলে দি।"

হেড্ কনস্টেবল কহিল, "এমন কর্মও করতে আছে? ও বোতলটা চালানের সঙ্গেই পাঠাতে হবে। দেখি, ওর মধ্যে কিছু আছে কি না?"

হেড্ কনস্টেবলের কথা শুনিয়া রমেশ কম্পিতহস্তে বোতলটি উপুড় করিলেন।

ক্ষুদ্র ধারে একটু কাল জলের মতন জিনিস বোতল হইতে পড়িল। রমেশ কহিলেন, "কিছুই নাই।"

হেড্ কনস্টেবল কহিলেন, "ঐ যে কি একটু পড়ল, ওটুকু ফেল্লে কেন? তুমি পুলিশের লোক হয়ে এমন কাঁচা কাজ করলে! দাও, বোতল আমার কাছে দাও।"

বোতলটি দেবার সময় রমেশের হাত ঠকঠক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হেড্ কনস্টেবল বিস্মিত নেত্রে রমেশের মুখপানে নিরীক্ষণ করিলেন। জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট ভিজাইয়া রমেশ কহিলেন, কাল সমস্ত রাত জেগে যেন গা কাঁপছে। স্নান করে একটু ঘুমাতে পারলে বাঁচি।" তৎকালে হেড্ কনস্টেবলের মুখ দেখিলে বোধ হইতে পারিত যে, রমেশের কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। বরঞ্চ তাঁহার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ উদয় হইল।

রমেশ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

হেড্ কনস্টেবল দারোগাকে লইয়া ডেপুটি কলেক্টরবাবুর নিকটে শোয়াইয়া বোতলটি তাহার নিকট রাখিলেন। ডেপুটি কলেক্টর উভয়কেই কৃষ্ণনগর চালান করিয়া দিয়া জমাদারকে নৌকা ডোবার তদারকের ভার দিলেন।

জমাদার, রমেশ ও অন্যান্য কনস্টেবল সকলে একত্র হইয়া যে স্থানে নৌকা ডুবিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া মাঝিদিগকে জলে ডুব দিয়া জিনিসপত্র তুলিতে কহিলেন। তাহারা বস্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছুই পাইল না। তখন জমাদার আরও অন্যান্য লোকজন আনাইয়া নৌকা জল হইতে তুলিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রমদার বাক্স পাইলেন না। অনন্তর হেড্ কনস্টেবল, কি প্রকারে প্রমদা ও প্রমদার মাতা বাটী হইতে বাহির হইলেন, তাহার অনুসন্ধানার্থ শশিভূষণের বাটীতে গমন করিলেন। গমন করিয়া প্রথমতঃ রমেশকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। রমেশ কিছুই জানেন না। তিনি খিড়কিতে পাহারায় ছিলেন। সেদিক্ হইতে কেহই বাহির হয় নাই। পরে হেড্ কনস্টেবল গদাধরের জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কাল রাত্রে কে ছেড়ে দিয়েছিল?"

গদাধরের জননী উত্তর করিলেন, "যে আমার জামাইয়ের বাড়ী কাল চৌকি দিচ্ছিল।"

"তার নাম কি?"

গদাধরের জননী উত্তর করিলেন, "তার নামটি বেশ, ঐ যে আমাদের বাটী আসত, আমার গদাধরচন্দ্রের সঙ্গে যার বড় প্রণয় ছিল। তারপর যে গদাধরচন্দ্রের সর্বনাশ করে টাকাও নিলে, মেয়াদও দিলে।"

হেড্ কনস্টেবল কহিলেন, "আপনি তাকে দেখলে চিনতে পারবেন?"

গদাধরের জননী কহিলেন, "তা কেন পারব না?"

পুনরায় হেড্ কনস্টেবল জিজ্ঞাসিলেন, "গদাধরের কাছ থেকে কে সর্বনাশ করে টাকা নিলে?"

গদাধরের জননী কহিলেন, "গদাধর আর সে, দু'জনে কার চিঠি খুলে টাকা নিত। আমার ছেলের কোন দোষ ছিল না। সেই পাহারাওয়ালাই আমার ছেলেকে শিখিয়ে দেয়। তারপর যখন এর অনুসন্ধান হলো, তখন একদিন এসে বল্লে, আমাকে ১০০ টাকা দাও, না দিলে আমি সব বলে দেব। কি করি বাবু, আমি গরীব মানুষ, টাকা কোথায় পাব। আমার জামাই বড়মানুষ, কিন্তু তা বলে তো আমি বড়মানুষের মাগ নই। আমার যে দু-একখানা গয়না ছিল, আমার মেয়ের কাছে বন্দক রেখে টাকা দিলাম, কিন্তু আবার তার পরদিন সেই পাহারাওয়ালা দারোগাকে ডেকে এনে গদাধরকে ধরিয়ে দিল।" প্রমদার মাতা এতদূর বলিয়াছেন, এমন সময়ে রমেশ কার্যান্তর হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। গদাধরের জননী তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "পাহারাওয়ালা, তোমাকে বৃথা টাকা দিলাম। দেখ, আমার প্রমদার তাও গেল, বাকি যা ছিল তাও গেল।" হেড্ কনস্টেবল পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কাকে টাকা দিয়েছিলেন?"

গদাধরের জননী রমেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

রমেশ বিস্ময় ভান করিয়া কহিল, "তুমি কি আমাকে টাকা দিয়েছিলে?"

গদা জননী। তোমাকেই তো।

রমেশ। না তুমি ভুলেছ।

গদাধরের জননী কহিলেন, "কেন বাপু মিথ্যা কথা কও? আমি কি তোমাকে চিনি নে? তুমি একবার গদাধরের কাছ থেকে এক-শ টাকা নিলে, কাল আবার আমার মেয়ে তোমাকে ২৫ টাকা দেয়। আমি তোমাকে বেশ চিনি। আর চিনবই বা না কেন? একবার দুবার তো দেখা না। গদাধরের সঙ্গে তোমার কতই ভাব ছিল। তুমি রোজই আমাদের বাড়ী আসতে।"

এই কথা শুনিয়া রমেশ আর কথা কলিতে পারিল না। হেড্ কনস্টেবলের মনেও আর সন্দেহ রহিল না। অবিলম্বে তিনি রমেশকে বন্ধন করিয়া চালান দিলেন।

রমেশ তথাপি একবার কহিল, "দেখবেন মহাশয়, আমার কিন্তু কোন দোষ নাই। আপনাকে এর ফল ভুগতে হবে। আমাকে চাষা মনে করবেন না। আমি পুলিশের লোক।"

হেড্ কনস্টেবল কহিলেন, "তুমি পুলিশের লোক, আর আমি কি পুলিশের কেউ নই?" এই বলিয়া একখানি কাগজে চালান লিখিয়া আর দুইজন কনস্টেবলের হাতে রমেশকে সমর্পণ করিলেন।

দীনবন্ধুবাবু তিন দিবস নিদ্রার পর গাত্রোত্থান করিলেন। ডাক্তারসাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই দারোগাবাবুর সে নিদ্রা মহানিদ্রা হয় নাই। জাগ্রত হইয়া তিনি মেজেস্টর সাহেবের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এদিকে ডাক্তারসাহেব বোতল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বোতলে সুরা ও অহিফেন ছিল।"

রামধনের হাজত হইল। কিন্তু রামধন নির্দোষিতার প্রমাণ দিয়া খালাস হইয়া আসিল। সে মদের সহিত কিছুই মিশ্রিত করে নাই। তবে কে করিল?

এই গোলযোগের সময় শশিভূষণের বাটীর নিকট একটি লোক ডাক্তারি করিত। সে কহিল, "রমেশবাবু একদিন রাত্রে পেটের পীড়া হয়েছে বলে লডেনম্ (অহিফেনের আরক) লইয়া গিয়াছিলেন। রমেশবাবু নগদ মূল্য দেন নাই, এজন্য তাঁহার খাতায় তাঁহার নামে চারি আনার লডেনমের খরচ লেখা রহিয়াছে।" এই কথা প্রকাশ হইবামাত্র থানায় খবর হইল। তিন দিবস পরে তাঁহার নামে কৃষ্ণনগরে গিয়া সাক্ষ্য দিবার হুকুম আসিল। ডাক্তার কৃষ্ণনগরে গিয়া সাক্ষ্য দিল যে, অমুক দিবস রাত্রে রমেশ পেটের পীড়া হইয়াছে বলিয়া চারি আনার লডেনম্ লইয়াছিল। তারিখ ঐক্য করায় প্রকাশ হইল যে, সেই রাত্রেই দীনবন্ধুবাবু অজ্ঞান হন। রমেশের ভরা সম্পূর্ণ বোঝাই হইল। রমেশের নানাবিধ দোষ বাহির হইতে লাগিল। প্রথমতঃ গদাধরের সহিত নোট চুরি, পরে উৎকোচ গ্রহণ, তদনন্তর উৎকোচ লইয়া প্রমদা ও তাঁহার জননীকে ছাড়িয়া দেওয়া, দীনবন্ধুবাবুকে সুরার সহিত আফিং সেবন করানো হয়, ইহাতে দীনবন্ধুবাবুর মৃত্যু হইতে পারিত। এই সমস্ত দোষ একত্র হওয়ায় রমেশ পুলিশের লোক হইয়াও আর কথা কহিতে পারিল না। জজ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার কোন ছল আছে?" রমেশ অধোবদনে নীরব হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে জুরীরা তাহাকে সমুদয় অপরাধেই দোষী করিলেন। অনন্তর জজ সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই হলো

দুঃসহ মনঃকষ্টে গোপাল রজনী অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার নিকট সে রাত্রি অবসান হয় না। এক এক দণ্ড যেন এক এক প্রহরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রজনীকে শান্তিদায়িনী বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তিনি কাহাকে শান্তিপ্রদান করেন? যাহারা মনাগুনে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদিগকে না; যাহারা শয্যাগত রোগী, তাহাদিগকে, না; যাহারা দীন-দুঃখী, তাহাদিগকে না; এ সমস্ত লোকের চিন্তাক্লেশ যামিনীযোগেই বৃদ্ধি হয়। রজনী সমাগত হইলেই ইহারা আপন আপন মনের হুতাশনে দগ্ধ হইতে থাকে। যাহারা দুগ্ধফেনসন্নিভ পর্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া থাকে, অনবরত দাস-দাসী যাহাদিগকে ব্যজন করে, রতি হইতে রূপবতী কামিনী যাহাদিগের তুষ্টি বর্ধন করে, রজনী তাহাদিগকে শান্তি দান করেন। করিবেন না কেন? সকলেই যাহাদিগের পদলেহন করে, যামিনী কোন্ মুখে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন?

রজনী প্রভাত হইলে পূর্বদিক হইতে দিবাকর দর্শন দিলেন। সাহেববাহাদুর জানালা খুলিয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। রেলওয়ের বাবুরা পিরান ও লালবঁধকরা জুতা পায়ে যে যাহার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তারের খবর চলিতে লাগিল, ঘোর রোলে ঘণ্টা বাজিয়া টিকিটগ্রাহীদিগকে আহ্বান করিল। হুস্ হুস্ শব্দ করিয়া ট্রেন আসিল। আবার ঘণ্টা বাজিল, পতাকা উড়িল, স্টেশন-মাস্টার "অল রাইট্" বলিল। সদম্ভে ধরণী কাঁপাইয়া লৌহ-অশ্ব পুনরায় ধাববান হইল।

দু-বার তিনবার গাড়ী এল গেল। গোপালের চিন্তায় শরীর শুকাইয়া যাইতেছে। এক রাত্রের মধ্যে তাঁহার এরূপ চেহারা হইয়াছে, যেন তিনি কতদিন উপবাস করিয়া আছেন। ক্রমে ক্রমে দশটা বাজিল। তখন সাহেববাহাদুর গোপালের নিকট হইতে মূল্য লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন।

গোপাল একটার সময় শ্রীরামপুর আসিবার জন্য পুনরায় বাষ্পীয় শকটারোহণ করিলেন।

গাড়ীতে আসিতে আসিতে গোপালের মনে কত ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। কখন ভাবিতে লাগিলেন, "স্বর্ণলতা চিরদুঃখ-হ্রদে নিমজ্জিত হইয়াছেন। কখন ভাবিতে লাগিলেন, স্বর্ণ তেমন নয়! হয়ত আত্মহত্যা করিয়াছেন। ভাবিতে কি ভয়ানক? যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তবে আমার দোষেই করিয়াছে। কেনই বা

আমি ঘুমাইয়াছিলাম? স্বর্ণলতার যদি বিবাহ হইয়া থাকে, কিংবা স্বর্ণ যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন। লৌহ-অশ্ব যথাকালে শ্রীরামপুর পৌঁছিল। ব্যগ্র হইয়া গোপাল গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট দিয়া স্টেশনের বাহিরে গেলেন। শশাঙ্কের বাটী জিজ্ঞাসা করিয়া অনেকক্ষণের পর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাড়ীঘর কিছুই নাই, কেবল কয়েকটি ভস্মরাশি রহিয়াছে, আর পুলিশের লোক তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। দেখিয়া গোপালের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, পদদ্বয় বলহীন হইয়া পড়িল, এবং মস্তক ঘুরিতে লাগিল। গোপাল ভাবিলেন স্বর্ণলতা যথার্থই আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই চিন্তা মনে হওয়াতে গোপাল আর চলিতে পারিলেন না। রাস্তায় শিরে কর সংলগ্ন করিয়া উপবেশন করিলেন। একটি কনস্টেবল তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গোপালের এমন সাহস হইল না যে, কনস্টেবলকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন।

ক্ষণকাল তথায় বসিয়া গোপাল সাহসে ভর করিয়া ভস্মরাশির নিকট গমন করিয়া বিনীতভাবে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশায়, এখানে কি হয়েছে? আপনারা কিসের তদারক করছেন?”

দারোগা গোপালের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গোপাল কোন দুঃসহ মনঃপীড়া পাইয়াছেন। তখন উত্তর করিলেন, “ঘরে আগুন লেগে এ বাটীর কর্তা শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাহারই অনুসন্ধান করছি। শশাঙ্ক-শেখর কি আপনার কেউ ছিলেন?”

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, “না মহাশয়, শশাঙ্কশেখর আমার কেউ ছিলেন না। কিন্তু এখানে আর কোন ঘটনা হয় নি? কেউ কি আত্মহত্যা করেছে?”

দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, “না না। কেন, সে কথা তোমার মনে হলো কেন?”

গোপাল কহিলেন, “আমার ভগিনী এইখানে ছিলেন। শশাঙ্ক জোর করে তার বিবাহ দেবার উদ্যোগ করেছিলেন। আমি সন্ধ্যাবেলা ভগিনীকে নিয়ে যেতে আসছিলাম। কিন্তু গাড়ীতে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় আমার চৈতন্য রহিত হয়। বর্ধমানে গিয়ে আমার চেতনা হলো। আমার ভগিনী লিখেছিলেন, যদি কেউ তাঁকে না নিতে আসে, তা হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।” এই কথা বলিতে বলিতে গোপালের চক্ষু হইতে সহস্রধারে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল।

দারোগাবাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “ভয় নাই, আপনার ভগিনী

নিরাপদে আছেন। এখানে কেবল একমাত্র শশাঙ্করেই কাল হয়েছে। সাক্ষী পাওয়া গিয়েছে, আপনার ভগিনী আগুন লাগতে লাগতেই পালিয়েছিলেন।"

গোপাল দারোগাবাবুর কথা শুনিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ও চক্ষু রক্তবিহীন হইল এবং হস্ত-পদ কম্পিত হইতে লাগিল। দারোগাবাবু তাঁহাকে সাদরে বিছানায় বসাইয়া, তাঁহার মুখে ও মস্তকে জল দিতে লাগিলেন। একটু পরেই গোপাল সুস্থ হইলে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসিলেন "আপনার কি কোন পীড়া আছে?"

গোপাল কহিলেন "না।"

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার আহার হয়েছে?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "কাল রাত অবধি কিছু আহার করি নাই।"

দারোগাবাবু অবিলম্বে:গোপালের জন্য খাবার আনাইলেন। গোপাল কোন মতেই আহার করিবেন না। কহিলেন, "আমার ভগিনীর অনুসন্ধান না করে জলগ্রহণ করব না।"

দারোগাবাবু কহিলেন, "আপনার গায়ে শক্তি না থাকলে কি প্রকারে অনুসন্ধান করবেন? আপনি আগে আহার করুন, পরে আমার একজন লোক আপনার সঙ্গে পাঠায়ে দেব।"

দারোগাবাবুর কথায় গোপাল কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। আহার করিয়া দারোগা-বাবুকে কহিলেন, "আপনি তবে অনুগ্রহ করে একজন লোক আমার সহিত দিন।"

দারোগাবাবু একজন কনস্টেবল দিলেন। গোপাল কনস্টেবলের সহিত প্রতি গৃহে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোনখানেই স্বর্ণের দেখা পাইলেন না। কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "স্বর্ণলতা হয় আত্মহত্যা করিয়াছে, নচেৎ পুড়িয়া মরিয়াছে।" গোপাল আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। একটু পরে কনস্টেবলকে বিদায় দিয়া গোপাল গঙ্গাতীরে গিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন।

গোপাল যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে জনকতক নৌকার মাঝি তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। একজন কহিল, "তুই তো এর কিছু চিনিস্ নে? এর দাম কত জানিস্?" আর একজন কহিল, "এর আবার দাম কি? তুই আমার সঙ্গে যাস্, তোর যত খুশি, আমি তোকে এমনি পাথর দেব।"

তৃতীয় এক ব্যক্তি কহিল, "ওর দাম থাকুক আর না-থাকুক, সোনার দাম তো আছে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনর্বার কহিল, "এ তো সোনার না। বড়মানুষে কি আজকাল সোনা পরে?"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, “বড়মানুষে পিতলের গয়না পরে, আর তোর ঘরে সব সোনার গয়না, না ?”

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “আমার বাড়ী সোনার গয়নাই তো ? তার আর মিথ্যা কথা কি ? বড়মানুষে পেতল পরলে লোকে বলে সোনা, কিন্তু আমরা যদি মোহর গলায় গেঁথে দি, তবু লোকে বলে পেতলের মোহর।”

যাহার সেই সোনা ও পাথরটি, সে কহিল, “আচ্ছা তোমাদের গোলযোগে কাজ নাই। আমার জিনিস, আমাকে দাও। সোনা হয় আমার থাকবে, পেতল হয় তাও আমার থাকবে।”

প্রথম ব্যক্তি কহিল, “আমি বললাম ঠিক। এর দাম ঢের টাকা। বিশ্বাস না হয়, চল—ঐ একটি ভদ্রলোক শুয়ে আছে। ওর কাছে জিজ্ঞাসা করি।”

সকলেই তাহার কথায় সায় দিয়া গোপালের নিকট আসিয়া তাঁহার হস্তে একটি আংটি দিয়া কহিল, “মহাশয়, এ আংটিটির কি দাম আপনার পছন্দ হয় ?”

গোপাল আংটিটি হাতে পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, পরে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ আংটি তোমরা কোথায় পেলে ?”

গোপালের চক্ষু হইতে যেন জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। পূর্বে মৃতের মতন ছিলেন, হঠাৎ যেন তাঁহার উৎসাহ বর্ধন হইল। আংটিটি স্বর্ণলতার, গোপাল দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন।

নাবিকেরা তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। যাহার আংটি, সে কহিল, “মশাই; কাল সন্ধ্যার পর আমি দুটি স্ত্রীলোককে পার করে দিয়েছিলাম। তাদের পয়সা ছিল না। পয়সার বদলে আমারে এই আংটি দিয়েছে।”

নাবিকের কথা শুনিয়া গোপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, “তবে এখনও জীবিত আছে।” পরে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, “সে স্ত্রীলোক দুটি কোথায় গিয়েছে ?”. নাবিক কহিল, শশাঙ্কশেখর ঠাকুরের চাকরাণীর মাসীর বাড়ী গিয়েছে।”

গোপাল কহিল, “এ আংটিটির দাম অতি কম হলেও ত্রিশ টাকা হবে। তোমরা কেউ যদি আমাকে সেই বাড়ী রেখে আসতে পার, তবে আমি আর পাঁচ টাকা দি।”

চারিজন নাবিক সকলেই কহিল, ‘আমি যাব, আমি যাব।” যে স্বর্ণলতাকে পার করিয়াছিল, সে কহিল, “তোরা কেউ যেতে পাবি নে। আমি সে বউটিকে পার করিছি, তার সোয়ামিকেও পার করব।” নাবিক কেন স্বর্ণকে বউ মনে করিল, আর গোপালকেই বা কেন স্বর্ণের স্বামী ভাবিল, তাহা সেই নাবিকই জানে।

গোপাল তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পার হইয়া নাবিক তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া নাবিক কহিল, "ঐ সে বাড়ী। আমার বকশিস দাও।"

গোপাল নাবিককে যে পাঁচ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা তদ্দণ্ডে প্রদান করিলেন। পরে দুই চারি পা সম্মুখে গিয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার কাছে আর একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। গোপাল দ্রুতপদে তথায় গিয়া, 'স্বর্ণ' বলিয়া ডাকিলেন; এবং স্বর্ণ তাঁহার নিকটে না আসিতে আসিতেই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই হইয়াছে

চেতনা পাইয়া গোপাল দেখিলেন, তিনি স্বর্ণলতার জানুর উপর শির স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। স্বর্ণলতা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছেন এবং শশাঙ্কের দাসী নিকটে ঘটিতে জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলে স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ? একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?"

গোপাল কহিলেন, "আমি কোথায় আছি?"

স্বর্ণ উত্তর করিলেন, "তুমি আমার কাছে আছ, আমি স্বর্ণ; এখন কি একটু ভাল বোধ হচ্ছে?"

গোপাল যেন সমুদয় স্মরণ করিয়া লইবার জন্য একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "আমি ভাল হইছি।"

গোপাল স্বর্ণলতার জানু হইতে শির উত্তোলন করিলেন। গোপালের মনে হইতে লাগিল, "এমন উপাধান পাইলে যাবজ্জীবন মূর্ছিত হইয়া কাটাইতে পারি।"

আবার ক্ষণকাল পরে গোপাল চক্ষু মেলিলেন। স্বর্ণলতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ?

গোপাল অতি অনিচ্ছাপূর্বক আস্তে আস্তে মস্তক উঠাইয়া কহিলেন, "আমি ভাল হইছি। কিন্তু তুমি এখানে কেমন করে এলে?"

স্বর্ণলতা কহিলেন, "এখনি তুমি সে কথা শুনতে পারবে না; একটু পরে বলব।" এই বলিয়া স্বর্ণলতা তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। একটু পরেই পুনরায় গোপালের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিলেন। স্বর্ণ

বহু দিবস গোপালকে দাদা বলিয়া ডাকা ছাড়িয়াছেন। গোপাল মনে করিতেন, তিনি দরিদ্র বলিয়া স্বর্ণ তাঁহাকে আর দাদা বলিয়া সম্বোধন করেন না, কিন্তু স্বর্ণলতার জানুর উপরে শয়ন করা অবধি তাঁহার সে চিন্তা দূর হইয়া আর এক প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি এক্ষণে আদ্যোপান্ত দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন। গোপালের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না।

স্বর্ণলতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখিলেন, ঘরের মধ্যে স্বর্ণলতা তাঁহার জন্য জলখাবার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। গোপালকে স্বর্ণলতা সেই জলখাবার খাইতে কহিলেন।

গোপাল যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া বসিলেন। স্বর্ণলতা আদ্যোপান্ত আপনার ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। স্বর্ণলতা কখন গোপালকে রাগ করিতে দেখেন নাই, কিন্তু অদ্য যখন তিনি শশাঙ্কের শঠতার কথা শ্রবণ করিলেন, তখন স্বর্ণলতা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তাঁহার নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ হইল। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, এবং দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। স্বর্ণলতার কথা শেষ হইলে গোপাল কহিলেন, "তবে আর আমার শশাঙ্কের মৃত্যুতে এক বিন্দুও দুঃখ নাই।"

স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসিলেন, "শশাঙ্কের ঘরে কি রকম করে আগুন লেগেছিল?" গোপাল আরক্তিম মুখ অবনত করিয়া কহিলেন, "শুনলাম, লুচি ভাজতে ভাজতে সেই ঘৃত জ্বলে উঠে আগুন লেগেছিল।"

এই কথা বলিয়া গোপাল আপনার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্ণলতা যেই শুনিলেন যে, পাছে হেমের পীড়া বৃদ্ধি হয় বলিয়া গোপাল স্বর্ণের আসন্ন বিপদের কথা তাঁহাকে না জানাইয়া নিজে স্বর্ণের উদ্ধারার্থে বাহির হইয়া গেলেন, অমনি তাঁহার চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। গোপালের বর্ধমানে গমন ও কারাবাসের কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা পূর্বাপেক্ষা প্রবলবেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সে রাত্রে গোপালের ও স্বর্ণের কাহারও নিদ্রা হইল না।

পরদিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া শশাঙ্কের পূর্ব দাসী ও স্বর্ণলতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গোপাল বারাকপুর স্টেশনে গিয়া রেলওয়ে উঠিলেন। অবিলম্বে শিয়ালদহে পৌছিলেন এং তথা হইতে গাড়ী করিয়া বকুলতলা স্ট্রীটে হেমের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

হেম এক্ষণে চলিয়া বেড়াইতে পারেন। সকালে গাত্রোত্থান করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গাড়ী গিয়া দ্বারে উপনীত হইল। গোপাল অগ্রে বাহির হইলেন, হেম হস্ত প্রসারণপূর্বক গোপালের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার

ভবানীপুরে কি এমন কর্ম ছিল যে, আজ তুমি তিন দিন সেইখানেই বসে আছ?"

গোপাল কথা কহিবেন, এমন সময় গাড়ীর অভ্যন্তর হইতে শশাঙ্কের দাসী ভূমে অবতরণ করিল। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "এ আবার কে?" হেমের প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে স্বর্ণলতা নামিলেন। হেম পূর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "স্বর্ণ কোথা হতে এলে? এস দিদি এস।" এই বলিয়া হেম স্বর্ণের কাছে গেলেন। স্বর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে হেমের হস্ত ধারণপূর্বক গৃহের মধ্যে আসিলেন।

এক দিবস গোপাল ও হেম একত্র বসিয়া আছেন। হেম এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। গোপালের চেহারা কিন্তু আর পূর্বের মত নাই। হেম এত দিনের পর ইহার কারণ জানিতে পারিলেন, জানিতে পারিয়া হেমের যারপর-নাই আহ্লাদ হইল। তিনি দেখিলেন যে, উভয়ের অনুরাগ উভয়ের প্রতি সমান, ইহাদিগের বিবাহ হইলে পরমসুখে কাল যাপন করিবে।

হেম ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "গোপাল, তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কি কথা?"

হেম কহিলেন, "তোমার সেই—বৎসরকার পূজার সময়ের কথা মনে পড়ে?"

গোপাল কহিলেন, "হাঁ পড়ে।"

হেম কহিলেন, "আচ্ছা, একদিন তুমি আর আমি দালানের রোয়াকে বসেছিলাম, এমন সময়ে বাবা এসে তথায় বসলেন এবং একটু পরেই স্বর্ণলতার বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। সে কথা তোমার মনে আছে?"

গোপাল কহিলেন, "হাঁ আছে।"

হেম। "স্বর্ণলতার বিবাহের কথা উত্থাপন হলে তুমি তথা হতে চলে যাচ্ছিলে। বাবা বললেন, তোমার উঠবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি বল্লাম, তোমার শরীর অসুস্থ আছে। উঠে যাওয়াই ভাল। তাই শুনে তুমি মুখ বাঁকিয়ে উঠে গেলে। সে কথা মনে পড়ে?"

গোপাল লজ্জাবনতমুখে উত্তর করিলেন, "পড়ে।"

হেম কহিলেন, "আচ্ছা, এখন বল দেখি, আমি উঠে যাওয়ার পোষকতা করেছিলাম কেন?"

গোপাল। "আমি বলতে পারলাম না।"

হেম কহিলেন, "পারলেও তুমি বলবে না। আমি বলি শোন। তোমার

সহিত স্বর্ণের বিবাহ দেবার প্রস্তাব করব বলেই তোমাকে আমি সরায়ে দিলাম। তুমি মুখ বক্র করলে, তা আমি দেখেছিলাম। কিন্তু কিছু বললাম না।"

গোপালের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার সহিত স্বর্ণের বিবাহ দিতে বাবার একমাত্র আপত্তি এই ছিল যে, তোমার ধন নাই। গোপাল, রাগ করো না। আমি আমার কথা বলছি না। বাবা যা মনে করতেন, তাই বলছি। তাঁহার একমাত্র আপত্তি ছিল যে, তোমার ধন নাই। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে এতদিন আমি তোমার সহিত স্বর্ণের বিবাহ দেওয়াতাম। তাঁর কাল হয়েছে বলেই তোমাদের বিবাহের দেরি হয়ে পড়েছে। এখন আমার কথা এই, যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তোমার পিতাকে চিঠি লিখে আনিয়ে তুমি স্বর্ণের পাণিগ্রহণ কর।"

হেমের কথা শুনিয়া গোপালের চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। গোপাল কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। হেম কহিলেন, "আর তোমার কথায় কাজ নাই, আমি সব বুঝেছি। এখন তোমার বাপকে পত্র লেখ।"

গোপাল ও স্বর্ণলতার বিবাহ হইয়াছে।

শশিভূষণের মোকর্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া শশিভূষণ অব্যাহতি পাইয়াছেন। মুহুরি, হিসাবনবিস ও খাতাঞ্জি, প্রত্যেকের কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। শশিভূষণের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিপিন, কামিনী ও তিনি গোপালের বাটীতে থাকেন।

প্রমদা পিত্রালয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁহার ভরণপোষণের ব্যয় গোপালকে দিতে হয়। এজন্য গোপাল তাঁহাকে নিজ বাটী আনিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিলেন। কিন্তু শশিভূষণ তাঁহাকে সে যত্ন হইতে নিরস্ত করিলেন। পিত্রালয়ে প্রমদার কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। সকলেরই সহিত কলহ করিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার মাতার সহিত মাঝে মাঝে কথা কহেন।

বিধুভূষণ ডেপুটি কলেক্টরবাবুর নিকট হইতে আসিয়া বাটী বাস করিতেছেন। তাঁহার অল্প বয়সেই সমুদয় কেশ শুক্ল হইয়াছে। তাহাকে এক্ষণে শশিভূষণ অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ দেখায়। স্বর্ণলতার একটি পুত্র হইয়াছে। বিধুভূষণ সমস্ত দিবস সেই পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া খেলা দেন। স্বর্ণলতা আদর করিয়া পুত্রটির নাম গ্যাপাল রাখিয়াছেন।

হেমচন্দ্র বৎসরের মধ্যে ছয় মাস স্বর্ণলতার বাটিতে আসিয়া থাকেন। তিনি যখন আসেন, তখন গোপালের ও স্বর্ণলতার আনন্দের সীমা থাকে না। একবার আসিলে হেমচন্দ্র সহজে আর নিজ বাটী গমন করিতে পারেন নাই। যদি তিনি কোন কারণবশতঃ নিয়মিত মাসে না আসিতে পারেন, তাহা হইলে স্বর্ণলতা ও গোপাল উভয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হন ও রাগ করেন।

শ্যামা বাটীর গৃহিণীস্বরূপ থাকেন। স্বর্ণলতা তাহাকে নিজের শাশুড়ির ন্যায় ভক্তি ও যত্ন করেন।

নীলকমলের উপর বিধুভূষণের অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। উভয়েই বড় দুঃখে প্রথমেই বাটী হইতে অর্থোপার্জনে নিষ্ক্রান্ত হন। বিধুভূষণ এক্ষণে সুখী হইয়া নীলকমলকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার বড় ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও নীলকমলের দেখা পাইলেন না।

ব্যাখ্যা ও টীকা-টীপ্পনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ ও বিধুভূষণ—দুই ভাইয়ের আখ্যান লইয়া রচিত উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্পের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে কম নয়। ইংরেজীতে Two brothers' theme বলিলে এই ধরনের ভ্রাতৃবিরোধমূলক আখ্যানগুলিকে বুঝিবার সুবিধা হইবে, এমন আশঙ্কা হইতেছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে এই বিরোধ কখনও যে তিন বা ততোধিক ভাইয়ের বিচিত্রভঙ্গিম দ্বন্দ্ব ও স্বার্থসংঘাতে পরিণত না হয় এমন নয়। 'প্রফুল্ল'-এর মতো পারিবারিক নাটকে গিরিশচন্দ্র এই আখ্যানভিত্তিকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার সাহায্যে নানা নাটকীয় জটিলতা ও গ্রন্থিসংকুল ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই দ্বি-ভ্রাতৃক বা বহু-ভ্রাতৃক আখ্যানের মূল নীতিটি সম্ভবত এইরূপ: ভাইদের মধ্যে চরিত্রগত বিসদৃশতা থাকিবেই; দুই ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের হইলে সুবিধা বরং বেশী। দুইটি বিপ্রতীপ চরিত্র পরস্পরের কাছাকাছি থাকায় Contrast বা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। সেই বি-সমতাজনিত বৈচিত্র্যসৃষ্টি লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই এই শ্রেণীর theme বা কাহিনীকল্পে প্রায়শই দেখা যায়—এক ভাই ভালো, অন্য ভাই নিতান্তই মন্দ; এক ভাই বাহিরে দেখিতে মূঢ় রগচটা খ্যাপাটে বাউণ্ডুলে গোছের, কিন্তু অন্তরে অতিশয় সরল মধুরস্বভাব পরোপকারী, সেহেতু জনপ্রিয়; অন্য ভাই বাহিরে শান্ত স্থির অনুত্তেজিত ও সজ্জন, ভিতরে স্বার্থপর কুচক্রী ক্রূরকর্মা এবং ভাইয়ের ক্ষতিসাধনে তৎপর। বাংলা ভাষায় 'ভ্রাতৃনির্যাতনের আখ্যান' বলিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হইবে বলিয়া ভরসা করি। সচরাচর নির্যাতিত ভাইটিকেই লেখক নায়ক করিয়া দেন, ফলে বেচারা সমস্ত নিগ্রহের পুরস্কারও পাইয়া যায় লেখকেরই হাতে। অন্য ভাইটি হইয়া দাঁড়ায় প্রতিনায়ক। বহু বাঙালী লেখক তাঁদের গ্রন্থে নায়ক ও প্রতিনায়ক এই দুই ভূমিকার জন্য এক পরিবারের মধ্যেই খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন এবং 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'-য়ের জন্য বিশ্রুত দেশে তাঁহাকে বিশেষ শ্রম করিতে হয় নাই। বাংলাদেশের একান্নবর্তী পরিবার উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ঔপন্যাসিকদের বেশ সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। যৌথ পরিবারের মধ্যে নানা বিরোধী শক্তির সমাবেশের ফলে নানা ব্যক্তিত্বের নানামুখী বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল সুতরাং গত শতাব্দীর কথাকারগণ এক পরিবার হইতেই নায়ক এবং খলনায়ককে [villain] সংগ্রহ করিতে পারিতেন। রক্তের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে

নায়ক ও খলনায়ক হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না, বরং ঐ রক্তের সম্বন্ধটাই ছিল লেখকের একটা মস্তবড় অস্ত্র। তিনি প্রায়ই সেই অস্ত্রটা রৌদ্রে ঘুরাইয়া পাঠকের চোখ ঝলসাইয়া দিয়া বলিতেন, 'ছাখো, দুই ভাই—এক পিতার সন্তান ইহারা, অথচ দুইজনের স্বভাবের গতি কী দুঃসহরূপে বিমুখী! মানুষ কী বিচিত্র জীব!' ঐ দুই ভাইয়ের ইচ্ছা ও প্রবণতার সংঘর্ষ আমাদের পরিবারকেন্দ্রে নানা শক্তিশালী আন্দোলন আনিয়াছে। এই শ্রেণীর উপন্যাস নাটক গল্প ইত্যাদির মধ্যে যে আমাদের সামাজিক বিবর্তনের ধাপগুলি সুচিহ্নিত আছে তাহা দেখিতে দিব্যদৃষ্টির দরকার হয় না। বৈমাত্রেতা কখনও এই ভ্রাতৃসংঘাতকে ঘোরালোতর করিয়া তুলিয়াছে। সহোদর ভাইদের বিরোধের তুলনায় সৎ ভাইদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে লেখক আরও দু-একটি বাড়তি হৃদয়াবেগের মশলা মিশ্রিত করিবার সুযোগ পাইতেন, ফলে কাহিনীর তীব্রতা একটু বৃদ্ধি পাইত। খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো, মামাতো-পিসতুতো ভাইরাও যে লড়াইয়ে না নামিয়াছে এমন নয়।

এই ভ্রাতৃনির্যাতনের আখ্যান তারকনাথের পর বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই অনুসৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তারকনাথই এই Two brothers' theme-এর আদি প্রবর্তক নন, তবু বাংলা সাহিত্যে তিনি ইহার প্রথম উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা। রূপকথায় যদিও আমরা ভ্রাতৃবিরোধের তেমন উল্লেখ পাই না—রূপকথার অলৌকিক জগৎ 'সাত ভাই চম্পা' ও 'শীত-বসন্তে'র অলৌকিক ভ্রাতৃপ্রেমের জগৎ ; কিন্তু গ্রাম্য লোক-কথায় 'চালাক ভাই বোকা ভাইয়ের' কাহিনীতে এই আখ্যানের বীজ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয়।[১] আরব্য উপন্যাসের আলিবাবা ও কাশেমের কাহিনী এই দ্বিভ্রাতৃক কাহিনীকল্পের একটি মধ্যযুগীয় নিদর্শন। একথা নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে হইবে না যে রচয়িতা, পাঠক কিংবা ভাগ্যলক্ষ্মীর পক্ষপাত সবসময় সেই ভাইয়েরই দিকে যে ভাই দুর্বলতর, দরিদ্রতর, যে দেখিতে আপাতনির্বোধ। সে নীতিমান্ ও পাপবুদ্ধিহীন বলিয়াই গল্পের শেষে তাহার জয় ও সুখসৌভাগ্যলাভের আশা সুনিশ্চিত। এই উপন্যাসে শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাইয়েরই নামের অর্থ এক, কিন্তু চরিত্রের বিচারে দুই জনের মধ্যে মহাসমুদ্রের ব্যবধান। শশিভূষণ-বিধুভূষণ আমাদের বেদনাহত বিষাদের সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দেয় যে আমাদের সমাজ রামলক্ষ্মণ ও পঞ্চপাণ্ডবের আদর্শ

১. পাঠকদিগকে সেই গ্রাম্য কাহিনীটি স্মরণ করিতে বলি, যাহাতে বড় ভাই ছোট ভাইকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া নিজে ষোলো আনা লাভ করিবার দুশ্চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি দুধেল গাই, আর একটি নারিকেল গাছ। সদাশয় দাদা ছোট ভাইকে গাইটির সম্মুখের দিকটি এবং নারিকেল গাছের গোড়ার দিকটা আধাআধি বখরা দিয়াছিল। সে উদারতার [!] পুরস্কার হইতে চালাক দাদা বঞ্চিত হয় নাই।

হইতে বহুকাল ভ্রষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসে আমরা ভারত-ঈশ্বর শাজাহানের পুত্রদের মধ্যে ভয়াবহ আত্মঘাতী বিরোধ দেখিয়াছি। সেই বিরোধের মূলে ছিল প্রাংশুলভ্য স্বার্থের প্রবর্তনা—সব ভ্রাতৃবিরোধের মূলেই বোধ হয় তাহাই থাকে। বিশেষ করিয়া তারকনাথ হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে যত গল্প-উপন্যাস-নাটক এই ভ্রাতৃনির্যাতনকে সম্বল করিয়া লেখা হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিরই প্রেরণা এই স্বার্থ, যদিও তাহা সাম্রাজ্যলাভের মতো এত বিরাট কিছু নয়। বাংলাদেশে একান্নবর্তী পরিবারপ্রথার শাসনকালে স্বার্থের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ সহজেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিত। এই ভ্রাতৃসংঘাতের মধ্যেই বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্গময্যমান অঙ্কুরটিকে আবিষ্কার করা যায়। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গনারী' নাটকে, রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে' ও 'গল্পগুচ্ছে'র কয়েকটি গল্পে, শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল' কিংবা 'মামলার ফল'-এ—ভ্রাতৃনির্যাতনের এই আখ্যানভিত্তিটিকে সার্থকভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে।

'বোধ হয় বেতন না থাকিলেও'...ইত্যাদি। যোগ্য ঔপন্যাসিকের একটি মাত্র গুণ সর্বাগ্রে থাকা প্রয়োজন, তা হইল সমাজ অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও পর্যবেক্ষণের গভীরতা। উদ্ধৃত মন্তব্য বাংলাদেশের জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবিকাগুলি সম্বন্ধে যে কটাক্ষ করা হইয়াছে তাহা তারকনাথের সমৃদ্ধ জীবনচারিতার পরিচয় দেয়। উপন্যাসের 'milieu' বা পারিপার্শ্বিক রচনার জন্য মানুষ ও তাহার আচার-আচরণ [man and manners] সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রয়োজন তাহা তারকনাথের পুরামাত্রাতেই ছিল। এই উক্তি এবং 'মূর্খতাবশতঃ কখন কুলীনের বিবাহ বন্ধ থাকে না' তারকনাথের ব্যঙ্গনৈপুণ্যের নিদর্শন বটে। সচরাচর ব্যঙ্গকার মাত্রেই কিছুটা মুক্তদৃষ্টির অধিকারী—আমাদের সমাজের বহুজীর্ণ কু-প্রথাগুলি সম্বন্ধে সুশিক্ষিত ও মার্জিতবুদ্ধি তারকনাথের মনে বিশেষ প্রশ্রয় ছিল না, ইহা স্পষ্ট। কিন্তু এই উক্তি দুইটিতে তারকনাথের ব্যঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিতে হইবে। সে ব্যঙ্গের দেহ কখনোই ভলতেয়ারের ব্যঙ্গের মতো সর্বধ্বংসী বিস্ফোরণের বারুদ দিয়া নির্মিত হয় না। তারকনাথের ব্যঙ্গ সমাজ-সমুদ্রের উপরিতলে অস্বস্তির মৃদু তরঙ্গ তুলিয়াই শান্ত হইয়া যায়, আমাদের হাসায় এবং হাসির মধ্যে আমাদের যৎসামান্য বিব্রত করে, কিন্তু কখনোই মর্মান্তিক আঘাতে কাতর ও বিপর্যস্ত করিয়া তোলে না। তারকনাথ আর যাহাই হোন, ভলতেয়ারের মতো বিপ্লবী নন, তাঁহার ব্যঙ্গের সহিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গের সাদৃশ্য আছে। তাঁহার মধ্যে একটি উদার আতিথ্যের মনোভাব আছে, যেন কৌতুকমাত্র করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতে চান, যা চলিতেছে অতঃপর আবার চলুক। পুরাতন মূল্যবোধ ও সুচিরপ্রতিষ্ঠিত

মানবনীতিগুলির মধ্যে কোনো অভাবিত বিপর্যয় আনার বাসনা তাঁহার নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ ও মানব জীবনের পুনর্বিচার করিয়াছেন, নূতন গ্রহণ-বর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকস্থলে আমাদের আত্মপ্রসাদের ভিত্তিমূলটিকে নড়াইয়া দিয়াছেন। তারকনাথের সেধরনের কোনো সাজ্যাতিক ইচ্ছা দেখা যায় না। কৌলিন্য-প্রথা সম্বন্ধে যে অসহিষ্ণুতা রামনারায়ণ তর্করত্নকে নাটক লিখিতে প্ররোচিত করিয়া সামাজিক আন্দোলনের অংশীদার করিয়াছিল, রমেশচন্দ্র দত্তকে দিয়া জাতিভেদবিরোধী উপন্যাস লিখাইয়াছিল—পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির সেই অসহিষ্ণুতা তারকনাথ গ্রহণ করেন নাই। তারকনাথ সমাজের কেন্দ্রাভিগ সংগঠনটিকে বিচলিত করিতে চান না। তাই তাঁহার ব্যঙ্গে মৃদু তীব্রতা আছে, কিন্তু দংশনের জ্বালা নাই। রিয়ালিজ্‌মের সহিত স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ আত্মীয়সম্পর্কে যুক্ত। তারকনাথ রিয়ালিষ্ট বলিয়াই যে তিনি স্যাটায়ারিষ্ট—তাহাও স্পষ্ট। [ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

'ভালোবাসা কখনই অপ্রতিশোধিত থাকে না'—কি ইংরেজী কি বাংলা—উপন্যাসের ভাষায় লেখকগণ প্রায়ই কোনো বিশেষ ঘটনা হইতে একটি সাধারণ সূত্রে পৌঁছান, কিংবা একটি সাধারণ সূত্র পাঠককে জানাইয়া দিয়া তাহার টীকাভাষ্যের মতো একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেন। General দ্বারা এই Particularকে সমর্থন, কিংবা Particular হইতে General-এ উত্তরণ, কথকমাত্রেরই একটি পরিচিত সম্পত্তি। পার্থিব মাতা ও মা-সরস্বতীর প্রতি বিধুভূষণের আচরণে যে তফাত ছিল তাহারই সুযোগ লইয়া লেখক একটুখানি বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বা wit সৃষ্টি করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা…অবিশ্বাস করিবেন না।'—তারকনাথের ব্যঙ্গ সমাজকেও রেহাই দেয় নাই এবং সাহিত্য—যাহা সমাজের দর্পণ [এই উপন্যাসের motto দুইটি পাঠককে স্মরণ করিতে বলি]—তাহাকেও রেহাই দেয় নাই। তখনকার উপন্যাসরচনারীতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে স্পষ্টতই একটি অসহিষ্ণুতা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল প্রকাশ্য। সেই অসহিষ্ণুতা এবং বিরাগ এখানে ক্ষুরধার ব্যঙ্গের ভাষা পাইয়াছে। কিন্তু তারকনাথেরই দুর্ভাগ্য! লেখকদের সর্বদর্শিতা, সর্বশ্রোতৃত্ব ও সর্বত্রগামিতা লইয়া ঠাট্টা করিলে কী হইবে—তিনিও ঐ দরকারী দোষগুলির হাত এড়াইতে পারেন নাই! [পাঠকদের প্রতি এই ধরনের অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ, কখনও মৃদু ভর্ৎসনা, কখনও প্রসন্ন অভিভাবকত্বের

মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রেরও বৈশিষ্ট্য।[১] তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বব্যাপী প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। ইংরেজ ঔপন্যাসিক হেনরি ফিল্ডিং (১৭০৭-১৭৫৪) ও থ্যাকারের (১৮১১-১৮৬৩) মধ্যে পাঠকদের সঙ্গে এই মাখামাখির ভাব বড়ো বেশি দেখা যায়। তাহার ফল সর্বত্র যে ভালো হইয়াছে এমন বলা যায় না।] তারকনাথ যাহা লইয়া ঠাট্টা করিয়াছেন, তাহাই লেখকদের সাহিত্য-বাণিজ্যের সর্বাপেক্ষা বড়ো পুঁজি। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সমালোচক ফর্স্টার অনেকের মতোই স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে উপন্যাসের লেখক 'Commands all the secret life, and he must not be robbed of this privilege.'[২] ঠাট্টা শুরু করিয়াই তারকনাথ দেখিলেন, তাঁহার নিজেরও ঐ ঠাট্টার হাত হইতে নিস্তার নাই। সুতরাং দীর্ঘ অনুচ্ছেদের পর পাঠকদের একটি মৃদু ধমক দিলেন, আপন অস্বস্তি গোপন করিবার জন্যই যেন।

'সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া……জানিতে পারিলেন?'—'অন্নদামঙ্গল', ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে 'পুরবর্ণন' অংশের শেষে সুন্দর সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন:

আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে।

'মাইকেলই বা কি প্রকারে'…ইত্যাদি—'মেঘনাদবধ কাব্য', অষ্টম সর্গ এই মন্তব্যের উৎস। লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে হতপ্রাণ, রামচন্দ্র শোক-বিলাপে মুখর। মায়াদেবী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া যমপুরে দশরথের সহিত দেখা করিবার নির্দেশ দিলেন—তাঁহার কাছে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের রহস্য জানা যাইবে। সমুদ্রস্নানে দেহ পবিত্র করিয়া রাম মায়াদেবীর অনুসরণ করিয়া যমপুরের নিকটবর্তী হইবার পর

"দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী

১. "এইখানে পাঠকমহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকাগ্রন্থের প্রথা আছে যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে যে, নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্বগুণে ভূষিত, বড় বীরপুরুষ হইবে, এবং নায়িকার প্রণয়ে ঢলঢল করিবে। গরিব তারাচরণের তো এ সকল কিছুই নাই"…ইত্যাদি।

'বিষবৃক্ষ', অষ্টম পরিচ্ছেদ। ['পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ']

2. E. M. Forster: 'Aspects of the Novel,' page 92.

বজ্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয় :
উচ্ছাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে ;
কিবা চন্দ্র, কিবা তারা ; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে !"......

এবং "অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে !'

উদ্ধৃতাংশগুলি অবশ্য মাইকেলের নরকবর্ণনার সামান্য ছিন্নাংশমাত্র। এবং মাইকেল মধুসূদনের এই নরকবর্ণনাও তাঁহার মৌলিক পরিকল্পনা নয়, দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র [Le Commedia] 'Hell' বা 'Inferno' অংশের ছায়া অবলম্বনে রচিত। মিল্টনের Paradise Lost হইতেও তিনি ঋণগ্রহণ করিয়াছেন।

'তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর'—'দুর্গেশনন্দিনী', বঙ্কিমচন্দ্র ; দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 'কুসুমের মধ্যে পাষাণ' ; দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, 'মুক্ত কণ্ঠ'।

বিষ্ণুশর্মা—'পঞ্চতন্ত্র' নামক সুপ্রসিদ্ধ নীতিমূলক গল্পগ্রন্থের প্রণেতা। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা ইঁহাকে তিনজন রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজপুত্রগণ সকলেই ছিল দুর্বিনীত এবং বিদ্যাবিমুখ, সুতরাং বিষ্ণুশর্মা গল্প বলার ছল করিয়া তাহাদিগকে নানা নীতিগর্ভ সদুপদেশ দিয়া প্রশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' সেই উপদেশবাহী কাহিনীগুলির সংকলন। 'পঞ্চতন্ত্রে'র রচনাকাল ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা হইয়াছে। লঘুপতনক, চিত্রগ্রীব ইত্যাদি 'পঞ্চতন্ত্রেরই চরিত্র। মানবেতর জীব হইলেও ইহারা মানুষেরই রূপক। তাই ইহারা সকলেই মানব-স্বভাবী,—মানুষের মতো কথাবার্তা বলে, কেহ বেদপাঠ করে, কেহ বা ধর্ম লইয়া বিতর্কে মগ্ন হয়।

'এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিমবাবু আড়াইশত বৎসর···নির্গত করাইয়াছেন।'—এইবার তারকনাথের কটাক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই 'যবন-তনয়া', আর কেহই নয়, মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা, কিন্তু তাহাকে ঠিক যবন-তনয়া বলা যায় কিনা সে বিচারের ভার 'কপালকুণ্ডলা'র পাঠকদের উপর ছাড়িয়া দিতেছি। 'কপালকুণ্ডলা'র দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'পান্থনিবাসে' অংশে এবং অন্যত্র মতিবিবির চাপল্য ও প্রগল্‌ভতা এবং স্বাধীনভর্তৃকা নারীর মতো মুখরতা ঐ যুগের কোনো মুসলমানরমণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না বলিয়া তারকনাথ ইঙ্গিত করিয়াছেন। বরং সে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী উপন্যাসের নায়িকাদের নিকটাত্মীয়া, অন্তত তাহার কথাবার্তা হইতে সেইরূপই মনে হয়।

'কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে ত···গৃহবিচ্ছেদ ঘটে নাই।'—যে শক্তিগুলি বাংলাদেশের যৌথপরিবারের বিকেন্দ্রীকরণ ও ভাঙনের জন্য দায়ী, বধূদিগের স্বাতন্ত্র্য-ইচ্ছা সেগুলির অন্যতম। নানা পরিবার ও নানা মানসিকতার মধ্যে আবাল্যবর্ধিত বধূরা আসিয়া সংহত একান্নবর্তিত্বের মধ্যে নানা সংঘাতের সূচনা করিয়াছে এবং ফাটল ধরাইয়াছে। স্বার্থচেতনা, স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহা, নিজের ছোট্ট সংসারটুকুর জন্য সংকীর্ণ সুখচিন্তা প্রধানত পরিবারের বধূরাই উদ্দীপিত করিয়াছে এবং তাহাদের কেন্দ্রাতিগ প্রেরণায় সম্মিলিত পরিবারের ভিত্তিটি টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া উপন্যাস ও গল্পগুলির কিছু কিছু নারীচরিত্র হইতেই আমাদের সমাজবিবর্তনের এই আভাসটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

'কেহ কেহ কিনিতে লাগিল···চলিয়া যাইতে লাগিল।'—সামাজিক অভিজ্ঞতার সম্পদে তারকনাথ অত্যন্ত ধনী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত তুচ্ছতম ঘটনাটিকেও অসামান্য তাৎপর্যদান করিয়াছে। যদি বলা যায় যে, এই ধরনের বিবরণগুলি নেহাৎ 'padding' নয়—উপন্যাসের আয়তন বাড়াইবার জন্য যেখানে সেখানে গুঁজিয়া দেওয়া উপকরণ নয়, বরং তারকনাথের শ্রেণীসচেতনতার দৃষ্টান্ত, হয় তো তাহা হাস্যকর শোনাইবে, আসল কথা এই, তারকনাথের পর্যবেক্ষণ ছিল যেমন ত্রুটিহীন, তাঁহার কৌতুকবোধও ছিল তেমনই অসাধারণ। শ্রেণীচেতনা সব যুগের সকল লেখকেরই থাকে, নহিলে তাঁহারা লেখকই হইতেন না। কিন্তু আধুনিক শ্রেণী-সচেতনতা নবীন লেখকদের মনে যেরূপ শ্রেণীবিদ্বেষের জন্ম দিয়া থাকে তারকনাথের যুগে সেরূপ হইবার জো ছিল না। সে যুগে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর বিভেদরেখাগুলিও এখনকার মতো এত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয় নাই। সেজন্য সমাজের বৈষম্য, দারিদ্র্য, দুর্বলতা ও শিথিলতাগুলির প্রতি তারকনাথের একটি প্রসন্ন, কৌতুকস্নিগ্ধ প্রশ্রয়ই ছিল।

'দিদি অন্য সময় তিন ক্রোশের···শুনিলেন না'—হাস্যরস ও ব্যঙ্গের মূল উপায় হইল excess বা অতিরঞ্জন। ইংরেজী 'The humorous excess' কথাটির মধ্যে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রমদার শ্রবণশক্তির অলৌকিক বিস্তার সম্বন্ধে এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঐ অতিরঞ্জনেরই নিদর্শন। কৌতুক [humour] ও ব্যঙ্গ [satire] দুইয়েরই ভিত্তি আমাদের হাস্যবোধের উপর। এই হাস্য যখন একটিমাত্র ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত হয় তখনই তাহার নাম দিতে পারি কৌতুক; কৌতুক মানুষকে লইয়া জ্বালাহীন, নির্দোষ রসিকতা। কিন্তু যে হাস্যের নির্ভর একটি সম্প্রদায়, জাতি বা সমগ্র মানবসমাজ, তখন তাহা ব্যঙ্গে পর্যবসিত হয়, কেন না তখন তার মধ্যে একটু সংস্কার কিংবা সংশোধনের ইচ্ছা ভরিয়া দেওয়া হয়, একটু জ্বালা ও দংশন থাকে। একটি মানুষের দোষত্রুটি তেমন দুঃসহ নয়, তাহা লইয়া সামান্য হাস্যপরিহাসই ভালো, কিন্তু একটি পুরা জাতি বা সমগ্র মানুষের দোষত্রুটি অত সহজে উপেক্ষা করা যায় না, তাই সম্প্রদায় বা মানুষের দুর্বলতা ও অন্যায় লইয়া যে হাস্যকৌতুক, তাহার মধ্যে একটু ব্যঙ্গের খোঁচাও থাকে।······'দিদি যেন সে দেশেও নাই' কথাটিও ওই রকম অতিরঞ্জনের দৃষ্টান্ত। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 'দিদি' বা 'প্রমদাকে' লইয়া কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারকনাথ যে সব বাক্-ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলি সবই তাহার মৌলিক উদ্ভাবন নয়, দু-একটি আমরাও যখন তখন কথাবার্তায় ব্যবহার করিয়া থাকি। 'সে দেশেও নাই'—এই বিশেষ বাক্-রীতিটিও আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে সাধারণ উত্তরাধিকারের অঙ্গ। দর্শনের ভাষায় বলিতে পারি, এই বিশেষ বাক্-রীতিটিকে গ্রহণ করিবার 'বাসনা' আমাদের জাতীয় চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া আছে।

'পাড়ার কোন কোন গিন্নী···প্রকৃত ভাব নয়।'—অন্তঃপুরের মহিলা-মজলিশের যে নিপুণ রূপায়ণ গতযুগের উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যায়, ইদানীং কালের উপন্যাসে তাহা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেযুগের সামাজিক উপন্যাস মাত্রেই ছিল পরিবারকেন্দ্রিক, লেখকদিগকে অন্তঃপুরের জন্য অনেকখানি মনোযোগ তুলিয়া রাখিতে হইত। তবে অন্তঃপুরচিত্রে এই পৌরাঙ্গনাসম্মেলন প্রায়ই ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে,—বিশেষভাবে 'বিষবৃক্ষ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'ইন্দিরায়'—ইহার পরিচয় মিলিবে। মনে হয়, ঔপন্যাসিক মশাই পরিবারকর্তার গাম্ভীর্য ও অহমিকা লইয়া অন্তঃপুরে দ্বিপ্রাহরিক নারীজটলায় কান পাতিয়াছেন, এবং সেখানে কোলাহলমুখরতার মধ্য হইতে ভাসিয়া আসা পরনিন্দা, পরচর্চা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ক্ষুদ্র ঈর্ষার উক্তি, সকাম চাটুকারিতা ও পক্ষপাতদুষ্ট কথাবার্তা—সমস্তই তাঁহার মনে নিঃশব্দ অট্টহাস্য জাগাইয়া তুলিয়াছে।

মেয়েমহলেও এই 'পার্লিয়ামেণ্ট' সম্বন্ধে লেখকদের কোনরূপ উচ্চ ধারণার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। তবে অন্দরের মহিলাসমাবেশের চিত্র উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় সকলের হাতেই বেশ বাস্তব ও সরস হইয়া ফুটিয়াছে। ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও পরশ্রী-কাতরতা সম্বলিত নারীচরিত্রের অবতারণায় তাঁহারা সময় সময় আশ্চর্য সফল হইয়াছেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' উপন্যাস হইতে তুলিয়া দেওয়া এই বিচলিত মহিলাসমাগমের চিত্রটি প্রণিধানযোগ্য :

> "গ্রামের উত্তর পাড়ায় একটি স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল ; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। 'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল রেতে বাড়ী এসেছিল, সকালবেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করছে' যাহাকে দেখে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটকবাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পহুঁছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য ; বোধ হয় ব্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে, 'অমন ছেলে আর হয় না, হবে না।' ইহার মধ্যে কেহ আর একজনের নিকট 'সুদের পয়সা কটা' চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায় অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয় ; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর যেন 'পিসী'র দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা এক-চিত্তে এক-ভাবে, বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্প-বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল 'বেটী বসে কাঁদ্ছে, যেন আলকাৎরা মাখান বড় চরকা ঘুরছে।"

খাঁটী অন্তঃপুরচিত্র ইহা না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 'টাইপ' পাড়াগেঁয়ে নারীচরিত্র এখানে বিস্ময়করভাবে ধরা পড়িয়াছে। এই কোপন-স্বভাবা কলহপরায়ণা, অথচ পরোপচিকীর্ষা-প্রচারে উৎসুক মহীয়সী মহিলাবর্গ বিংশ শতাব্দীর সাম্প্রতিক উপন্যাসের জগৎ হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছেন। তবে মহিলা ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাস-রচনার সময় প্রতিবেশিনীদিগের প্রতি ততটা নিষ্ঠুর হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের উপন্যাসের আঙিনায় ঐ পৌরাঙ্গনাদের ঠাঁই দিয়াছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মতো স্বল্পসংখ্যক দু-একজন ইদানীংকালে অন্তঃপুরচিত্রে নিপুণতা দেখাইয়াছেন। তবে ঐ সব নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ যে সমাজে দলে দলে পাওয়া যাইত সে সমাজও বোধ হয় ক্রমশ অতীতে সরিয়া যাইতেছে।

'মনোহারী উত্তর করিল, "আমি ও বাঁশীটির দাম···অমনি দিলাম।"
—Contrast বা বৈপরীত্যের দ্বারা প্রমদার নির্মম হৃদয়হীনতা যাহাতে আরও স্পষ্ট

ও অনাবৃত হইয়া ওঠে তাহারই জন্য লেখক মনোহারীর চরিত্রে এই আকস্মিক সদাশয়তাটুকু অর্পণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মনোহারী অনাত্মীয়, অপরিচিত, ফেরি করাই তাহার জীবিকা। যে-স্বার্থকে এই লোকটি তুচ্ছ করিতে পারিল প্রমদা আত্মীয় হইয়াও তাহা পারিল না—এইজন্য লেখক মনোহারীটির আচরণের মধ্য দিয়া প্রমদার জন্য একটি প্রচ্ছন্ন ধিক্কার আনিয়াছেন। মনোহারী যে শুধু মূল্যই লইল না তাহা নয়, স্বার্থত্যাগের প্রকাশ্যতাটুকু গোপন করিয়া সে সরলাকে অনুগ্রহ-লাভের কঠোর মানসিক গ্লানি হইতে মুক্তিও দিল। এই বিরোধ দেখাইয়া তারকনাথ যেন প্রমদাকে শাস্তি এবং নিজেকে ও পাঠককে স্বস্তি দিতে চাহেন। বোঝা গেল, প্রমদার প্রতি লেখক প্রথম হইতেই অপ্রসন্ন, তাঁহার বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হইবেই। সরলা তাঁহার সবটুকু প্রশ্রয় কাড়িয়া রাখিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'বিধুভূষণ সমস্ত দিনই···রাগী হইয়া ওঠে।'—বিধুভূষণও গত শতাব্দীর একান্নবর্তী পরিবারের একটি 'টাইপ' চরিত্র। ভুল হইল, তারকনাথের সময় বিধুভূষণের মতো চরিত্রগুলি 'টাইপ' হয় নাই—শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আসিয়া তাহারা 'টাইপ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বকথিত 'দ্বিভ্রাতৃক আখ্যানে' এই ধরনের একটি ভাই প্রায়ই দেখা গিয়াছে। সে বিষয়বুদ্ধিহীন, অর্ধশিক্ষিত, নিষ্কর্মা, স্বার্থচিন্তাশূন্য। অন্য ভাই যখন নিজের স্বার্থ গুছাইয়া লইবার জন্য ছল বল কৌশল—কোনো উপায়ই বাকী রাখে না, তখন এই ভাইয়েরা সচরাচর 'বাদ্য গীত এবং তাসপাশাতেই' সময় কাটাইয়া দেয়। ঔপন্যাসিকরা এই ভাইকে অর্থ হইতে বঞ্চিত করেন, কিন্তু যে সমস্ত গুণ মানুষকে জনপ্রিয় করিয়া তোলে—তাস-পাশায় দক্ষতা কিংবা বাদ্য ও সঙ্গীতে নিপুণতা—সমস্ত দিয়া তাঁহার এই ভাইটিকে ভূষিত করিয়া দেন। ফলে বেচারাকে কখনও অকূল পাথারে পড়িতে হয় না। দাদা নির্দয় হইলে কী আসে যায়, পাঠকেরা রহিল, তাহাদের সহানুভূতি হইতে এই ভাই কখনও বঞ্চিত হয় না। আর খ্যাপা স্বার্থচিন্তাহীন, উদাসীন ধরনের চরিত্রের উপর বাঙালী পাঠকের একটি সহজাত পক্ষপাত আছে,—আমাদের প্রিয়তম দেবতা বোধকরি মহেশ্বর,—তিনি পাগল ও মোহহীন বলিয়াই প্রিয়। তিনিই বৈরাগ্য ও বঞ্চনাকে আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছেন। যে মানুষ ইহার দুইটিই পায় সে সহজেই আমাদের চিত্তের গভীরতম প্রদেশটি অধিকার করিয়া বসে। বিধুভূষণ হঠরাগী—যখন তখন ভীষণ চটিয়া ওঠা তাহার স্বভাব। এই স্বভাবটিকে মহেশ্বরের আশীর্বাদ বলিব না,—

বিধুভূষণকে সার্থকনামা করিবার জন্য অতটা ব্যস্ততা দেখাইব কি? ইহা তাহার অশিক্ষাজনিত,—লেখক আমাদের জানাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় অল্পশিক্ষা বা অশিক্ষা-প্রসূত inferiority complex বা হীনমন্যতাই তাহাকে এত হঠাৎ-হঠাৎ ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিত। বেচারী সব সময় মনে করিত, 'আমি অশিক্ষিত, তাই বোধ হয় আমার দাম সকলের কাছে কমিয়া গেছে,'—তাই চোটপাট করিয়া সে আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইত। অশিক্ষা মানুষকে যেমন অতিবেদনাশীল (sensitive) করিয়া তোলে এমন আর কিছুতে করে না। সচরাচর অতিবেদনাশীল মানুষদেরই বদরাগী হইতে দেখা যায়।

'সুন্দরী যুবতীর সাশ্রু নয়নে…তুলনা হইতে পারে?'—এই বাক্যে পৌঁছাইয়া তারকনাথের ঔপন্যাসিক সুলভ অপক্ষপাত একেবারে মাটি হইয়া গেছে। ক্রমশই ধরা পড়িতেছে, কোন্ চরিত্রগুলির প্রতি লেখকের সস্নেহ অনুমোদন রহিয়াছে, কাহারা তাঁহার করুণার সবটুকুই পাইয়াছে, কাহাদের জন্য তিনি পাঠকেরও সবটুকু সমবেদনা আকর্ষণ করিতে চান। একদল চরিত্রের জন্য তিনি অফুরন্ত ও উপচীয়মান স্নেহপ্রশ্রয় সমুদ্যত রাখিয়াছেন, কিন্তু অন্যদল তাঁহার প্রত্যাখ্যান ও বিতৃষ্ণাই কেবল পাইতেছে। নিজের প্রিয় চরিত্রগুলিকে যতভাবে নির্দোষ ও মহৎ করিয়া তোলা যায় তাহার জন্য তারকনাথের চেষ্টার ত্রুটি নাই। এই উদ্দেশ্যেই, আমাদের সন্দেহ হয়, গোপালকে এই পরিচ্ছেদে তিনি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি বোধশক্তির অধিকারী করিয়াছেন। নহিলে মাতার চোখে জল দেখিয়া গোপালের নানা উক্তি তাহার 'আপন চক্ষুদ্বয় আর্দ্র' হইয়া আসা একটু অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। অল্পস্বল্প করুণরস সৃষ্টির জন্য তারকনাথ এখানে যে ভাবালুতার আশ্রয় লইয়াছেন, এই ভাবালুতাই শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালী পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তারকনাথের পক্ষপাতদোষের কথাটাও সারিয়া লই। উপমাপ্রয়োগের মধ্যেও তাঁহার নিরপেক্ষতার অভাব চোখে পড়ে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে প্রমদার জন্য লেখক যে সব উপমান ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলিতে তেমন ঈর্ষা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু সরলার জন্য, 'সোনার গাছে মুক্তার ফল';—রূপকথার সৌন্দর্যময় জগৎ হইতে আহৃত এই উজ্জ্বলমধুর উপমানটি লেখক কেবল সরলারই জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন—নির্ধনগৃহিণী সরলাকেই ঐশ্বর্যবতী করিবার জন্য। এই পক্ষপাতিত্ব উপন্যাসের পক্ষে মাঝে মাঝে ক্ষতিকর হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'পাঠকবর্গ এখন বুঝুন, এ কোন্ পীড়া।'—পাঠকদের নিজের ব্যক্তিগত মতামতের অংশ দিয়া প্রথম হইতেই তাহাদের সংস্কারাচ্ছন্ন করিবার এই চেষ্টা উপন্যাসের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ফিল্ডিং ও থ্যাকারের মধ্যে এই পাঠকদের সঙ্গে দহরম-মহরমের ভাবটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছিল। ঔপন্যাসিক-সমালোচক ফর্স্টার তাঁহার 'Aspects of the Novel' গ্রন্থে এ ব্যাপারে স্পষ্টই ফতোয়া দিয়াছেন—"may the writer take the reader into his confidence about his characters ?···better not." [৮৮ পৃষ্ঠা]। এই প্রবণতা উপন্যাসের পক্ষেই বিপজ্জনক, কেন না ইহাতে গ্রন্থের ভাবমণ্ডলটি শিথিল হইয়া পড়ে, পাঠকদের অনুভবগুলি দানা বাঁধিতে পারে না। নেপথ্যের সাজঘরে চরিত্রগুলিকে দেখিয়া যাইবার জন্য পাঠকদের প্রতি ঔপন্যাসিকের এই যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আমন্ত্রণ, ইহাকে ফর্স্টার 'bar-parlour chattiness' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে এইরকম পাঠক সম্ভাষণের প্রলোভনে পড়িয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর তাহাদের তিনি বিশেষ আমল দেন নাই। একটু লোভ দেখাইয়া ডাকিয়া আনিয়া বরং দুইচারিটা ধমকধামক দিয়া বিদায় করিয়াছেন। তারকনাথ বঙ্কিম-বিরোধী, কিন্তু বঙ্কিম যে-ফাঁদে পড়িতে গিয়া সহজেই নিজেকে সামলাইয়া লন, তারকনাথ সেই ফাঁদে নিজের অজ্ঞাতসারে আগেই পা দিয়া বসেন। তবে এই উপায়টির পক্ষে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে লেখক ও পাঠকদের মধ্যে একধরনের অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করিয়া ইহা লেখকের মনোগত ভাবটিকে পাঠকের মনের দরবারে অত্যন্ত সহজে নিয়া হাজির করিয়া দেয়। লেখক কেবল গুরু কিংবা শিক্ষকের উচ্চ মঞ্চে চড়িয়া থাকিবেন, আর পাঠক নির্বাক ও তদ্গত শ্রোতার ভূমিকাটিই কেবল গ্রহণ করিবে—উপন্যাসের পক্ষে এমন কথকতার আসর হইয়া ওঠাও প্রার্থনীয় নহে।

'প্রমদার বাক্যগুলি এমন মিষ্ট যে···ইচ্ছা করিত না।'—ব্যজস্তুতি তারকনাথের কৌতুক-সৃষ্টির একটি মুখ্য উপকরণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও দেখি, পাড়ার কোনো কোনো গিন্নী প্রমদা বড় ঘরের মেয়ে, কেমন শান্ত, কেমন সুন্দর মুখখানি, কেমন সুন্দর পটল-চেরা চক্ষু দুটি, কেমন বাঁশির মতো নাকটি, ইত্যাদি 'অপক্ষপাতী সত্য কথা' বলিয়া দরকারমতো তেলটুকু নুনটুকু লইয়া যাইতেন। সেই গিন্নীদের কথার 'অপক্ষপাতী সত্য'তা, কিংবা এক্ষেত্রে প্রমদার বাক্যগুলির 'মিষ্ট'ত্ব—দুইই ব্যজস্তুতি-প্রকাশক এবং শ্লিষ্ট—অর্থাৎ যাহা লেখকের বিবক্ষা বা বক্তব্য, ঠিক তাহার উল্টা

অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এ প্রশংসা যে নিন্দারই ছদ্মবেশ মাত্র, নিন্দাকেই তীব্রতর করিয়া তুলিবার কৌশল, পাঠকের তাহা বুঝিতে দেরি হয় না।

"আজ আর একখানা গয়না হবে।"—উনবিংশ শতাব্দীর লেখকবৃন্দ রূপক, প্রতীক, সাঙ্কেতিকতা—এই সব আধুনিক সাহিত্যের অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইতেন কিনা সন্দেহ। বিশেষত তারকনাথের মতো প্রত্যক্ষবাদী বা 'Empiricist' লেখক—বঙ্কিমচন্দ্রের সুদূর-প্রসারী সৌন্দর্যময় কল্পনাশক্তি যাঁহার ছিল না—তাঁহার নজর প্রতীকের অপেক্ষা প্রত্যক্ষের উপরেই বেশি ছিল। সুতরাং আভাসের দ্বারা জীবনের দূরস্থিত গভীরস্থিত সত্যকে অনবগুণ্ঠিত করিবার প্রয়াস তিনি করেন নাই বলিলেই চলে। তাঁহার ভাষা ইঙ্গিতগর্ভ নয়—স্পষ্ট ও বাচ্যার্থ-সম্বল। কিন্তু কৌতুকস্রষ্টার তূণেও কিছু কিছু ইঙ্গিতের শর থাকে। হয়তো সেগুলি তেমন তীক্ষ্ণ নয়, বরং ভোঁতা বলিয়াই লেখকের সুবিধা, পাঠককে আঘাত করিবার বদলে সুড়সুড়ি দেওয়া অনেক সহজ হইয়া যায়। শ্যামার এই উক্তির পিছনে তাহার অনেকখানি লৌকিক অভিজ্ঞতা লুকানো রহিয়াছে; বীজমন্ত্রের মতো সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটি অনিবার্য আভাসে পাঠকের হাস্যবোধকে উচ্ছ্বসিত আলোড়িত করিয়া তোলে। আলঙ্কারিক পরিভাষায় ইহাকে 'ধ্বনি' বলিলে পাঠকবর্গ অপরাধ লইবেন কি?

'অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ'—মূল শ্লোকটি এইরূপ:

মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকদিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥

শিকার করিতে গিয়া এক ব্যাধ একটি হরিণ মারিয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার পথে সে একটি শূকরও দেখিতে পাইল এবং তাহার দিকে তীর ছুঁড়িয়া বসিল। আহত শূকরটি রাগিয়া গিয়া শিকারীকেই আক্রমণ করিল। বেচারা ব্যাধ বরাহের আক্রমণে প্রাণ হারাইল এবং বরাহটিও ভব-লীলা সাঙ্গ করিল। শূকরটা যখন মাটিতে পড়িয়া গেল তখন তাহার দেহের চাপে একটা সাপও মারা পড়িল। এমন সময় এক চতুর শিয়াল সেখানে আসিয়া হাজির। সে দেখে, সম্মুখে থরে-থরে ভোজ্য সাজানো—একসঙ্গে এতগুলি প্রাণীর মৃতদেহ। শৃগাল আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু কোন্‌টিকে আগে খাওয়া যায়? সে ভাবিতেছে: মানুষের দেহটা হইতে তার একমাসের খাওয়া চলিবে, হরিণ আর বরাহটার দ্বারা তার দুই মাসের খাবারের ভাবনা চুকিয়াছে; সাপটাকে দিয়াও একটা দিন চালাইয়া লওয়া যাইবে—কাজেই তখনই সেগুলি খাইতে শুরু করা ঠিক হইবে না। আজ ধনুকের ছিলাটাই খাওয়া যাক—'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।' উল্লসিত শৃগাল ধনুকের ছিলাটা খাইতে গিয়াছে,

এদিকে ধনুকে যে তখনও গুণ পরানোই ছিল তাহা সে লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ ছিলা কাটিয়া যাওয়ায় ধনুকের আগা সজোরে ছিটকাইয়া গিয়া শিয়ালের বুকে বিঁধিয়া গেল। বেচারা ধনুর্গুণ খাইতে গিয়া অকালে প্রাণ দিল।

বাংলাভাষায় চূড়ান্ত অন্নকষ্ট কিংবা অনাহারী অবস্থা বুঝাইতে এই প্রবচনটি ব্যবহৃত হয়।

'বাপের বাড়ীর নিন্দা…সহ্য হয় না।'—প্রবাদ-প্রবচন ধরনের কথা বলিবার দিকে গত যুগের লেখকদের বিশেষ ঝোঁক ছিল। হইতেও পারে যে, ইহা ভারতচন্দ্র হইতে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত উত্তরাধিকার। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ঔপন্যাসিকগণের সকলেই সামান্য উক্তির দ্বারা (General statement-এর দ্বারা) বিশেষ ঘটনার সমর্থন করিয়া অথবা বিশেষ (Particular) ঘটনা হইতে সামান্য অর্থে পৌছাইয়া, একধরনের 'অর্থান্তরন্যাসে'র আশ্রয় নিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ হইয়া শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ভাষার মধ্যে এই ধরনের একটি অন্তর্লীন সমতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রসাদগুণ, সর্ব-ব্যাপী হিউমার বা অদৃশ্য সহাস্য প্রসন্নতার আলোয় সংসারের দিকে ফিরিয়া তাকানো, মাঝে মাঝে ভারতচন্দ্রীয় ধরনে এই-জাতীয় শ্লেষকৌতুকে ভরা মন্তব্য—ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এ-যুগের উপন্যাসের বক্তব্যে ও ভাষায় বিরল ছিল না। অতি সাম্প্রতিককালের লেখকদের মধ্যে এই প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের প্রতি কেমন একটা অনীহা দেখা যায়। সমাজ টুকরা-টুকরা হইয়া গেছে, খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিত্ব পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হইয়া মাথা-চাড়া দিয়া উঠিয়াছে—সেহেতু নূতন প্রবাদ-প্রবচনও সৃষ্টি হইতেছে না। যে ঐক্য ও সাদৃশ্যবোধ সমাজে প্রবাদ-প্রবচনের জন্ম দেয়, আধুনিক জীবনের বিচিত্রভঙ্গিম জটিলতার মধ্য হইতে সেই ঐক্য ও সাদৃশ্যের বোধকে উদ্ধার করা দুষ্কর।

'আমি তো জান্ নই যে'—'জান' কথাটির অর্থ গণক, গণৎকার; অথবা পরলোকগত আত্মা এবং যিনি তাহাদের কথা শুনিতে পান, সেইরকম লোক। এই ধরনের কিছু কিছু শব্দ আগে মুখের কথা হইতে সাহিত্যে খুব সহজভাবেই যাতায়াত করিত। কিন্তু এখন, মুখের কথা হইতে নির্বাসিত না হইলেও সাহিত্যে ইহারা অপাংক্তেয় হইয়া গেছে। এখনকার কোনো গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর সংলাপে এই শব্দগুলিকে খুঁজিয়া পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যেক যুগ তাহার নিজস্ব ভাষাভঙ্গিকে আবিষ্কার করিয়া লয়, প্রত্যেক যুগের ব্যবহার অন্য যুগ হইতে আলাদা —একথা মানি, তবু মনে হয়, এই জাতীয় লোকপ্রচলিত সরল শব্দগুলি ব্রাত্য হইয়া পড়ায় বাংলা ভাষার সচলতা কখনও কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ যুগের গদ্যভাষা পূর্বযুগের প্রবাদ-প্রবচন, বাক্যবন্ধ এবং শব্দাবলী হইতে বহু-কিছু বর্জন

করিয়া কতটা সমৃদ্ধ হইয়াছে বলা মুশকিল। সাম্প্রতিক লেখকগণ খাঁটী বাংলা লিখিতে জানেন না বলিয়া ৺মোহিতলাল মজুমদার যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে অবশ্যই কিছু যুক্তি আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'এদিকে সরলা নিদ্রিত আছেন…বঞ্চিত করে।'—এই সমগ্র অনুচ্ছেদটি তারকনাথের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের গভীরতলবর্তী প্রভাবকে স্পষ্টই হাতে-নাতে ধরাইয়া দেয়। পৌরাণিক নাটকের নায়ক-নায়িকাদের পল্লবিত স্বগত-ভাষণের মতো, কিংবা কীর্তনগায়কের 'আখরের' মতো—আসল ঘটনাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া এই বর্ণনা-জালবিস্তার ও আত্মগত উচ্ছ্বাস উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র[১] ও বঙ্কিম-জ্যোতির্মণ্ডলীর অন্যান্য লেখকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলিতে এই ধরনের Ode বা Panegyric রচনা বা উচ্ছ্বসিত ধিক্কার কেমন যেন খাপ খাইয়া যায়, মোটেই বেমানান লাগে না। তারকনাথের বাস্তবধর্মী উপন্যাসে এই ব্যাপারগুলি বেখাপ মনে হয়, যেন তিনি রোমান্সের ভাষাকে বাস্তবের জগতে অনধিকার প্রবেশ করাইতে চাহিতেছেন। সমস্ত অনুচ্ছেদটিকে একটিমাত্র বাক্যে অনায়াসে সংহত করা চলিত। তাহা হয় নাই, কারণ যাহার ঘুম লইয়া তারকনাথ এমন বাগ্‌বিস্তার করিতে যাইতেছেন, সেই সরলা তাঁহার কাছে অসামান্য,—সে তাঁহার সবটুকু স্নেহ-দাক্ষিণ্য পাইয়াছে। কাজেই তাহার সম্বন্ধে কোন বর্ণনা এককথায় সারিয়া দিতে লেখকের মনে ততটা সায় নাই। বরং গল্পটা মধ্যপথে থামিয়া থাকুক, ততক্ষণে নিদ্রা-মাহাত্ম্য-বর্ণনা চলুক। সরলার অনন্ত দুঃখ এবং সেই

১, যেমন 'চন্দ্রশেখর', ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদে—

"তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, —জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী,—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী! তোমারে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করি নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি-কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক-যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজ এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্বনাশিনী। কোন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্বময়ী, সর্বকর্ত্রী, সর্বনাশিনী এবং সর্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।"

দুঃখবিস্মরণকারী নিদ্রা—এই সম্বন্ধে একগাদা কথা বলিয়া তারকনাথ পাঠকের মনে একটি ভাবগম্ভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে চান। এই ধরনের বাগাড়ম্বর বঙ্কিম-যুগেরই একটি cliche বা মামুলি সাহিত্যরীতি মাত্র। তারকনাথ সময়ে-অসময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিন্দা করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু সময়ে-অসময়ে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের ফাঁদেই তিনি পা দিয়েছেন। বরং এই পল্লবিত কথাবিস্তার ও মামুলি বাগ্‌বিলাস নিয়া সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই একটি শক্তিশালী দ্বিধা ছিল। 'লোকরহস্যে'র 'বসন্ত এবং বিরহ' রচনায় তিনি কবিদের cliche-গুলির কৃত্রিমতা লইয়া বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। বলা যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী'র বঙ্কিমচন্দ্রকে 'লোকরহস্যে'র বঙ্কিমচন্দ্র Parody করিয়াছিলেন। তবু তাঁহাকেও দু-একটি cliche বাংলা সাহিত্যে চালু করিতে হইয়াছিল—এই ভাবোচ্ছ্বাসময় পল্লবিতভাষণ তার মধ্যে একটি। এ ব্যাপারে ইংরেজী রোমাণ্টিক যুগের উপন্যাসগুলি হইতে, বিশেষত ওয়াল্‌টার স্কটের গ্রন্থগুলির আবেগমণ্ডিত মুখরতা হইতে তিনি প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অলীকবাবু' নাটকে [১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'এমন কর্ম আর কর্ব না' নামে প্রথম প্রকাশিত] বঙ্কিমের প্যারডি করিয়াছিলেন, তাঁহার আগেই বঙ্কিম নিজেকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। তারকনাথের মধ্যে নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে এই সচেতনতা ছিল কিনা সন্দেহ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'ঠাকরুণদিদির রূপগুণের পরিচয়'...এখানে আবার তারকনাথ সম্পূর্ণ বিপরীত, কঠোরভাবে 'ক্লিশে'-বিরোধী। আসলে তাঁহার মধ্যে একটি স্ব-বিরোধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি প্রকাশ্যত গভীর বিরাগ তাঁহার ছিল, কিন্তু বঙ্কিম-প্রভাবের স্রোত যে গোপনে তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। ঐ যুগে বঙ্কিমকে পুরাপুরি অস্বীকার করিতে হইলে বঙ্কিমেরই মতো বিরাট প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। তারকনাথ 'ভালো' লেখক কিন্তু 'মহৎ' বা 'বিরাট' লেখক নন; বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে গিয়া তিনি সফলও হন নাই। আবার অংশত সফল হইয়াছেনও, তাই 'স্বর্ণলতা' বঙ্কিম-সৃষ্ট জ্যোতিষ্কলোকের মধ্যে আপন উজ্জ্বলতাটুকু হারাইয়া ফেলে নাই। বঙ্কিমী কল্পনার মোহঘন ইন্দ্রজালমায়া ছিঁড়িয়া তারকনাথ বাহির হইতে পারিয়াছিলেন একথা সত্য, কিন্তু ঐ সর্বব্যাপী রোমান্স-পরিমণ্ডলে কল্পনাব্যাধির জীবাণু তাঁহাকেও সংক্রামিত করিয়াছিল। তবে সম্পূর্ণ জীর্ণ করিতে পারে নাই, ইহাই রক্ষা। সেখানেই তারকনাথ স্বতন্ত্র, বঙ্কিমের নিরুপায় অধমর্ণ হইবার দীনতা তিনি স্বীকার করেন নাই।

ঠাকরুণদিদির রূপগুণের বর্ণনা পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক আশমানির রূপবর্ণনা ['দুর্গেশনন্দিনী' ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ: 'আশমানির অভিসার'] মনে পড়ে। রূপের দিক হইতে আশমানি ও ঠাকরুণদিদির কোনো মিল আছে এ কথা বলিলে মহাপাতকের কাজ হইবে। তারকনাথও সে সম্ভাবনা প্রথমেই উড়াইয়া দিয়াছেন। দেখিবার বিষয় হইল দুই গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি—নানা বৃহৎ অমিলের মধ্যেও কোথায় যেন একটু প্রচ্ছন্ন মিল থাকিয়া গেছে। প্রাচীন কাব্যের প্রথাবদ্ধ রূপবর্ণনার প্রতি দুজনেরই সবিদ্রূপ কটাক্ষ। রূপবর্ণনার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের মঙ্গলাচরণটি উদ্ধারযোগ্য—

> "হে বাগ্‌দেবি! হে কমলাসনে! শরদিন্দুনিভাননে! অমলকমল-দলনিন্দিত-চরণ-ভক্তজন-বৎসলে! আমাকে সেই চরণকমলের ছায়া দান কর; আমি আশমানির রূপ বর্ণন করিব। হে অরবিন্দানন-সুন্দরীকুল-গর্ব-খর্বকারিণি! হে বিশাল-রসাল-দীর্ঘ-সমাস-পটল-সৃষ্টিকারিণি! একবার পদনখের একপার্শ্বে স্থান দাও, আমি রূপ বর্ণন করিব। সমাস-পটল, সন্ধি-বেগুন, উপমা-কাঁচকলার চড়চড়ি রাঁধিয়া এই খিচুঁড়ি তোমায় ভোগ দিব। হে পণ্ডিতকুলেপ্সিত পয়ঃপ্রস্রবিণি! হে মূর্খ-জনপ্রতি ক্বচিৎ কৃপাকারিণি! হে অঙ্গুলি-কণ্ডূয়ন-বিষমবিকার-সমুৎপাদিনি! হে বটতলা-বিদ্যাপ্রদীপ-তৈলপ্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও। মা! তোমার দুই রূপ; যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি উত্তররামচরিত, ভারবি কিরাতার্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না; যে মূর্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতিপ্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব রূপবর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছে, সেই মূর্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশমানির রূপবর্ণনা করিব।"

দিগম্বরী নামেরই মাহাত্ম্য আছে কিনা কে জানে, বাংলা সাহিত্যে যে কয়টি 'দিগম্বরী' পাঠকের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত, গুণপনার দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা গোপন সাম্য আছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ফোক্‌লা দিগম্বর' গল্পের 'দিগম্বরী ঠাকরুণে'র রূপও অনেকটা 'স্বর্ণলতার'ই দিগম্বরীর মতো। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র দিগম্বরী ঠাকরুণকেও এই সূত্রে মনে পড়িয়া যায়।

ইহাদের দুইজন বিধবা, একজন স্বামীসৌভাগ্যে গরবিনী,—তবু তিনজনেই একইরকম কঠোর স্বাতন্ত্র্যের ছাপ-মারা।

"আমাকে ভাই গালি···সীতাহরণের মারীচ"--ঠাকরুণদিদির কথাবার্তার একটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হইতেই চোখে পড়ে,—অক্ষেত্রে সবচেয়ে অসঙ্গত ও সবচেয়ে হাস্যকর উপমাটি প্রয়োগ করিতে তাহার জুড়ি নাই। এখানে সে নিজেকে 'সীতাহরণের মারীচ' বলিতেছে, আবার একটু পরেই শশিভূষণ ও প্রমদার প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করিতেছে, 'শিব কি কখনও শক্তি ছাড়া থাকেন?' Sublime-কে এইভাবে ridiculous করিয়া তোলায় দিগম্বরী-ঠাকরুণের কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নাই। ইংরেজ নাট্যকার শেরিডান [১৭৫১—১৮১৬] তাঁহার The Rivals নাটকে Mrs. Malaprop বলিয়া একটি চরিত্রের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই ভদ্র-মহিলা কথায়বার্তায় আভিজাত্য দেখাইবার লোভে যেখানে-সেখানে কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করিতেন—অথচ উহাদের অর্থের কোনো ধারই ধারিতেন না। এই 'স্বর্ণলতা'য় দিগম্বরী ঠাকরুণের উপমাপ্রয়োগ প্রায় একই রকমের নিরঙ্কুশ। মিসেস্ ম্যালাপ্রপের নাম অনুযায়ী শব্দের অর্থ না জানিয়া ঐ হাস্যকর উদ্ভট অপপ্রয়োগের নাম হইয়াছে malapropism। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে কাঙ্গালীচরণের কথাবার্তার মধ্যে দু একবার এই malapropism-এর ছোঁওয়া পাওয়া যায়। আমাদের দুঃখ এই, দিগম্বরী ঠাকরুণের এই বাগ্‌বৈশিষ্ট্য এখনও পর্যন্ত কোনো পদবি পায় নাই। উপমাব্যবহারে এই অপকুশলতার নাম 'দিগম্বরী-প্রয়োগ' দিলে কেমন হয়?

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কোনো বিশেষ লোকের কথাবার্তার মধ্যে ধ্বনিগত, পদগত এবং পদপ্রয়োগগত বিশিষ্টতা থাকিলে ব্যক্তিগত সেই উপভাষাকে 'নিভাষা' বা Idiolect বলা হয়।[১] 'স্বর্ণলতা'য় দিগম্বরীর একটি নিজস্ব 'নিভাষা' আছে। পরে গদাধর চন্দ্রের 'নিভাষা'র সঙ্গেও আমরা পরিচিত হইব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'একটিন্'—ইংরেজী acting-এর বাংলা কথ্যরূপ।

১. ভাষার ইতিবৃত্ত, শ্রীসুকুমার সেন, ১৯৬২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'রজক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া…গেল না।'—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সেই মনোহারীটির মতো এই রজকটির অবতারণাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—প্রমদার স্বার্থ-কলুষিত হীন কুটিলতাকে পাঠকের চোখে আরও একটু স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য। তাই এই ধোবাটিও মনোহারীর মতোই প্রমদার ক্ষুদ্রতাকে লজ্জা দিয়াছে। লেখক প্রমদার প্রতি কী ভয়ানক নিষ্করুণ! সামান্য মনোহারী বা ধোবার মধ্যে যে সহৃদয়তা তিনি আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার ছিটে-ফোঁটাও প্রমদাকে তিনি দেন নাই। 'কৃষ্ণ' পক্ষের সকলেই প্রায় সম্পূর্ণ কালো রঙে আঁকা, আবার 'শুক্ল' পক্ষে যাহারা যোগ দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেন এতটুকু কালিমা নাই! [ভূমিকা—'চরিত্রবিচার' দ্রষ্টব্য]

'বাবু রামাকে কহিলেন'…'জোগাড় আছে ত?'—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে বাঙালী 'বাবু' শ্রেণী সৎ ও সংস্কার-প্রয়াসী লেখকদের কঠোর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হইয়াছিল। 'বাবু' বলিতে ঠিক কী বোঝায় তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যে'র 'বাবু' রচনাটি পড়িলেই স্পষ্ট হইবে। ১৮১৭—১৮ নাগাদ, 'সমাচারদর্পণ' পত্রে সম্ভবত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাবু'-চরিত্রমাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'নববাবু-বিলাস' [১৮২৫] এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে এই পরমনিন্দিত বাবু-চরিত্রকেই তাহার সমস্ত ঘৃণার্হতা লইয়া হাজির করাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অননুকরণীয় ভাষায় 'বাবু'র বর্ণনা কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই :

> "হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু।…যিনি রূপে কার্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্মে জড়ভরত এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু।…যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলীদগ্ধ, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, বিষ্ণুর ন্যায় প্রজাসিসৃক্ষু, এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলাপটু, তিনিই বাবু।"

বাবুর নয়টি লক্ষণ আছে।[১] বঙ্কিমচন্দ্র বাবুদের দশ-অবতারের তালিকা দিয়াছেন; তাঁহারা হইলেন—কেরানী, মাস্টার, ব্রাহ্মণ, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। জমিদার অবতারে 'বাবুর'

---

১. মজিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোস পোশাকী যশসী দান, আড়ি ঘুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

একমাত্র বধ্য যে প্রজা—'স্বর্ণলতা'র' এই পরিচ্ছেদে তাহাতে আর সংশয় থাকে না। চাঁদের যে পিঠে পূর্ণিমা তাহার উল্টা দিকে যেমন অমাবস্যার অন্ধকার—উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ-পূর্ণচন্দ্রের উল্টা পিঠ তেমনি এই বাবুরা। 'বাবু-কালচার' বাঙলার রেনেসাঁশের নেতির দিক, কলঙ্কের দিক।

"ওই দেখ তোমার ভায়া মদ খেয়ে…মারতে আসছে।"—Irony ইহাকেই বলে! মণ্ডপের কাছ হইতে অবজ্ঞা ও অবহেলা পাইয়া যে ফিরিয়া আসিল, তাহারই বিরুদ্ধে মাতলামির অভিযোগ। তারকনাথ বেদনাসৃষ্টির কোনো সুযোগই বাদ দেন নাই। এক্ষেত্রে এই irony টুকুর প্রয়োগ অত্যন্ত সুষ্ঠু হইয়াছে।

'শ্যামা কহিল, "গোপালের মতন…কোন স্থানে যাব না।"—আবার লেখকের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যগুলি ধরা পড়িয়া যাইতেছে। শ্যামার এই কথাটির উপর পরবর্তী ঘটনার অনেকখানি নির্ভর রহিয়াছে। সরলার মৃত্যুর পর শ্যামার স্নেহটুকুকে সম্বল করিয়া গোপালকে বড়ো হইতে হইবে। সুতরাং মনিবপুত্রের প্রতি সহজাত যে বৎসলতা—তাহা অপেক্ষা মহত্তর স্নেহের বাঁধন দিয়া তারকনাথ শ্যামাকে গোপালের জীবনের সঙ্গে চিরস্থায়িভাবে জড়াইয়া দিতে চান। সে স্নেহ নিখাদ পুত্রস্নেহ ছাড়া আর কী হইতে পারে? কাজেই হঠাৎ প্রকাশ পাইল, শ্যামারও গোপালের মতো একটি ছেলে ছিল, এবং কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—আদর করিয়া সে তাহারও নাম রাখিয়াছিল গোপাল। সে বাঁচিয়া নাই, তাই শ্যামার নিরাশ্রয় পুত্রস্নেহ গোপালকে আসিয়া অবলম্বন করিয়াছে। পরবর্তীকালে শ্যামা পক্ষীমাতার মতো গোপালকে নিজের পক্ষপুটের আড়ালে রাখিয়া তাহাকে অনাদর ও অযত্ন হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহার রহস্য কী, এত শক্তিই বা সে পাইল কোথায়? লেখক বলিতেছেন, শ্যামার জীবনের ঐ চকিত-উদ্‌ঘাটিত অধ্যায়টির মধ্যে সে রহস্যের কুঞ্চিকা পাওয়া যাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, মাতৃস্নেহ ছাড়া আর কোন্ স্নেহের এমন শক্তি? আপন মার মৃত্যুর পরেও নিরবচ্ছিন্ন মাতৃস্নেহ লাভ করিতে স্বর্ণলতার নায়ক গোপালের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য শ্যামার আত্মজ সন্তানটিকে নেপথ্যেই বিদায় লইতে হইয়াছে। তারকনাথ বাঙালীর অতিপ্রিয় ভাবাবেগপ্লুত করুণরস সৃষ্টিতে অতিশয় নিপুণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপ এই, coincidence বা আকস্মিক যোগাযোগের উপর কাহিনীর এতখানি ভার দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। জীবনে আকস্মিকতা আছে, আপতিকতারও অভাব নাই। কিন্তু এই coincidence দুর্বল ঔপন্যাসিকের হাতে মাঝে মাঝে আত্মঘাতী অস্ত্রে পরিণত হয়। সত্যকার যোগ্য ঔপন্যাসিক কিন্তু ইহাকে বুঝিয়া-সুঝিয়া প্রয়োগ করেন। আরো অস্বস্তির কথা এই যে আকস্মিকতার মধ্যেই যে

একটা রোমান্সের গন্ধ আছে, তীব্র রোমান্স-বিরোধী তারকনাথের সে জ্ঞান ছিল না। তিনি ইহাও জানিতেন না যে আকস্মিকতার সূক্ষ্ম দড়ির উপর দিয়া হাঁটার কৌশল খুব নিরাপদ নয়। পরে আমরা coincidence-এর চোরাবালিতে তারকনাথের দুর্দশা দু-এক জায়গায় লক্ষ্য করিব।

নবম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দ অধিকারী—গোবিন্দ অধিকারী উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। তিনি মূলত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রা বা 'কৃষ্ণযাত্রা' আসরে নামাইতেন। 'নৌকাবিলাস' পালার প্রথম রচয়িতা তিনিই, এমন প্রসিদ্ধি আছে। তিনি নিজে দূতী সাজিয়া গান করিতেন। নৌকাবিলাস বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হইয়াছিল। ডঃ সুশীলকুমার দে গোবিন্দ অধিকারী সম্পর্কে লিখিতেছেন—

"Gobinda Adhikari [Bairagi] was born in the village of Jangipara [near Khanakul Krishnanagar] in Hoogly district about 1205 B. S. [=1798 A. D]. He had very little education but had a good voice and natural gift for composing songs. He learnt kirton from Golok Chandra Adhikari of ধুয়াখালী village and joined his kirton party. Later on he started his own party which he soon turned into a yatra party. His first 'pala' is said to have been কালিয়দমন. He appears to have become rich, and came to live in. Salkhia near Howrah, where he died at the age of 72 in 1870 A. D."

দশম পরিচ্ছেদ

'মুদির স্ত্রী কায়মনোবাক্যে · আনিয়া দিল।'—এই ঘটনাটি তারকনাথের নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীত। তাঁহার ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ তারিখের রোজনামচায় আছে—'Started from Tetalyah [Rajshahi] in the morning. Breakfasted at Bhagwanpur and passed the night in a **mudikhana**: moody altogether a good man, but moodini a troublesome woman.'

'ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিবিয়া যায়।'—রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবার সময় হইতেই বাংলাদেশের ব্রাহ্মদের নানারূপ সমালোচনা, বিদ্রূপ ও নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সমসাময়িক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার 'পাষণ্ডপীড়ন' [১৮২৩] গ্রন্থে রামমোহন-মতানুবর্তীদের 'প্রতারক… নগরান্তবাসি, মাংসাশি' ইত্যাদি বলিয়া গালাগাল করিয়াছেন, এবং ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—

> "কেহ বা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে, এই তন্ত্রোক্ত শ্লোকের অযথার্থ যথাশ্রুত অর্থ দর্শন করায়, অর্থাৎ পান করিয়া, পান করিয়া, পুনর্বার পান করিয়া…এই প্রকার পরমব্রহ্মে লীন হয় যে, কুক্কুরাদিতে স্বগাত্রমাংস ভোজন করিলেও…ভ্রূভঙ্গ করে না, অতএব তাহাদিগকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানী কহিলেও কহা যায়।" [দ্বিতীয়োল্লাস]

বিশেষত বঙ্কিমযুগে, কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুদয়ের পর [১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়; একটি হইল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী আদি ব্রাহ্মসমাজ, অন্যটি কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মদের দ্বারা গঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ] ব্রাহ্মদের প্রতি নানাদিক হইতে আক্রমণের একটা সাড়া পড়িয়া যায়। উপন্যাসে ব্যঙ্গচিত্রে নাটকে ব্রাহ্মদের কৃত্রিমতা ও আতিশয্য লইয়া বিদ্রূপ করিবার ধুম লাগে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতির নিষ্করুণ বিদ্রূপের উত্তরাধিকার অনেকেই পুনরায় হাতে তুলিয়া লইলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর রঙ্গচিত্র কেশবচন্দ্রকে নানাভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে'র দেবেন্দ্র ও তারাচরণ—দুইটি প্রাষণ্ড চরিত্রকে ব্রাহ্ম বানাইয়া ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁহার অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছেন। 'বাবু' রচনাও তাঁহার এই ব্রাহ্মদের প্রতি অক্ষমার সাক্ষ্য। তারকনাথ এবং তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ইন্দ্রনাথ দুইজনেই ঘোরতর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী ছিলেন। ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' উপন্যাসেও দেখি—"ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ-মায় পান না, তার, পিসী কোন্ ছার!" অমৃতলাল বসুর 'বাবু,' 'বৌমা' ইত্যাদি প্রহসনে বাহ্মদের তীব্র ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মদের লইয়া ব্যঙ্গ-কৌতুকের এই ধারাটি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিল। 'গোরায়' পরেশবাবুর স্ত্রী ও পানুবাবু প্রভৃতি চরিত্র তাঁহার কটাক্ষ হইতে ছুটি পায় নাই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে ব্রাহ্মদের প্রতি ব্যঙ্গ স্নিগ্ধকোমল কৌতুকের রূপ নিয়াছিল, 'খোকার কাণ্ড' ইত্যাদি গল্পে তাহার পরিচয় আছে। শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ব্রাহ্মদের লইয়া খানিকটা কৌতুক করিয়া লইয়াছেন। গোঁড়া হিন্দু, এবং খ্রীষ্টধর্ম-প্রভাবিত

উদারনৈতিক—দুই পক্ষের কাছেই ব্রাহ্মদের গঞ্জনা পাইতে হইয়াছিল। তারকনাথ ছিলেন শেষোক্ত দলে।

ধর্মঘট—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান হইতে ধর্মঘট শব্দটির নানা অর্থ তুলিয়া দিতেছি: ধর্মঘট [ধর্ম (রক্ষার্থ) ঘট—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়] বি. ধর্মার্থে ঘট বা কলসদান ব্রত; বৈশাখ মাসের প্রতিদিন সভোজ্য সুগন্ধ জলপূর্ণ দাতব্য কলস। ২। ধর্মরক্ষার্থ ঘট। ৩। কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সকলে সমবেত হইয়া কোন কার্য করা বা না-করা সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করে। ৪। [বাণিজ্যে পূর্বে দোকানদারেরা দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিবার জন্য অথবা কোন দ্রব্য এই নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় এবং তার কম মূল্যে বিক্রয় করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘটস্থ ধর্মকে সাক্ষী রাখিত বলিয়া এই নাম। ধর্ম (ন্যায়। "ধর্মাঃ পুন্য-যম-ন্যায়-স্বভাবাচার-সোমপাঃ।"—অমরকোষ) ঘট (চেষ্টা। "ঘট চেষ্টায়াং"—গণমালা) = ন্যায়-চেষ্টা] শ্রমিকদিগের মধ্যে ব্যবসাদার বা মহাজনের অধীনে কোন কার্য করা বা না-করা সম্বন্ধে ধর্মসাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা বন্ধন; বেতন বৃদ্ধির জন্য ঘটস্থাপনাপূর্বক ধর্মবন্ধনে বদ্ধ [এখন ধর্মঘটের এই ধর্মীয় আচারগুলি—ঘটস্থাপনা ইত্যাদি—উঠিয়া গিয়াছে—স.] শ্রমিকগণের কাজ বন্ধ। ৫। কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একসঙ্গে কর্মচারিগণের প্রতিজ্ঞাপূর্বক কার্যত্যাগরূপ ন্যায়চেষ্টা। ৬। ধর্মঃ (একতারূপ ধর্ম) ঘটতে (উৎপদ্যতে) যেন] যদ্দারা সদলস্থিত ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে একতারূপ ধর্মের উৎপত্তি হয়। ৭। [ধর্মঃ (শ্রেয়ঃ) ঘটতে (উৎপদ্যতে) যস্মাৎ] যা হইতে কর্মচারিগণের বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদিরূপ মঙ্গলের সৃষ্টি হয়—শ্রীমোহিনীমোহন তর্কতীর্থ (প্রবাসী)। Strike, হরতাল।

মুদি যে অর্থে ধর্মঘট কথাটি ব্যবহার করিয়াছে তাহার সহিত ধর্মঘটের ষষ্ঠতম অর্থটির সঙ্গতি কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে যে প্রাজ্ঞ অভিধানপ্রণেতার মতো এত ভাবিয়া চিন্তিয়া শব্দপ্রয়োগ করিবে ইহা বোধ হয় না। আসলে এখন গুজরাটী হরতাল কথাটিকে আমরা এখন যে ধর্মঘট অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি—সেই 'ধর্মঘট' গত শতাব্দীতে এই অর্থে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-আচরণ, এবং বিশেষত ব্রাহ্মদের উপাসনাকে ধর্মঘট বলা যাইত। সম্মুখে কোন সাকার মূর্তি নাই, অথচ উপাসকের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে—এই সাধনপদ্ধতি লোকের চক্ষে কিম্ভুত লাগিত বলিয়াই 'পূজা বা উপাসনার বদলে 'ধর্মঘট' কথাটা চালু হইয়া থাকিবে। এও এক ধরনের 'লোকনিরুক্তি' বা folk-etymology-র উদাহরণ। হিন্দুরা পূজা বা উপাসনা করে, কিন্তু ব্রাহ্মরা 'ধর্মঘট' করে—সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল এইরকম। লোকব্যবহারেই 'ধর্মঘট' কথাটি ঐ বিশেষ অর্থ

পাইয়াছে। মুদি মুদিনীকে বলিয়াছে—"দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে, সব ধর্মঘট করছে? ওদের কি জাত আছে?" ব্রাহ্মদ্বয়কে বলিয়াছে—"আমি হিন্দু মানুষ, ধর্মঘট টট্ কিছু বুঝি নে। ওটো ওটো।" 'ধর্মঘট' ব্যাপারটা মুদীর কাছে নিরতিশয় রকমের অহিন্দু আচার।

'গাছের পাতার একটু একটু শব্দ···উড়িতে আরম্ভ করিল।'—নিপুণ পর্যবেক্ষণকার তারকনাথ মানুষকে যেমন দেখিয়াছেন, মানুষের পরিবেশটিকেও তেমনি তন্নতন্ন করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। উপন্যাসের চরিত্র বা পরিবেশকে পাঠকের চোখে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলা দরকার, সেজন্য লেখকের দৃষ্টি নির্মল ও তীক্ষ্ণ হওয়া প্রয়োজন। যে তারকনাথের চোখে "কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, অপেক্ষাকৃত কৃশ। বয়স ৩২।৩৩; বাস করে তামাক-সাজা কলিকা সহ হুঁকা, বাম স্কন্ধ হইতে একখানি ময়লা বস্ত্রাকৃত একটি বেহালা ঝুলান, দক্ষিণ করে একগাছি তলতা বাঁশের ছড়ি, পায়ে জুতা নাই, একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান। কটি দেশ হইতে গলা পর্যন্ত অনাবৃত মস্তকে চাদর একখানি পাগড়ি করিয়া বাঁধা, কোমরে একটি ক্ষুদ্র বোঁচকা।"—নীলকমলের এই মূর্তির সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়িয়াছে, তাঁহার পক্ষে এই পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা-চাতুর্য অস্বাভাবিক কিছু নহে। তা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে, উপন্যাস রচনায় তারকনাথ যাঁহাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম চার্লস ডিকেন্স। 'Dickension details' বলিয়া একটা কথাই কিংবদন্তির মতো চালু হইয়া গেছে। ডিকেন্সের মতো যাঁহারা দক্ষ Caricaturist, তাঁহাদের দেখিবার চোখ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ না হইলে চলে না। সাংবাদিকদেরও এই গুণটি অবশ্যই থাকা দরকার,—ডিকেন্স একাধারে সাংবাদিক এবং Caricaturist—দুইই ছিলেন। জর্জ স্যান্টায়ানা অবশ্য ডিকেন্সকে Caricaturist বলেন না, কারণ অনুকরণপটুত্বকে ডিকেন্স কখনও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়া ফেলেন নাই। তাঁহার মতে Dickens একজন 'Supreme mimic of people as they reall are'। স্মলেট ও বেন্ জন্‌সনের শিষ্যত্ব করিয়া ডিকেন্স যেমন এই দুর্লভ অনুকরণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন তেমনি ডিকেন্সের উপন্যাসে শিক্ষানবিশি করিয়া তাঁহারই নিকট হইতে তারকনাথ ঐ দুইটি ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল বিস্তীর্ণ পর্যটন, গভীর জীবননিষ্ঠা, মানবসংসারের প্রতি অগাধ মমতায় কৌতূহল এবং উপচীয়মান কৌতুকবোধ।

'পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে' ইত্যাদি—কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্রের অকালবোধন প্রসঙ্গকে আশ্রয় করিয়া এই গান রচিত। অম্বিকা পূজায় প্রয়োজন

ছিল একশ আটটি নীলপদ্মের। কিন্তু নীলপদ্ম বড় সুলভ বস্তু নয়। তাহা যে দেবী-দহে ফোটে সেই দেবীদহ দশ বৎসরের পথ। বিভীষণ বলিলেন,

তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম কর দান॥
দেবের দুর্লভ পুষ্প যথা তথা নাই।
তুষ্ট হবে ভগবতী শুনহ গোঁসাই॥
শুনিয়া তাঁহার বাক্য রঘুনাথ কন।
কোথা পাব নীলপদ্ম আনিব এখন॥
দেবের দুর্লভ যাহা কোথা পাবে নর।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর॥
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয়।
স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয়॥
দাস আছে কেন প্রভু চিন্তা কর মনে।
থাকে যদি নীলপদ্ম আনিব এক্ষণে॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
এক দণ্ডে এনে দিব শত নীলোৎপল॥

নীলকমলের গানটির উৎস কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুপ্রাস-শ্লেষ-রূপক কণ্টকিত ঐ গানটি কাহার রচনা তাহা স্পষ্ট নয়। নীলকমল একলব্যের মতো গোবিন্দ অধিকারীকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহাতে মনে হইতে পারে যে গানটি গোবিন্দ অধিকারীরই রচনা। কিন্তু গোবিন্দ অধিকারী মূলত কৃষ্ণযাত্রার পালাগানের জন্য প্রসিদ্ধ। পাঁচালীকার দাশরথি রায় রামায়ণের আখ্যান লইয়া পাঁচালি রচনা করিয়াছিলেন—ড. সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ডে কৈকেয়ীর একটি গান তাঁহার মানবিক দৃষ্টি ও শ্লেষযমক রচনা ভঙ্গির উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। নীলকমলের গানটি দাশরথির রচনা কি না কে বলিবে? রচনা দেখিয়া অন্তত সেই রকম মনে হয়। 'পদ্ম আঁখি' রামচন্দ্রই, কৃত্তিবাসেও আছে—'রামের কমল আঁখি অশ্রুজলে ভাসে।" তবে ড. সুশীলকুমার দে কিন্তু রামচন্দ্রের অকালবোধন-বিষয়ক কোন পালার কথা তাঁহার Bengali Literature in the Nineteenth Century গ্রন্থে দাশরথির পালাগুলির মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। [দ্রষ্টব্য: ৪০০ পৃষ্ঠা, ১৯৬২ সংস্করণ]।

দশম পরিচ্ছেদ সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য—

এই পরিচ্ছেদ হইতেই উপন্যাসের 'picaresque' অংশ শুরু হইয়াছে। Picaresque Novel-গুলিকে বাংলায় বাউণ্ডুলের ভ্রমণবিবরণ বলা যাইতে পারে। স্প্যানিশ ভাষায় Picaro শব্দের অর্থ বাউণ্ডুলে শয়তান গোছের লোক। আসলে এখন Picaresque উপন্যাসের অর্থ দাঁড়াইয়াছে পথের চলতি ঘটনার মালা গাঁথা উপন্যাস—'a novel of the road.' এ উপন্যাসের নায়ক এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় এবং এক জীবিকা হইতে অন্য জীবিকায় ভবঘুরের মতো সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। পথ-চলতি মানুষের দেখাশোনা, ছোটোবড়ো নানা পথবর্তী সংঘটন। সুখদুঃখের নানা পরম্পরা পার হইয়া এই উপন্যাসের নায়ক কেবলই অন্যতর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে। Edwin Muir বলিয়াছেন, "The real aim of this form is obviously to provide a number of situations and a variety of objects for satirical, humorous or critical delineatious." [The Structure of the Novel, P. 28], পিকারেস্ক্ উপন্যাসের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজচিত্রণ, সমাজের নানা স্তরের নানা ধরনের মানুষ, তাহাদের বিচিত্র রীতিনীতি ও সংলাপ—সবই এই উপন্যাসের নায়কের চোখে ধরা পড়ে। সুতরাং Picaresque novel is in Consequence a study of manners—এ মন্তব্য যথার্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপন্যাস তেমনভাবে 'গল্পে'র শিকল কাটিয়া বাহির হইতে পারে নাই, অর্থাৎ তখনও পাঠককে নিরন্তর 'তারপর' 'তারপর'—এই ঔৎসুক্যের মধ্যে রাখিতে হইত বলিয়া Picaresque উপন্যাস লেখার খুবই চল হইয়াছিল। লেখকদের ধারণা ছিল নায়কের একার পক্ষে পাঠকদের সবটুকু আগ্রহ টানিয়া রাখা সম্ভবপর নাহ, সুতরাং তাহাকে ভবঘুরে করিয়া দেওয়া ভালো। তাহা হইলে অত্যন্ত সহজেই উপন্যাসের কাঠামোর-মধ্যে নতুন চরিত্র, নতুন ঘটনার আমদানি করা সম্ভব হইবে, এবং পাঠকের গল্পের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা-নিবৃত্তিরও বহু উপকরণ পাওয়া যাইবে। স্পেনেই প্রথম Picaresque উপন্যাস লেখা হয়। স্মলেটের Roderick Random, ফিল্ডিংয়ের Tom Jones, ডিফোর Moll Flanders, মার্ক টোয়েনের Huckleburry Finn ইত্যাদি ইংরেজীতে লেখা পিকারেস্ক্ উপন্যাসের নিদর্শন। ইংরেজী উপন্যাসের কষ্টসহিষ্ণু নায়কদের এক সময় প্রায়ই সরাইখানা হইতে সরাইখানায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। এই তাহারা গ্রামে পথ হাঁটিতেছে, এই লণ্ডনের রাস্তায় তাহাদের নিঃসঙ্গ ক্লান্ত পথচারণা চলিতেছে,—কখনও দস্যু-ডাকাতের দলবলের হাতে, কখনও জেলখানায়, কখনও

জাহাজের ডেকে—ভালোমন্দ নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া তাহাদের জীবন বিবর্তিত।

মনে রাখা উচিত, বিধুভূষণ চলতি অর্থে picaro নয়, কিন্তু picaro-র যে আসল লক্ষণ—ভবঘুরেপনা, 'স্বর্ণলতার' নানা পরিচ্ছেদে সেই লক্ষণ তাহার চরিত্রে দেখা দিয়াছে। 'স্বর্ণলতা'র picaresque বৈশিষ্ট্য হইতে একটি আসল রত্নের সন্ধান মিলিয়াছে—তাহা নীলকমলের চরিত্র। তারকনাথ নীলকমলকে নায়ক করিয়া একটি পুরা picaresque উপন্যাস লিখিলে পারিতেন। মুদিগৃহের ঐ ঘটনাটিও উপন্যাসে picaresque অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত।

বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ picaresque উপন্যাস নাই, কেহ লিখিবার চেষ্টাও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। 'স্বর্ণলতার' মতো অল্পবিস্তর Picaresque লক্ষণ অবশ্য আংশিকভাবে অনেক উপন্যাসেই আছে। আমাদের অনেক ঔপন্যাসিকেরই সুবিস্তীর্ণ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু কখনও একজনমাত্র নায়কের জীবনে সেই পুরা ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা কেহই কাজে লাগান নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, তারকনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার কিংবা শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিলে Picaresque উপন্যাস রচনা করিতে পারিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে পথে যান নাই, তারকনাথ অংশত আমাদের ক্ষোভ মিটাইয়াছেন; ত্রৈলোক্যনাথের নিজের জীবন আশ্চর্যভাবে picaresque হইলেও এক 'বাঙ্গাল নিধিরাম' ছাড়া তাঁহার আর কোনো উপন্যাসে ঐ ধর্ম ফোটে নাই। আর 'বাঙ্গাল নিধিরাম'ও ভিক্টর হিউগোর 'Toilers of the Sea' অবলম্বনে রচিত ত্রৈলোক্যনাথের সর্বথা মৌলিক সৃষ্টি নয়। প্রভাতকুমারের 'সিন্দুরকৌটা'তে এই Picaresque ধর্মটি কিয়দংশে পরিস্ফুট। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'ও আমাদের আংশিকভাবে picaresque-এর স্বাদ দেয়। আসলে স্থাবর সমাজের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা picaresque-ধর্মী জঙ্গমতার দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নাই। আধুনিককালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' বা প্রবোধ সান্যালের 'জলকল্লোল' ইত্যাদি উপন্যাসে হামসুন বা লরেন্সের বোহেমিয়ান ভবঘুরেমি এবং বিশ্বদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি যতটা আছে, Picaresque প্রসন্নতা ততটা নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কমিসারিয়েট—ইংরেজী Commissariat। যুদ্ধে সৈন্যদের খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে সাময়িক বিভাগ পরিচালিত হয় তাহাই কমিসারিয়েট। ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার স্থাপনের প্রথম যুগে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। কাবুলে ও ব্রহ্মদেশে ইংরেজদের খুব ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তা ছাড়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহাদের যুদ্ধায়োজনের বিশ্রাম ছিল না। এই সময় সরকারের কমিসারিয়েট বিভাগটি খুব ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল—সেখানে চাকুরি পাওয়া প্রচণ্ড লাভজনক একটি ব্যাপার ছিল। উনিশ শতকে বহু বাঙালী কমিসারিয়েটে চাকুরি করিয়া শেষজীবনে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সে যুগের বাংলা উপন্যাসের প্রবীণ চরিত্রগুলি প্রায়ই কমিসারিয়েটে চাকুরি করিতেন শোনা যায়। 'স্বর্ণলতা'য় স্বর্ণের বাবা বিপ্রদাস চক্রবর্তী; 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্র, 'গোরা'য় আনন্দময়ীর স্বামী কৃষ্ণদয়াল বাবু—সকলেই কমিসারিয়েটে কাজ করিয়া বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

'সংক্ষেপে তিনি একজন 'সেকেলে' ধার্মিক……উপার্জন জ্ঞান করিতেন'—কি ইউরোপে, কি ক্ষুদ্র বাংলা দেশে—রেনেশাঁসের পরবর্তিকালে ethos বা নীতিচেতনায় সর্বত্রই নানা রন্ধ্র দেখা দিয়াছিল। Laissez Faire বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ মধ্যযুগের দেববাদ ও নানা বিধিনিষেধের নিগড় ছিঁড়িয়া বাহির হইবার সময় সুনীতি-দুর্নীতির অস্পষ্ট সূত্রের বাঁধনটিও মানে নাই, নূতন নীতি ও মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তাই দেখা যায়, যেগুলি প্রাচীন নীতিতে মহাপাপ ও অন্যায় বলিয়া ধিক্কৃত হইত, সেগুলি রেনেশাঁসের মানুষের অনুমোদন ও প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। সেই সব কাজ যে করিতেছে তাহার মনেও কোনরূপ পাপবোধ বা গ্লানি জাগিতেছে না। ইংলণ্ডের মহামনীষী বেকন ঘুষ লইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই,—যেজন্য পোপ তাঁহাকে 'the wisest, brightest, meanest of mankind' বলিয়া নিন্দাপ্রশংসার মিশ্রিত অঞ্জলি উপহার দিয়াছিলেন। ফরাসী ভল্‌তেয়ার ফাটকাবাজিতে নামিয়াছিলেন। বাংলাদেশে রামমোহন রায়ের বিপুল উপার্জন সম্বন্ধেও নানা পরস্পরবিরোধী মতামত শোনা গেছে। কিন্তু রেনেশাঁসের উদারতম নীতিবোধ চরিত্রের আংশিক দুর্বলতার জন্য পুরা মানুষটাকে বাতিল করিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল না। বিপ্রদাস চক্রবর্তী তাই অবৈধ অর্থও গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতেন না এবং ঐ অর্থ দেবসেবায় ব্যয়

করিয়া গ্লানিমুক্ত হইতেন। 'পাপে'র অর্থ পুণ্য অর্জনে ব্যয় হইলেই আর কোনো অনুশোচনা থাকিত না; অনায়াসেই ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়াও চলিত। এই মনোভাব বাড়িতে বাড়িতে কোথায় পৌঁছাইতে পারে পরশুরামের 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া চরিত্রটি তাহার প্রমাণ।

'হেম কহিল..... এখন সকল মেয়েই লেখাপড়া করে।"— তারকনাথের সময় বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার অল্পস্বল্প প্রসার হইয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের তীব্রতাও কমিয়া গিয়াছে। বেথুন সাহেব ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মেয়েদের ইস্কুল খুলিবার পর স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী আন্দোলন চরমে উঠিয়াছিল,—'সংবাদপ্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে তাহার অম্লকটুকষায় পরিচয় মিলিবে—

যত মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম করত সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে॥
আর কি এরা এয়ো সেজে সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
এরা হুট্ বলে বুট্ পায়ে দিয়ে চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে॥

এই কবিতার যে দৃষ্টিভঙ্গি তাহা সে যুগে অনেক লোকেরই ছিল, তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির আন্দোলনের পর 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' এই কথাটি যেন বাঙালী ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিতে শুরু করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহের বিরোধী হইলেও স্ত্রীশিক্ষার সোৎসাহ পক্ষপাতী ছিলেন। এক অমৃতলাল বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতির নিরর্থক ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদ ছাড়া তখন আর স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে এমন কিছু বিঘ্ন দেখা দেয় নাই। বিপ্রদাসের সংশয়ের উপর হেমের মুক্তবুদ্ধিই জয়ী হইয়াছে, কারণ হেম কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করে, দেশের প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তার স্পর্শ সে গ্রহণ করে সকলের আগে।

একাদশ পরিচ্ছেদ সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য—

বাৎসল্য-নির্ভর ভাবাবেগপ্লুত ঘরোয়া রসসৃষ্টি বাংলা উপন্যাসের, বিশেষত শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের একটি স্বভাবিক অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রও ঘরোয়া রসসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সংযমও মাত্রাজ্ঞান কখনোই সীমা অতিক্রম করে নাই। এই পরিচ্ছেদে ভাবাবেগ প্রায় তটসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শরৎচন্দ্র প্রভৃতিরা তারকনাথ হইতেই আবেগপ্লাবনের উত্তরাধিকায় গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কথায় কথায় চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসা, বিন্দু বিন্দু প্রেম-অশ্রুপাত, শির ও ললাট

চুম্বন ইত্যাদি আচরণের প্রশ্রয় এতকাল বাঙালীর রসসংস্কারে রহিয়া গিয়াছিল,—কেহই এগুলিকে অস্বাভাবিক বা বিসদৃশ মনে করে নাই। কিন্তু আমরা, দুইটি মহাযুদ্ধ পার হইয়া আসা বাঙালী পাঠকেরা, আজকাল মনোভাবগুলি এমন অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে লজ্জা পাই, বাঙালী বাবা-মাও বুঝি এমন করিয়া বাৎসল্য প্রকাশ করেন না। আশ্চর্যের কথা এই যে, বাঙালীর অতি পরিচিত ও প্রিয় এই ঘরোয়া Sentimentalism-এর কোনো আভাস কিন্তু রবীন্দ্রনাথে নাই। মানুষের হৃদয়-বৃত্তিকে তিনি সম্মান করিয়াছেন, কিন্তু শিল্পের ঋজুকঠিন সীমার মধ্যে সেগুলিকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন—শরৎচন্দ্রের মতো বাড়াবাড়ি করেন নাই। তারকনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কোথায় যেন একটা যোগ আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রমদার মাতা—প্রমদার মায়ের মতো লোভী, স্বার্থপর, মুখরা কিছু মহিলা শরৎচন্দ্রেরও stock চরিত্র। ইহাদের আচার-ব্যবহার, সংলাপ ইত্যাদি প্রায় একই রকম। 'বিন্দুর ছেলে'তে এলোকেশীই বোধ হয় নরেনের বছরের পর বছর পরীক্ষায় ফেল-করা সম্বন্ধে মুখপোড়া 'মাস্টার'দের উপর সব দোষ চাপাইয়াছে। 'পথনির্দেশ' গল্পে গুণিনের সেই দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়াটিকেও সহজেই মনে পড়ে—তাহার অসুখ-সংবাদ শুনিবামাত্র যিনি সদলবলে আসিয়া গুণিনের সংসারতরণীর হাল ধরিয়া বসিবার বাসনা করিয়াছিলেন।

গদাধর—গদাধরের একটি নিজস্ব 'নিভাষা, বা idiolect আছে। তাহার একমাত্র বৈশিষ্ট্যকে ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় বলা যায় Spontaneous cerebralization—স্বতোমূর্ধন্যীভবন। তাহার মুখে 'ত'-বর্গের উচ্চারণ 'ট'-বর্গে দাঁড়াইত।

'শশিভূষণ এই অবধি……পরাধীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।'—শশিভূষণের অবস্থা দেখিয়া মরুভূমির হিমশীতল রাত্রিবেলায় সেই দয়ালু তাঁবুর মালিকটির কথা মনে পড়ে। একটি উট তাহার তাঁবুতে কেবল নাকটুকু গলাইবার ঠাঁই ভিক্ষা করিয়াছিলে। কালক্রমে সে-ই কী করিয়া সমগ্র তাঁবুটি অধিকার করিয়া বসে এবং বেচারী তাঁবুর মালিককে বাহিরের দুঃসহ ঠাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কম্পিতদেহে রাত্রিযাপন করিতে হয়—তাহা সকলেরই জানা আছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

'কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্তা……কষ্ট বোধ হয়।'—এই গ্রন্থকর্তা সম্ভবত বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার [১৭৮৮-১৮৬০]। তাঁহার Studies in Pessimism [T. Bailey Saunders-এর অনুবাদ]. On the Sufferings of the World-গ্রন্থে Psychological Observations অংশে তিনি বলিয়াছেন, "Every parting gives a foretaste of death; every coming together again a foretaste of resurrection."

'যখন কেহ আমাদের নিকট হইতে……অনুসন্ধান করিয়া দেখি না।'—বঙ্কিমের বৈভবশালী কবিত্ব যে তারকনাথের ছিল না তাহা বারবার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক-রূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। অনুচ্ছেদের প্রথমে মানবজীবনের একটি গভীর সত্যে প্রবেশের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু মাঝখানে আসিয়া তিনি যেন নিজের চিন্তার সূত্রটি হারাইয়া ফেলিলেন। বস্তুত, অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি হইতে শেষ বাক্যটিতে কোনো সম্ভাবনার সূত্র ধরিয়া পৌঁছানো চলে কি না সে ব্যাপারে আমাদের রীতিমতো সংশয় উপস্থিত হয়। বাজার করিতে গিয়া ঠকিয়া আসার যে হাস্যকর লৌকিক দৃষ্টান্ত তারকনাথ উদ্ধার করিলেন তাহাতেই শোপেনহাওয়ারের উক্তির গাম্ভীর্যটুকু কখন হাওয়ায় উড়াইয়া লইয়া গেল। বোঝা গেল যে, জীবনের গহনবাসী সত্যগুলি হইতে কোনো উত্তুঙ্গ দার্শনিকতায় পৌঁছাইবার ক্ষমতা তারকনাথের নাই; মানবজীবনকে তিনি উপরিতল হইতে দেখিতেই ভালোবাসেন—উপরিতলের হাস্য এবং উপরিতলের অশ্রুই তাঁহার সম্বল। নীলকমলের একক দৃষ্টান্ত ছাড়া মানুষের ট্রাজেডিকে তারকনাথ কোথাও স্পর্শ করিতে পারেন নাই, এবং নীলকমলের ট্রাজেডিও তেমন গভীর ট্রাজেডি নয়। তারকনাথ জীবনের অত্যন্ত লৌকিক স্তরেই যেন স্বচ্ছন্দ।

'শ্যামা নিকটে গিয়া কহিল……বিদেশে যায় নাই?'—শ্যামা অত্যন্ত রিয়ালিস্ট্,—তাঁহার কথাবার্তা হইতেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। সরলার বিচ্ছেদ-শোকের বাষ্পাচ্ছন্নতা শ্যামার এই আপাতকঠোর উক্তির দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেছে। ডন কুইক্‌জোটের সহচর সাঙ্কো পাঞ্জার যে প্রখর বিষয়বুদ্ধি ও টন্‌টনে সাংসারিকতা ছিল, সেই দুর্লভ গুণগুলি কেমন করিয়া যেন শ্যামাও আয়ত্ত করিয়াছে। পৃথিবীতে সাঙ্কো পাঞ্জা ও শ্যামার [এবং সম্ভবত 'পিক্‌উইক পেপর্স'-এর স্যাম ওয়েলারের] দল কোনো ভাবালুতাকে আমল দেয় না; বেদনা লইয়া বিলম্বিত হা-হুতাশ, কিংবা সুখ লইয়া অপরিমিত উল্লাস তাহাদের আসে না। তাহারা কোদাল কে কোদাল

বলিয়াই চেনে। মানুষের বিস্ফারিত আবেগের প্রতিষেধক হিসাবে তাহারা কাছাকাছিই অবস্থান করে।

'সরলার বিরহানল'—'বিরহানল' গোছের মামুলি রূপক আমাদের যুগে কেমন হাস্যকর বলিয়া মনে হয়, মনে হয় মানুষের বিরহের গভীর সংবেদনটিকে কেবল ঐ রূপকটিই একমুহূর্তে লঘু করিয়া দিতে পারে। বলা বাহুল্য, তারকনাথ পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য সহকারে ঐ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন—কারণ সমগ্র অনুচ্ছেদটি ঐ রূপকের উপরেই ভিত্তি করিয়া রচিত। এখন কবিতাতেও এইধরনের প্রথানুগত রূপক শব্দগুলিকে অস্বাভাবিক লাগে। এই ধরনের Chestnut শব্দগুলি সাহিত্যে কিছু কাল আকর্ষণীয়রূপে নূতন থাকে, কিছু কাল অভ্যস্তরূপে চলিয়া যায়, কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন এগুলিকে সম্পূর্ণ অচল ও বর্জনীয় বলিয়া মনে হয়। 'বিরহানল' এখন সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিরহের দুঃখকে এখন আগুনের সঙ্গে তুলনা করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না।

'হস্ত পদ সর্বদা নাড়ার······শব্দ হইতেছে।'—সাধারণ খুঁটিনাটি তথ্য সম্বন্ধে তারকনাথের অসাধারণ মনোযোগ এই বাক্যটি হইতেই স্পষ্ট। তারকনাথের বর্ণনা কখনোই সাড়ম্বর নয়—তাহা পরিপার্শ্বের সমস্ত কিছুকে অর্থহীনভাবে পাঠকের গোচর করিতে ব্যস্ত হয় না। নানা তথ্যসম্ভারের মধ্য হইতে কেবল তাৎপর্যময় কয়েকটি তথ্যের উপর তারকনাথের তীক্ষ্ণ চোখ পড়ে, এবং সেগুলির সাহায্যে পরিবেশের এমন একটি Profile তিনি গড়িয়া তোলেন যে পাঠকের মনেই হয় না বর্ণনাটা যথেষ্ট বিশদ হইল না, বা কোনো তথ্য বাদ পড়িয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

'বাবু একবিন্দু বিশ্রাম······পরমেশ্বরের নিয়মই এই।'—"যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু।" —বঙ্কিমচন্দ্র, 'লোকরহস্য'।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নীলকমলের 'কর্মসূত্র' উপাখ্যান—নীলকমল চরিত্রের আপাত-হাস্যকরতার গভীরে কোথায় যেন একটি বেদনার ভূপ্রোথিত প্রস্রবণ রহিয়া গেছে। এই লোকটি তাহার চাওয়া-পাওয়ার হিসাব কোনোদিন তেমন করিয়া কষে নাই, সে যে কী চায় তাহাই সে স্পষ্ট করিয়া জানে না। যাহা চায় তাহা সাংসারিক লোকের চোখে

অবিশ্বাস্য ও কৌতুককর, কিন্তু ঐ চাওয়া লইয়াই লোকটা দিন কাটাইয়া গেল। বেহালাবাদক হিসাব সে প্রতিষ্ঠা চায়, সংগীতখ্যাতির উপরেও তাহার একটু প্রলোভন আছে, মেম-বিবাহ করিতেও তাহার খুব একটা অনিচ্ছা ছিল না—যদি জাত যাইবার ভয়টা না থাকিত। নীলকমল তাহার স্বল্প আবির্ভাবের মুহূর্তগুলিতে আমাদের হাসাইয়াছে, কিন্তু হাসি সম্বরণ করিয়াই দেখিয়াছি, ওরই মধ্যে কোন্ কৌশলে সে আমাদের চোখের কোলে একটুখানি ধূসর বাষ্পাচ্ছন্নতা মাখাইয়া দিয়া গেছে। তাহার নির্বুদ্ধিতা, মানবসংসারে রীতিনীতি সম্বন্ধে তাহার অবিশ্বাস্য মূঢ়তা, তাহার সরল স্পর্ধিত বাসনাগুলি—সবই হাসির ছোটোখাটো তরঙ্গ তুলিয়া বেদনার সেই অকূল মহাসাগরের দিকে বহিয়া গেছে—উপায় যেখানে ইচ্ছার নাগাল পায় না, মানব-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনামাত্র পারানি লইয়া যে-সমুদ্র অতিক্রম করা যায় না। নীলকমল তাহার সত্তার ভাঁজে ভাঁজে আমাদের জন্য পর্যায়ক্রমে আনন্দ ও বেদনা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সবসময় তাহা ধরা পড়ে না, কিন্তু যখন এই কর্মসূত্রের আখ্যান-জাতীয় অংশে পৌঁছাই, তখন মনে হয়, ঐ সামান্য, হাস্যকর লোকটাও তাহার নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো জীবনের একটা মানে খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমরা কেন আসি, কী আমাদের প্রার্থিত, কোথায় আমাদের পরিণাম—এইসব বিষয়ে নীলকমলের জিজ্ঞাসা অন্ধকার হাতড়াইয়া মরিয়াছে। 'কর্মসূত্রে'র আখ্যান হইতে সে কোনোরূপ উত্তর পাইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু এই অংশে তাহার চরিত্রের একটি বিস্ময়কর গভীরতা হঠাৎ আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়—বিধুভূষণের মতো আমাদেরও বিস্মিত ও চিন্তাকুল করে। হতভাগ্য নীলকমল জানে না এই কর্মসূত্রের, আখ্যান তাহার 'মেমের সঙ্গে বে' হওয়ায় বাসনা হইতে কত দূরে, কোন্ পথভ্রান্ততায় তাহাকে টানিয়া লইয়া গেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

'পূর্বদেশে লোক কখনও……যাবা কোয়ানে ?"—"বর্তমান সময়ের ন্যায় তখনও চেতলা বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলণ্ডে যে সকল চাউলের রপ্তানি হইতে চেতলা সে সকল চাউলের সর্বপ্রধান হাট ছিল। এতদর্থে সুদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকা ও শালতি আসিয়া কালীঘাটের সন্নিকটবর্তী টালির নালা নামক খালকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। সুতরাং পূর্ববঙ্গনিবাসী গোলদার, আড়তদার ও বাঙাল মাঝি প্রভৃতিতে চেতলা [এবং স্বভাবতই কালীঘাট-ভবানীপুর অঞ্চল—

সম্পাদক] পূর্ণ ছিল।"—শিবনাথ শাস্ত্রী,'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,' তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঢাকাই চালওয়ালা মহাজনটির ভবানীপুরবাস এই সূত্রেই, সন্দেহ নাই।

"এ যে বারি বর মানুষ দেছি……আমি তো বলমু না।"—পূর্ববঙ্গবাসীদের ভাষা ও আচার-আচরণ লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতেই বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত। মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে, বা চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির উপাখ্যানে 'বাঙ্গাল মাঝিগণের বিলাপ' তাহার নিদর্শন। কিন্তু এই বর্ণনাগুলি স্থূল এবং অর্থহীন প্রথানুবর্তন,—মঙ্গলগানের শ্রোতাকে সস্তা হাস্যরসের এক ধরনের relief দিবার জন্য পরিকল্পিত। এযুগে এগুলির মধ্যে হাসির উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। বরং উনবিংশ শতকে দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী'তে পূর্ববঙ্গীয় চরিত্র লইরা আকর্ষণীয় হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন—কিন্তু তাহাও সর্বদা গোপাল ভাঁড় জাতীয় buffoonary ও স্থূলত্বের সীমা ছাড়াইতে পারে নাই। তারকনাথের সমসাময়িক কালে অমৃতলাল বসুও নাটকে প্রধানত কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গীয় চরিত্র আনিয়াছেন। ইঁহারা সচরাচর নিজেদের স্বকপোলকল্পিত কিছু নির্বোধ ও হাস্যকর কথাবার্তা এই চরিত্রগুলির মুখে বসাইয়াছেন, স্বোদ্ভাবিত মজাদার ঘটনাসংস্থানের মধ্যে তাহাদের নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং এইভাবে দর্শকের লঘু কৌতুককে উদ্দীপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। তারকনাথের ঢাকাই মহাজনটিকে কিন্তু ঐ সব চরিত্র হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয়। তাহার মধ্যে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভাব্য কিছু নাই, লেখক নিজের কল্পনার দ্বারা তাহার ভাষা ও আচরণকে আতিশয্যপূর্ণভাবে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন নাই। ভবানীপুরের একটি সত্যকার চালের আড়ত হইতে জীবন্ত ঐ মহাজনের ছবিটি যেন গ্রন্থের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়াছেন। অতিরঞ্জনের দ্বারা তাহাকে আরও হাস্যকর করিয়া তুলিবার নিরর্থক চেষ্টা করেন নাই। ফলে এই লোকটিই সকলের চেয়ে বিশিষ্টরূপে পূর্ববঙ্গীয় হইয়া আছে। তাহার ব্যস্ততাহীন নিরুদ্বেগ কৌতূহল, অন্য লোকের নাড়ী নক্ষত্র সম্বন্ধে অনাবশ্যক ঔৎসুক্য, কলিকাতায় নবাগতদের প্রতি ঈষৎ অনুকম্পামিশ্রিত অবজ্ঞা, কথা বলিয়া লোককে কৃতার্থ করার আয়েসী ভঙ্গি, ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ 'ভ', 'ঘ' ইত্যাদির উচ্চারণে ত্রুটি, 'ড়'-এর জায়গায় 'র'-এর উচ্চারণ, 'খ'-এর স্থলে 'হ' ব্যবহার এবং নিজের ঐ নিশ্চিন্ত অনুসন্ধানে কাহারও ঔদ্ধত্যে বাধা পড়িলে হঠাৎ চটিয়া ওঠা—সমস্তই অত্যন্ত জীবন্ত, অত্যন্ত যথার্থ, অত্যন্ত স্বচ্ছরূপে উজ্জ্বল। আমরা ভূমিকায় বলিয়াছি যে তারকনাথ চরিত্রের স্রষ্টা নন, চরিত্রসমূহের স্রষ্টা, ব্যষ্টি অপেক্ষা বৈচিত্র্যের উপরেই তাঁহার নজর বেশি—তাহা এই ছোটোখাটো চরিত্রগুলির সজীব

রূপায়ণ হইতে ধরা পড়ে। নিঃসঙ্গ মানুষ অপেক্ষা পৃথিবীতে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত বহুধাবিস্তৃত মানুষের দিকেই তাঁহার অভিনিবেশ।

ঢাকই চালওয়ালা মহাজনটি বিধুভূষণের অমার্জনীয় স্পর্ধায় খুব চটিয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার সচ্ছলতা, নিরুদ্বেগ, এবং আপন কর্মচারী ও ব্যবসায়কর্মের উপর অপ্রতিহত অধিকারের জন্য বিধুভূষণ নীলকমলের মতো জীর্ণমলিন পোষাক-পরা রাস্তার লোকদের কৃপার চোখেই দেখিতে অভ্যস্ত। তাহার ধারণা, ঐ শ্রেণীর লোকেরা সকলেই তাহার অনুগ্রহভাজন। কিছু বেতনভুক্ কর্মচারীর বশ্যতা পাইয়া তাহার মেজাজটাই বাদশাহী গোছের হইয়া গেছে। কিন্তু বিধুভূষণের মধ্যে লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতার ছিঁটেফোঁটাও জাগে নাই। অবান্তর কথা কহিয়াই তাহাদের ধন্য করিতেছে—লোকটার এইরকম ভাবভঙ্গি তাহার দুষ্পাচ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে। 'যাবা কোয়ানে'—এই প্রশ্নের জবাবে সে বিরক্ত হইয়া যে গন্তব্যস্থানের উল্লেখ করিয়াছে তাহা ঐ বিত্ততৃপ্ত, আত্মপ্রসন্ন মহাজনকে ক্রুদ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। বিধুভূষণের সপ্রতিভ ও বিরক্ত উত্তর শুনিয়া মহাজনটি তাহাকে অত্যন্ত দাম্ভিক ও স্পর্ধিত মনে করিয়াছে। তাহার সহিত তুলনা দিবার জন্য ঐশ্বর্যশালী পুরুষ রাজা রাজবল্লভের একজন কল্পিত পৌত্রকে টানিয়া আনিয়াছে। তাহার কাছে রাজা রাজবল্লভই সমৃদ্ধি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির শেষ সীমা, এবং তাঁহার পৌত্রদেরই এইরূপ দম্ভ দেখানো সাজে। এখনকার লোকে 'লাটসাহেবের নাতি' বলিতে যাহা বোঝায় মহাজনটির আঞ্চলিক সংস্কারে তাহাই 'রাজা রাজবল্লভের নাতি'তে দাঁড়াইয়াছে। বিধুভূষণের ঐ স্পর্ধিত উত্তর লোকটিকে এখন ক্রুদ্ধ করিয়াছে যে সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের অহংকারী ঔদার্যটুকুকে প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছে, এবং ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিবার জন্য বিধুভূষণকে বলিয়াছে—'যা তোরা তোর দেহে নে গে কালীবারী, আমি তো বল্‌মু না।' ইহারা অহংকারতৃপ্তির জন্যই লোককে সংকীর্ণ উদারতা দেখায় এবং আত্ম-স্তরিতায় খোঁচা লাগিলে পরক্ষণেই নিজেদের স্বার্থপর সত্তায় ফিরিয়া যায়।

'মন্দিরের দ্বারে একজন কালীর পরিচারক……পয়সা চাহিল'—তারকনাথ ব্রাহ্মদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের অনাচারগুলি তাঁহার ব্যঙ্গবাণ হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। তাঁহার মুক্তবুদ্ধি সংস্কার কোনো ধর্মের অতিশয্যকেই ক্ষমা করে নাই। আসলে যিনি সার্থক ব্যঙ্গকার—তিনি সর্বপ্রকার অতিশয্যকেই আক্রমণ করেন, তাহা অপরপক্ষেরই হোক, বা আত্মপক্ষেরই হোক। নিরপেক্ষতা ব্যঙ্গকারের একটি প্রয়োজনীয় গুণ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

'কাহারও কাছে সাহায্য না লইয়া……পাঠ করিতে শিখিলেন'—প্রিয় চরিত্রগুলকে লেখক নানা অলৌকিক ক্ষমতা দিয়াছেন দেখা যাইতেছে। স্বর্ণলতার এই অবিশ্বাস্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাহার প্রতি তাহার স্রষ্টার মমতাটিকে ধরাইয়া দেয়। এই ধরনের চরিত্রগুলিই আদর্শায়িত—idealised—ইহারা লেখকের স্নেহ, প্রশ্রয়, স্বপ্ন ইত্যাদি অমলিন অনুভবের দ্বারা তৈরী। তাই ইহারা উজ্জ্বল, লাবণ্যময়, আদরণীয় এবং সকলের প্রীতিভাজন। লেখক ইহাদের জন্য নিজের সস্নেহ অনুরাগটি সকলের চিত্তেই সঞ্চারিত করিতে চান।

'বিপ্রদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ……তাহার সন্দেহ নাই'—তারকনাথ বারবার স্নেহমমতাকীর্ণ অশ্রুসজল গৃহসুখসৌভাগ্যের সেই বৃত্তটিতে ফিরিয়া আসিতেছেন। নিজের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন পারিবারিক সুখসম্ভোগ তাঁহার ভাগ্যে জোটে নাই,—কর্মসূত্রে তাঁহাকে প্রায়ই পথবাসী থাকিতে হইয়ায়ে। কে বলিতে পারে সেইজন্যই গৃহসুখের কেন্দ্রে ফিরিয়া আসার জন্য উপন্যাসে তাঁহার এমন ব্যাকুল তৃষ্ণা কি না? স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণের মতোই যেন তারকনাথ নিজের গৃহসুখরিক্ত পথচারণার মধ্যে উপন্যাস লিখিয়া কল্পনায় সংবেদনময় গার্হস্থ্য সুখ ভোগ করিয়াছেন।

অশ্রুপাত, ভাবাবেগ ইত্যাদির প্রাচুর্য এই পরিচ্ছেদটিকে একাদশ পরিচ্ছেদেরই অনুবৃত্তি বলা যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদ হইতে কাহিনীর জটিলতা একটি প্রায় অভাবিত পথে মোড় নিয়াছে। ঘটনার গতি এতক্ষণ পর্যন্ত যে ধারায় অগ্রসর হইতেছিল সেই ধারায় চলিতে থাকিলে 'স্বর্ণলতা' একটি সার্থক পারিবারিক উপন্যাস হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু শুধু পারিবারিক ঈর্ষা, বঞ্চনা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি উপকরণ লইয়া লেখক তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই, কাহিনীর মধ্যে সস্তা অপরাধমূলকতার অবতারণা করিয়াছেন। প্রমদা গদাধরকে সরলার সংসারের টাকা চুরি করিতে উত্তেজিত করিয়াছে, এবং গদাধর সানন্দচিত্তে সেই টাকা চুরি করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পরে গদাধরচন্দ্র আরও বড় অপরাধ করিবে, সে গোপালের সই জাল করিয়া বিধুভূষণের মনি-অর্ডারগুলি আত্মসাৎ করিবে। হয়তো সেই অপরাধের প্রস্তুতি হিসাবেই লেখক তাহাকে দিয়া এই পরিচ্ছেদে চুরি করাইয়াছেন। কিন্তু, এই চুরি, স্বাক্ষর

জাল, মদ্যপান, ষড়্‌যন্ত্র, আদালত ইত্যাদি সম্বলিত এই উপকাহিনীটি সমগ্র আখ্যানের পক্ষে খুব প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। প্রমদা এত নীচ হইবে কেন, গদাধর এত অর্থহীনভাবে ক্রূরকর্মা এবং নির্বোধ হইবে কেন—লেখক তাহার কোনো কারণ নির্দেশ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাহাদের এই অত্যন্ত হীন স্বার্থপরতাটি বংশানুক্রমিক--লেখক এই আভাস দিলেও তাহা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কিনা সন্দেহ। লেখকদের মধ্যে বহুদর্শিতা অনেকসময় একটি ব্যাধির জন্ম দেয়। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার গুরুভার সামলাইতে গিয়া অনেক লেখক হিমসিম খাইয়া যান। তারকনাথের ক্ষেত্রেও তাই হইয়াছে—বাস্তবের পারিবারিক চিত্র আঁকিতে গিয়া তিনি নির্মম বর্জননীতির পরিচয় দিতে পারে নাই। ভালো-মন্দ, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা ও চরিত্রকেই তিনি তাহার প্রথম উপন্যাসের শরীরে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে কাহিনী জটিলরূপে শাখাপ্রশাখায়িত হইয়াছে, আখ্যানসূত্রে গ্রন্থির গ্রন্থি পড়িয়াছে। লেখক অপরাধ-মূলকতার ঝাঁঝালো মশলা দিয়া এমন একটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা জিহ্বার কাছে আকর্ষণীয় অথচ যাহা নিজের বিশিষ্ট আস্বাদ হইতে ভ্রষ্ট। শেষ দিকে গোয়েন্দা কাহিনী-সুলভ বহুজালজটিল ঘটনাসঙ্কুলতার আমদানি করাতে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস তাহার পারিবারিক চারিত্র হইতে চ্যুত হইয়াছে। এই বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে সেই পথচ্যুতির আরম্ভ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

'কাগজলেখক ছাত্রেরা......অর্থের প্রতি দৃক্‌পাতই নাই।'—'অর্থ' কথাটিই দ্ব্যর্থক, তারকনাথের সুন্দর pun বা শ্লেষ-প্রয়োগের নিদর্শন। বাক্যনিহিত শব্দের অর্থ এবং কোষাগারের মৌদ্রিক অর্থ—দুইই একটি শব্দের মধ্যে অন্বিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গল্প-উপন্যাসের ভাষায় একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা ভালো। অনেক সময় দেখা যায় সাধুভাষা ও কথ্যভাষায় জল-অচল বিভাগ লেখকেরা রক্ষা করিয়া চলেন নাই। বঙ্কিম পরবর্তী যুগে সচরাচর সংলাপ কথ্য ভাষায় এবং বিবৃতি সাধুভাষায় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অনেক সময় বিবৃতির মধ্যেও কথ্য প্রয়োগ হঠাৎ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আছে—'কলার পাতায় কেহ হেঁকে হেঁকে "সেবক শ্রীউত্তমচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ" পাঠ লিখিতেছে।' 'হেঁকে হেঁকে'—এই দ্বিরুক্ত শব্দটি কথ্যপ্রয়োগ। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়—

'গদাধরচন্দ্র অজ্ঞান! তার কপালে কি দুঃখ? তার বিশ্বাস, ক্রমেই তার সুখ বৃদ্ধি হচ্ছে।' ২৪শ পরিচ্ছেদে ৩য় অনুচ্ছেদে অধিকন্তু দ্রষ্টব্য। এমন হইতে পারে যে কাহারো বিশ্বাস, কল্পনা বা চিন্তাকে লেখক অনেক সময় কথ্য সংলাপের ভাষায় রূপ দিয়াছেন—সে হিসাবে ঐ সব ক্ষেত্রে চলিত প্রয়োগ সমর্থনীয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সাধু ও মৌখিক ভাষার লড়াইয়ে মৌখিক ভাষার অদম্য প্রাণশক্তি এইসব দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। কৃত্রিম সাধু প্রয়োগের মধ্যে হঠাৎ চলতি শব্দ আসিয়া আসন নিয়াছে, এবং আপন বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশের প্রতি সচেতন লেখক ঐ জবরদখলকারী চলিত শব্দগুলিকে হঠাইয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছেন। বক্তব্য আরো আড়ষ্ট হইবার ভয় ছিল বলিয়াই কি না কে জানে।

'নিধিরাম হালি তামাকে দীক্ষিত'—'হালি'—সম্প্রতি, ইদানীং।

ভুবন ও গোপাল—গোপালও যেন এক বিচিত্র 'এল্ ডোরাডো'র নাগরিক—মণি-মাণিক্যের মতো সে পথে ঘাটে বন্ধু ও মমতার আশ্রয় কুড়াইয়া পায়। পাঠশালা-জীবনে সে ভুবন ও তাহার মাকে পাইয়াছে। কিন্তু কী যে তাহাদের প্রয়োজন, খানিকটা অনাবশ্যক স্নেহবৎসলতার আবেগসৃষ্টি ছাড়া কোন্ কাজে তাহারা লাগিয়াছে তাহা লেখক ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারেন না। লেখক নিজেই গোপালকে সর্বপ্রকার নিগ্রহ হইতে সযত্নে রক্ষা করিতে চান, তাহার কোমল দেহে পৃথিবীর অবিচারের এতটুকু দংশন তিনি সহ্য করিতে পারেন না। অনুকূল বিধাতার মতো তিনি নিজেই চরিত্র ও ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া গোপালকে সমস্ত আঘাত-সংঘাত উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ভুবন ও তাহার মায়ের আবির্ভাব শুধু এই জন্যই, উপন্যাসের বৃহৎ অঙ্গের মধ্যে তাহাদের স্থান দেওয়া খুব অপরিহার্য ছিল না। 'শুক্লপক্ষে'র প্রতি লেখকের সদাশয়তার সীমা নাই।

'গদাধর, তোমারও মা......প্রমদা, তোমারও সন্তান আছে!'—লেখক নিজেই এক পক্ষের হইয়া ভালোমন্দের লড়াইয়ে নামিয়াছেন, সুতরাং প্রমদার দলের জিতিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। গদাধর ও প্রমদার প্রতি এই সর্ভৎসন ধিক্কার ছুঁড়িয়া দেওয়ার মধ্যে আর যাহাই থাক, ঔপন্যাসিকের অবশ্য-কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা গুণটি নাই। এই উত্তেজনা বস্তুরসপ্রধান উপন্যাস-স্রষ্টার শোভা পায় না। নিজের নিরাসক্তির অবস্থানটি হইতে কথায় কথায় লাফাইয়া ওঠা তাঁহার সাজে না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

'নীলকমল কহিত……আমি একজন কালওয়াৎ।'—নীলকমল চরিত্রের একটি ধারা সহজেই বোঝা যায়—আত্মবঞ্চনায় ডন কুইক্‌জোট অপেক্ষা সেও কিছু কম যায় না! তাহার বাস্তববোধের অভাব, নিজের ক্ষমতা ও কুশলতা সম্বন্ধে অপরিমেয় আস্থা, নিজেকে গানের Muse-এর বরপুত্র মনে করিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্তী অন্য সকলের প্রতি গভীর অবজ্ঞা পোষণ—সবই তাহার করুণপরিণতিকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে। সে নিজের চারপাশে এমন একটি অস্মিতার বৃত্ত রচনা করিয়াছে, যাহার মধ্যে কোনোরূপ আন্দোলন আনা বাহিরের কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত আত্মপ্রসাদ এবং সাংসারিক বুদ্ধির ভয়াবহ অভাব—এই দুই বৈশিষ্ট্যের টানা-পোড়েনে নীলকমল কোনো দিন শান্তি পাইল না। প্রথম দিকে তাহার শিল্প [সে শিল্পের দাম যাহাই হোক না কেন] তাহার সান্ত্বনা ছিল,—ঈশ্বরদত্ত আনন্দের আশীর্বাদ সে পাইয়াছিল। উপন্যাসের শেষে যখন ঐ শান্তি ও আনন্দকে তাহার হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে দেখি তখন নীলকমলের জন্য আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

'বিধুভূষণ পাঁচালির দলে……অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল।'—বিধুভূষণের দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে। এখন লেখকের কৃপায় তাহার সম্মুখবর্তী সমস্ত বাধা নিমেষে অপসারিত হয়। এই পরিচ্ছেদে সে বাদ্য বাজাইয়া দলের অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিয়াছে [যদিও পাঁচালির দলে এই ধরণের ঘটনা অবিশ্বাস্য বলিলেই হয়—কারণ পাঁচালির প্রধান অঙ্গ গান, বাদ্য নয়, এবং গানে ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকিলে শুধু বাজনা শুনাইয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করা যায় না]। পরের পরিচ্ছেদে লোকে 'গানে যত মোহিত' না হইয়াছে, 'বাজনা শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক প্রীতি লাভ' করিয়াছে। প্রিয় চরিত্রের গুণপনাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে গিয়া লেখক হয়তো বাস্তব সম্ভাব্যতার সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন।

'আশা! ধন্য তোমার ছলনা……মুক্ত হইতে পারে না।'—'আশা'র প্রতি এই গদ্যে লেখা ode-টির সঙ্গে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের আশা-প্রশস্তির যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। 'স্বর্ণলতা' ১৮৭৪-এ প্রকাশিত- 'পলাশির যুদ্ধ প্রকাশিত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। নবীনচন্দ্র তারকনাথের এই সংক্ষিপ্ত গদ্যোচ্ছ্বাসটির

দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। তবে ইংরেজী কাব্যে আশা-প্রশস্তির অভাব নাই—এবং উভয়েই হয়তো সেই একই উৎস হইতে সমভাবে প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল—এই পরিচ্ছেদ হইতেই নীলকমল রূঢ় সাংসারিকতার দংশনে কাতর। তাহার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়াছে, আত্মপ্রসাদের দুর্গ চুরমার হইয়া গেছে—আশাহত ভগ্নচিত্ত নীলকমল নির্বোধের আনন্দময় জগৎ হইতে নির্বাসিত। পরিচ্ছেদের শেষে সে 'পদ্ম আঁখি' গানটি আর গাহিবে না বলিয়া সংকল্প করিয়াছে। এই গানটি ত্যাগ তাহার জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ আনন্দকেই ত্যাগ করিবার ইঙ্গিত। ঐ আনন্দ নীলকমল আর কোনোদিন নিষ্ঠুর পৃথিবীর হাত হইতে ফিরিয়া পায় নাই। তাহা ছিনাইয়া লইবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

'তাঁহার শরীর যতই শীর্ণ...যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে।'—তারকনাথ নিজে চিকিৎসক ছিলেন, রোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষণ তাঁহার চোখে ধরা পড়িত। এই পরিচ্ছেদে সরলার রুগ্ণ দেহ এবং অবসন্ন মানসিকতার বর্ণনা লেখকের তন্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ও গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সুন্দর পরিচয় তুলিয়া ধরিয়াছে। গল্প-উপন্যাসের 'ভালো' চরিত্রগুলির পক্ষে দুঃস্থতা, রোগগ্রস্ততা কিংবা মৃত্যু একটা আশীর্বাদের মতো—এই সব উপায়ের দ্বারা লেখক তাহাদের জন্য পাঠকের সহানুভূতি কাড়িয়া রাখেন। কিন্তু আমাদের এই উদাসীন জ্ঞানটুকু সত্ত্বেও আমরা দুঃখে অভিভূত হই—যদিও জানি,—সে দুঃখ কল্পিত দুঃখ।

'শ্যামা তোমার কীর্তি...লিখিয়া রাখিতেছেন।'—'স্বর্ণলতা'য় লেখকের অনাসক্ত নির্মমতা মুহুর্মুহু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শ্যামার সুকৃতের পুরস্কার ঈশ্বর দিবেন কিনা জানি না—কিন্তু পাঠকের যে অসামান্য প্রীতিরস সে লাভ করিয়াছে তাহাই তাহার যথার্থতম পুরস্কার। স্বর্ণলতা বা গোপালকে হয়তো আমরা ভুলিয়া যাইব কিন্তু শ্যামাকে কখনোই ভুলিতে পারিব না। ঐ অবিস্মরণীয়তাই শ্যামার ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের সত্যকার পুরস্কার। শ্যামা যে ধরণের চরিত্র, তাহাতে ঈশ্বরের কাছ হইতে পুণ্যের প্রতিদানের জন্য তাহার খুব একটা মাথাব্যাথা আছে বলিয়া

মনে হয় না। তাহার রূঢ়ভাষিত মূর্তির অন্তরালে যে স্নেহমমতামণ্ডিত অতুলনীয় হৃদয়টি রহিয়াছে, তাহা প্রতিমুহূর্তে আপন সেবা ও স্নেহের মধ্যেই পুরস্কার ও প্রতিদান পাইয়া চলিয়াছে। নিজেকে প্রতিমুহূর্তে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে সে প্রতিমুহূর্তে অধিকতর ঐশ্বর্যশালিনী করিয়া তুলিতেছে। লেখক তাহার জন্য বিধাতার প্রসাদ বরাদ্দ করিয়াছেন—তাহাতে শ্যামার কিছুই আসে যায় না। বরং শ্যামার সত্যকার বিধাতা যে তারকনাথ, তিনিই 'অক্ষয় কাগজে অক্ষয় অক্ষরে' তাহার কথা লিখিয়াছেন। তাই উপসংহারে এই বাড়তি মন্তব্যটুকুর কোনো প্রয়োজন ছিল না। শ্যামার good-conduct-এর পুরস্কার বিতরণও অপ্রয়োজনীয় ছিল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে যে ঘটনা-প্রাধান্যের আভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা এই পরিচ্ছেদে আরও স্পষ্ট—গদাধর ও রমেশের কথাবার্তার অন্তরাল হইতে একটা ষড়্‌যন্ত্রের আভাস উঁকি দিতেছে। সেই অপরাধপ্রবণতা ক্রমে লেখকের একটি প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিতেছে। উপন্যাসের ভাষাও বিবৃতিমূলকতা ছাড়িয়া সামান্য নাটকীয়তার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনার গতি মূলত সময়ের পরম্পরাকে লঙ্ঘন করে নাই—ঘটনাগুলি পর পর আসিয়াছে, পরিচ্ছেদগুলিও সময়সঙ্গতি অনুযায়ী সাজানো হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে কিন্তু চলচ্চিত্রের পশ্চাৎ প্রক্ষেপণ বা flash-back-এর মতো দুয়েকটি আগে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনাকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহাতে উপন্যাসের অঙ্গে নাটকীয় ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হইয়াছে। বিংশ পরিচ্ছেদ হইতেই উপন্যাসের স্বভাবে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—'স্বর্ণলতা' Novel of Character হইতে গিয়া হঠাৎ Novel of Action-এর দিকে মোড় নিয়া ফেলিয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে লেখকের সূক্ষ্ম অনুধাবনশক্তির আর একটি বিস্ময়কর নিদর্শন পাই। বিধুভূষণ সরলার হতশ্রী কৃশতা দেখিয়া শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে, সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সরলাকে ওরূপ অবস্থায় দেখিবে। সরলা হাসিয়া উত্তর করিল, এখন হইতে সে ভালো হইবে; কিন্তু ক্লান্তিতে সে বসিতে পারিতেছিল না, অবসন্ন হইয়া শয়ন করিল। এই ঘটনার পরেই তারকনাথ লিখিতেছেন—'শ্যামা

নিকটে বসিয়া সরলার কেশ একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিল।' এই একটি কথা তারকনাথের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া নেয়। জীবনকে তিনি যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ফাঁকি ছিল না। তাঁহার সীমাবদ্ধতা অনেক ছিল, কিন্তু যেখানে তিনি সত্যই ক্ষমতাবান সেখানে তাঁহাকে আমাদের অর্ঘ্য দিতেই হইবে।

ডাক্তারবাবু—মনে হয়, এই ডাক্তারটি স্বয়ং তারকনাথ, আর কেহই নয়। নিজের সংবেদনা দিয়া সৃষ্ট নায়িকার দুঃখ নিজের চোখে দেখিবার জন্য যেন হঠাৎ তিনি নেপথ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় নামিয়া মঞ্চে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। স্রষ্টার নির্লিপ্ত দূরত্বের অবস্থানে থাকা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই হয়তো স্নেহময় পিতার মতো সব দূরত্বের বেড়া ভাঙিয়া নিজেই তাঁহার সৃষ্ট আর্ত চরিত্রগুলির পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ডাক্তারের বেশে নিজের অশ্রুপাতের সুযোগ করিয়া লইলেন। যে ডাক্তার রোগিণীর দুঃখে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে না সে ডাক্তার তারকনাথ ছাড়া আর কে?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

এই উপন্যাসের স্বভাব-পরিবর্তন মোটামুটিভাবে বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শুরু হইয়াছে। ইহার পর হইতে ঘটনার ধারা তিনটি খাতে বহিয়াছে—একটি গদাধর রমেশের ষড়্যন্ত্রজাল, অন্যটি শশিভূষণের তহবিল তছরুপ; তৃতীয়টি সূত্রপাত হেমচন্দ্র বিপ্রদাসের গৃহ হইতে—স্বর্ণলতা 'অপহরণ', শশাঙ্কের দুরভিসন্ধি ও তাহার প্রতিফল লাভ। কাহিনীর প্রধান সূত্রে আছে বিধুভূষণ, শ্যামা গোপালের আখ্যান। উপরিউক্ত তিনটি কাহিনীসূত্র বিধুভূষণ-গোপাল-শ্যামার কাহিনীর সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া যে গ্রন্থিপরম্পরা সৃষ্টি করিয়াছে—উপন্যাসের পরবর্তী সমস্ত আখ্যান সেই গ্রন্থিমোচনের ইতিবৃত্ত। গদাধর-গ্রন্থিটি অবশ্য এই পরিচ্ছেদেই খোলা হইয়াছে—তাহার সই জাল করিয়া রেজিস্টারি চিঠি গ্রহণ ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার জন্য চৌদ্দ বৎসরের শ্রীঘর বাস বরাদ্দ করা হইয়াছে। অপরাধের তুলনায় দণ্ডটি গুরু হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে আমাদের সঙ্গে নীলকমলের প্রায় শেষ সাক্ষাৎ, পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে সে অল্পক্ষণের জন্য তাহার করুণ লাঞ্ছনা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, এবং ইহার পর পৃথিবীর সুখদুঃখমথিত বিশাল জনসমুদ্রে তাহার তাহার নিজের বিচিত্র ট্রাজেডিটি লইয়া লইয়া সে যে কোথায় মিশিয়া গেল লেখক তাহার কোনো হদিশই দেন নাই। ভালোই হইয়াছে। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে নীলকমল অপরিহার্য চরিত্র হইয়া উঠে নাই—যদিও উপন্যাসের সজীবতার জন্য সে অনেকাংশে দায়ী। ইহা ছাড়া, নীলকমল তাহার নির্বোধ অহমিকার মধ্যে যেমন সত্য, অন্য কিছুতেই তেমন সত্য ও আকর্ষণীয় নয়। যদি উপন্যাসের শেষে বিধুভূষণ নীলকমলের দেখা পাইতেন তাহা হইলে সেই নীলকমলকে লইয়া আমরা সুখী হইতে পারিতাম না। ঐ অতিবেদনাশীল মানুষটি ততদিনে পৃথিবীর বিরূপতার প্রহার খাইয়া নিশ্চয়ই নির্জীব হইয়া গেছে, তাহার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়াছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার কল্পনায় বজ্রাঘাত নামিয়াছে—এবং আদর্শ বাস্তবের আপোষহীন দ্বন্দে যেমন হয়—সে হয়তো উন্মাদ হইয়া গেছে। পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে আমরা ঐ ভয়াবহ সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করিতে শুরু করি। সেই নীলকমলকে লইয়া আমরা কী করিতাম? গোপাল-স্বর্ণলতায় সুখী সংসারে নীলকমল একটা গুরুভার বোঝা হইয়া থাকিত মাত্র। উন্মাদ যদি সে নাও হয়, তবু সে অবাঞ্ছিত। মূঢ় প্রত্যাশা, অহমিকাপূর্ণ আত্মবোধ ইত্যাদির বাহিরে যে নীলকমল—সে একটা সাদামাঠা সাধারণ মানুষ, তাহাকে লইয়া 'স্বর্ণলতা'র আর কোন প্রয়োজনই নাই। চোখের জল ফেলিতে আমরা খুব রাজী আছি, কিন্তু লেখক যে নীলকমলের শেষ দুর্দশার সম্মুখে আমাদের নিয়া হাজির করেন নাই, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। নীলকমলের আসল গৌরব তাহার নির্বোধ স্বপ্নদর্শিতায় ও অহংকারে—সেই গৌরব হইতে চ্যুত নীবকমলকে দেখিয়া আমরা খুশী হইতাম না। তাহার উন্মত্ততা দেখিলে আমাদের আরও কষ্ট হইত। অথচ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের শেষে আমাদের আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। গোপালের স্বর্ণলতা মিলিয়াছে, দুরাচারীরা যথাযোগ্য শাস্তি পাইয়াছে—রূপকথাধর্মী 'ইচ্ছাপূরণে'র আখ্যানের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। তখন ভাগ্যের মার খাওয়া নীলকমলের মর্মান্তিক ট্রাজেডির জন্য কে বসিয়া আছে? সুতরাং লেখক উপসংহারের বহু পূর্বেই নীলকমলকে পাঠকের মনোযোগের অন্তরালে ঠেলিয়া দিলেন। এই সুবিবেচনাপ্রসূত নিষ্ঠুরতার জন্য তারকনাথকে সাধুবাদ দিতে ইচ্ছা হয়।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কর্তা ও কানাইবাবু—এই পরিচ্ছেদে কাহিনী 'শুক্লপক্ষ' ও 'কৃষ্ণপক্ষে' নূতন চরিত্রের যোগ হইয়াছে। শুক্লপক্ষে আসিয়াছে হেমচন্দ্র—সে কাহিনীর ধারাকে নিজের খতে সবলে টানিয়া লইবে। কৃষ্ণপক্ষে যোগ দিয়াছে কর্তাবাবু ও কানাই। কাহিনীর পক্ষে তাহাদের গুরুত্ব কিছুই নয়। হেমচন্দ্রের ভূমিকা উত্তরোত্তর গুরুত্বলাভ করিবে, কিন্তু ইহাদের ভূমিকা এই পরিচ্ছেদেই সাঙ্গ হইয়াছে। লেখক ইহাদের আনিয়াছেন গোপাল ও শ্যামার দুর্দশার পটভূমিটি স্পষ্ট করিবার জন্য। এই নিষ্ঠুর পিতাপুত্রের চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে এমন বলি না—কিন্তু ইহাদের নিষ্ঠুরতারও পুরা অর্থ পাওয়া যায় না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রামকুমার চাকর—রামকুমার নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রীয় ভৃত্যচরিত্রের পূর্বাভাস। 'রামকুমার বাটীর বহুকালের চাকর, হেমকে হইতে দেখিয়াছে, তাঁহাকে অপত্য-নির্বিশেষে স্নেহ করে ও প্রভুর ন্যায় ভক্তি করে।······রামকুমার হেমের অভিভাবক স্বরূপ-থাকে, চাকর-স্বরূপ নহে।'—এই বর্ণনায় রামকুমারের ও হেমের নামের বদলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গল্পের কোনো ভৃত্য ও নায়কচরিত্রের নাম বসাইয়া দিলে একটুও অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না। 'দেবদাস' কিংবা 'শ্রীকান্ত'-এ অবলীলাক্রমে ঐ বর্ণনাটি বসাইয়া দেওয়া চলে।

"রামকুমার, ছেলেটিকে দেখে······রাঁধা ভাত পাবে।"—হেমের সঙ্গে গোপালের যে চিরস্থায়ী সম্পর্কের বাঁধন পড়িবে, লেখক পূর্ব পরিচ্ছেদ হইতেই তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। সহানুভূতি ও সমবেদনার সূত্রে তাহার সঙ্গে গোপালের পরিচয় হইয়াছে। সমবেদনা ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে, বন্ধুত্ব হইতে আত্মীয়তায় পৌছিতেও কোনো বাধা দেখা যায় নাই। সম্ভাব্যতার এবং প্রত্যাশার সহজ বাঁধা পথে ইহাদের আখ্যান অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আধুনিক কালের সংশয়কণ্টকিত লেখক, যিনি জীবনের জটিলতাকে প্রায় দুর্মোচ্য বলিয়াই জানেন—তিনি এমন নির্দ্বিধায় এই সহজযান অনুসরণ করিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার কাছে হেমচন্দ্রের অমলিন সমবেদনা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইত। তিনি ভাবিতেই পারিতেন না যে ঐ সমবেদনার সঙ্গে কোনো সূক্ষ্ম কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞা

জড়িত নাই এবং ঐ অবজ্ঞা হেম ও গোপালের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো সমস্যার অবতারণা করিবে না। এখন স্নেহ, দয়া, মমতা, প্রেম, সমবেদনা ইত্যাদি বৃত্তিগুলির শুদ্ধতায় আমাদের অবিশ্বাস জন্মিয়া গেছে। মানুষও ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য শ্রেণীতে ভাগ হইয়া গেছে। কিন্তু তারকনাথের কাছে এ ধরণের কোন সমস্যাই ছিল না। হেম যে শুভ্র করুণার দ্বারা গোপালকে তাহার দীনতা হইতে টানিয়া তুলিয়া আপন সমতলে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে তাহা এ যুগ হইলে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। সম্ভব হইলেও বিশ্বাসযোগ্য হইত কিনা তাহাতেও সন্দেহ। কিন্তু তারকনাথ ঐ অবিশ্বাস্যতার নরম মাটির উপরেই আখ্যানের শক্ত ভিত গাঁথিয়াছেন। গোপাল আসিয়া হেমের সংসারে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাহার এই আগমনটি তেমন গৌরবের না হোক—শেষ পর্যন্ত সকল গৌরব যে তাহারই অধিকারে আসিবে —লেখকের এই বাসনাটির আভাস দুর্লক্ষ্য নয়।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নবনারী—'নবনারী' নীলমণি বসাক রচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়াদের আখ্যান সহজ গদ্যে লিখিয়া বঙ্গনারীদের মধ্যে সুনীতিশিক্ষার প্রচার লেখকের কাম্য ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে 'পারস্য ইতিহাস' [১ম খণ্ড ১৮৩৩] অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরে 'নবনারী', 'পারস্য উপন্যাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ইত্যাতি গদ্য গ্রন্থ লিখিয়া তিনি সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার সেই আদিযুগে 'নবনারী' গ্রন্থটির যে অত্যন্ত সমাদর হইয়াছিল এই পরিচ্ছেদের ঐ তুচ্ছ ঘটনাটি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য 'স্বর্ণলতা'র পড়িবার জন্য 'নবনারী' আনা এবং তাহার 'সীতা' অংশ পড়িতে বসার অন্য তাৎপর্য আছে। [ভূমিকা দ্রষ্টব্য]।

"স্বর্ণ। তবে আমরা দুজনেই সমান"—একটি সলজ্জ অনুরাগের উন্মেষ গোপালের মধ্যেই প্রথম দেখা দিয়াছে, সেই সঙ্গে দেখা দিয়াছে নিজের দুঃসহ দীনতাবোধ ও কুণ্ঠা। গোপালের দুর্জয় সঙ্কোচ, তাহার 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গোছের দ্বিধা, নিজের দারিদ্র্যের কথা মনে করিয়া হতাশ্বাস দৈন্যবোধ—পরিচ্ছেদের শেষে যেন একটুখানি সম্বল ও নির্ভর পাইয়াছে। স্বর্ণলতাই, তাহাকে সেই যৎসামান্য বিশ্বাসটুকু দিয়াছে। দুজনেই দেখিয়াছে যে অন্তত মাতৃহীনতার বেদনা অনুভবের সূত্রে দুইজনে সমান হইতে পারে। ইহাই তাহাদের উজ্জ্বল, রক্তিম,

মধুর, নিষ্পাপ 'গোপনীয় সম্বন্ধে'র প্রথম ধাপ। দুইজনের অনুভবের সম্মিলিত শোভাযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ ঐ সমানধর্মিতার উপর।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এইটিতে এবং ইহার পরবর্তী পরিচ্ছেদে যথাক্রমে স্বর্ণ ও গোপালের পূর্বরাগ-ব্যাকুলতার বিবরণ আছে। নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি ঔপন্যাসিকের মনোভাবটি বিশ্লেষণ করা খুবই দুঃসাধ্য, কিন্তু এটুকু বলা যায় যে তিনি নিজে তাঁহার চরিত্রগুলির সুখদুঃখের নানা অনুভবের সঙ্গে জড়িত না হইয়া পাইয়া পারেন না। তারকনাথ সকৌতুক স্নেহের সঙ্গে স্বর্ণ ও গোপালের অনুরাগ-উন্মেষের সূক্ষ্ম পরম্পরাটি অনুধাবন করিয়াছেন। অপরিচিত লজ্জা ও সঙ্কোচ, মুখমণ্ডলের হঠাৎ রক্তিমতা, অন্যমনস্কতা আশা-নৈরাশ্যের মধ্যে চিত্তের মুহুর্মুহু আন্দোলন, নিরর্থক প্রতীক্ষা ও নিরর্থক হতাশা, অস্থিরভাবে ইতস্তত সঞ্চালন—পূর্বরাগের এই সমস্ত অনুভব লেখক নিজের ব্যক্তিত্বের গভীরতা হইতেই বিকশিত করিয়াছেন। নাট্যকারের মতো ঔপন্যাসিককেও নিজের চরিত্রের মধ্যে অপরিমেয় চরিত্রের সম্ভাবনাকে জাগাইয়া রাখিতে হয়। সুচতুর অভিনেতা যেমন অসংখ্য চরিত্রের ছদ্মবেশ পরিয়া অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে অভিনয় করিয়া যান, ঔপন্যাসিকও অনেকটা সেইরূপ। প্রতিটি চরিত্রেই তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বটি অনুপ্রবিষ্ট থাকে, তাই প্রতিটি চরিত্রেই হৃৎস্পন্দন তিনি এমন স্বচ্ছন্দে ধরিয়া রাখিতে পারেন। যে ঔপন্যাসিক নিজের একক ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠানভূমিতে এইরকম বহুমুখী ব্যক্তিত্বের উদ্গম-সম্ভাবনা রাখিয়া দেন তিনিই সার্থক ঔপন্যাসিক।

এই দুই পরিচ্ছেদে তারকনাথ যে ভাবে স্বর্ণলতা ও গোপালের পূর্বরাগ-বিজনতার ছবি আঁকিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মনোজ্ঞ। দুজনের ঐ 'ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদে'র সুবিস্তৃত বর্ণনাটি অতিশয় আকর্ষণীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইটি চরিত্রের মুহুর্মুহু স্বগতোক্তি, মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস (বন্ধনীর মধ্যে), প্রতিমুহূর্তের আশা-নৈরাশ্য ও প্রতিমুহূর্তের আত্মসান্ত্বনার বিবৃতিটিকে যেন অতি-সম্প্রসারিত বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া বন্ধনীযুক্ত ঐ দীর্ঘনিশ্বাসগুলিকে হজম করা বেশ একটু শক্ত। বোঝা যায়, বেচারী স্বর্ণলতা ও গোপালের দুরবস্থা লইয়া একটু কৌতুকসৃষ্টিই লেখকের উদ্দেশ্য। হাস্যকর অতিরঞ্জনের অন্তরালে ঐ দুইটি অসহায় চরিত্রের হৃদয়যাতনা প্রচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদটিতে দুইটি পরিচ্ছেদের ঘটনা ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীলকমলের স্বল্পকালীন আবির্ভাব ও বিদায়কে স্বাভাবিকভাবে পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখা চলে না। এই পরিচ্ছেদের মূল ঘটনা রামসুন্দরের ষড়্‌যন্ত্রের ফলে শশিভূষণের দুরবস্থা। নীলকমলের আখ্যান এই পরিচ্ছেদে আরোপিত। মনে হয়, লেখক কেবল সময়ানুক্রম রক্ষার জন্যই তাহাকে এই পরিচ্ছেদে জুড়িয়া দিয়াছেন। আমরা নীলকমল সম্বন্ধে উনত্রিংশ পরিচ্ছেদের টীকায় যে সব আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি, এই পরিচ্ছেদে সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে। "নীলকমলের আর সে পূর্বের শরীর নাই। তাহার কেশ লম্বা হইয়াছে, দাড়ি বক্ষঃস্থল ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে ও শরীর যার-পর-নাই রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে।" এখন নীলকমলের কথা—"এখন আমি মরতে পারলেই বাঁচি।" এই নীলকমলকে দেখিতে আমাদের দুঃসহ ক্লেশ হয়। গ্রন্থকার তাহাকে এই পরিচ্ছেদের মধ্যেই বিদায় দিয়া ভালোই করিয়াছেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'গোপালের মতো হও, পরিণামে স্বর্ণলতা পাইবে'—লেখকের এই বক্তব্যটি উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদগুলির প্রতিটি পংক্তির ভিতর হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। গোপাল কী নয়? সে শান্ত, ভদ্র, সুদর্শন; সে শিক্ষিত, উদার, কার্যকালে তৎপর—দুঃখসহনের কঠোর পরীক্ষায় বারবার সে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর তাহার সেবার কি তুলনা আছে? এই পরিচ্ছেদে লেখক উচ্ছ্বসিতভাবে দুই-দুইবার এই কথাগুলি বলিয়াছেন—"গোপাল নিয়তই হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।"

"কিন্তু পীড়াটা কি……দৈবকার্য করলে ভাল হয় না?"—গুরুদেবের অর্থগৃধ্নু লোলুপতা প্রথম হইতেই প্রকট। শাক্ত কালীঘাটের পাণ্ডা হইতে বৈষ্ণব গুরুদেব পর্যন্ত—হিন্দুধর্মের সর্বত্র যে-পচনক্রিয়া তারকনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাকে ঘৃণা করিতে তিনি ইতস্তত করেন নাই। গুরুদেবের কথা অবশ্য আলাদা। এই লোকটি অর্থের জন্য কোন রকম পাপ করিতেই কুণ্ঠিত নয়। প্রথমে দৈবকার্যের ছলনায় তাহার যে অর্থলোভ প্রকাশিত হইয়াছে, পরে তাহার উপর কোনো ছলনার আবরণই থাকিবে না। কালীঘাটের পাণ্ডা এবং গুরুদেব শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি—দুইপক্ষই ধর্মকে ব্যবসায় বলিয়া মনে করে—ধর্ম জীবিকা অর্জনের উপায়মাত্র। কিন্তু

পাওয়ার ধর্মের দোহাই দিয়া মন্দির-যাত্রীদের উপর খানিকটা অত্যাচার করিয়া লইলেও শশাঙ্কের মতো পাকা অপরাধী তাহারা নয়। শশাঙ্কের চরিত্রটাই খাঁটি villain-এর গাঢ় ধূসর রঙে আঁকা। ধর্মব্যাবসা তাহার শয়তানিকে আরও ভীতিজনক করিয়া তুলিয়াছে, কারণ ধর্মের নামাবলীর আড়ালে তাহার কুচক্রী হৃদয়টিকে সহজে লক্ষ্য করা যায় না।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'উভয়ে তথা হইতে গাত্রোত্থান……কি পরামর্শ করিতেছেন?'—এই সমগ্র অনুচ্ছেদের বর্ণনাটি গ্রন্থের দৃঢ় বাস্তব কাঠামোর মধ্যে অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 'পূর্ণিমার চন্দ্রে'র 'প্রাচীদেশ হইতে পরম রমণীয় কিরণজাল বিস্তার', 'বসন্তের সমীরণ-হিল্লোল', 'কল কল রবে কর্ণশীতল করিয়া গঙ্গা'র 'সাগর সঙ্গমে' যাত্রা, 'নিকটবর্তী উদ্যান হইতে' ভাসিয়া আসা 'নানাবিধ পুষ্পের সৌরভ', এবং এইসব দেখিয়া 'ঈশ্বরের করুণায় বিমুগ্ধ হওয়া'—সবই যেন কিছু মামুলি বিবৃতির সূত্র ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মনে হয় ইহা লেখকের নিজের চোখে দেখা কোনো চন্দ্রালোকিত গঙ্গাতীতের বর্ণনা নয়, পাঠ্যপুস্তক হইতে তুলিয়া-দেওয়া একটি আদর্শায়িত বিবরণ মাত্র। বাস্তব প্রত্যক্ষতার দাবি এই বর্ণনাটি করিতে পারে না, যদিও সমগ্র 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই দাবি আমরা অনেকাংশে মানিয়া লইয়াছি। বোধ হয় শশাঙ্ক ও হরিদাসের ষড়্‌যন্ত্রের নীচতাকে স্পষ্ট করিবার জন্যই লেখক একটি বিপরীত পটভূমিকা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ উদ্দেশ্যের আক্রমণেই তাঁহাকে আবার মামুলি 'ক্লিশে'র খাদে নামিতে হইয়াছে এবং একটি অবাস্তব, অতিরঞ্জিত, উচ্ছ্বসিতভাবে ফাঁপাইয়া-তোলা জোলো বর্ণনার ('padding'-এর) আশ্রয় নিতে হইয়াছে।

'দালান গোত্র, ইংরাজী গাঁই'—হত-স্বার্থ শশাঙ্কের মুখ দিয়া যে ব্যঙ্গের ভাষা বাহির হইয়াছে তাহাতে নবযুগের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা ও ধিক্কার অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহার কারণ, নতুন শিক্ষা তাহার এতদিনকার বিঘ্নহীন, শাঁসালো গুরুগিরির জীবিকাকে সম্মান করিতে চায় না, মাঝে মাঝে সেই জীবিকার অধিকারকে বাধা দেয়, চ্যালেঞ্জ করিয়া করিয়া বসে। 'গোত্র' কথাটিতে বোঝায় কুল, বংশ, বা ঋষি-প্রবর্তিত সন্তান-পরম্পরা। এখানে শশাঙ্ক কথাটিকে তির্যক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছে। তাহার তিক্ত ও স্বার্থহত দৃষ্টিতে যাহারাই ঐশ্বর্যশালী অর্থাৎ দালান-কোঠায় বাস করে তাহারাই 'দালান গোত্র'। গোত্র অর্থে বাসস্থান।

শুধু দালান গোত্র হইলেই শশাঙ্কর ক্ষতি ছিল না, তাহার ব্যাবসার শ্রীবৃদ্ধিরও অন্তরায় ছিল না, কিন্তু তাহার সঙ্গে ঐ সর্বনাশা 'ইংরাজী গাঁই' জুটিয়াছে যে! গাঁই অর্থে বোঝায় বসতি অনুসারে ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ—সংস্কৃত 'গ্রামীণ' হইতে 'গাঁই'। এখানে শশাঙ্ক বোধহয় দীক্ষা বুঝাইতে গাঁই শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছে। যাহারা নব্যশিক্ষিত, তাহাদের কাছে ইংরাজিই আশ্রয়, ইংরাজিই উপায়—ইংরাজির পরিমণ্ডলে তাহারা বাস করে, সুতরাং 'ইংরাজি গাঁই' তো তাহারা হইবেই। ইহারাই শশাঙ্কের যত দুশ্চিন্তা ও ক্রোধের কারণ। 'ইংরাজিতে দু-চারটা কথা বলতে পারলেই হল' বলিয়া শশাঙ্ক যে কটূক্তি করিয়াছে তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়। বস্তুত, অকিঞ্চিৎকর ইংরাজি শিক্ষা লইয়াই বাঙালীর মধ্যবিত্ততা শুরু হয়। ইংরাজির প্রতি বাঙালীর সম্ভ্রমবোধ, যাহা একধরনের 'স্নবারি'তে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও শুরু ঐ সময় হইতেই। তখন পাঠশালায় ছাত্রদের ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করানো হইত, যাহার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ হইত সে ভাষাপ্রয়োগ সামান্য জানিয়াও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইত। সামাজিক উৎসবগুলিতে তাহার জন্য একটি সম্মানের আসন থাকিত। ঐ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের সূত্রে তাহাদের ভালো চাকুরিও জুটিত। বিবাহসভায় কিংবা বাসরঘরে বরকে 'নেবুকাড্‌নেজার' গোছের বিদ্‌ঘুটে শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিয়া বিপাকে ফেলিবার চেষ্টা করা হইত। ইংরেজি শিক্ষার নিম্নোদ্ধৃত যে পদ্ধতিটি রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'একাল ও সেকাল' পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ছেলেরা নামতার মতো সুর করিয়া মুখস্থ করিত—

ব্রিঞ্জাল—বার্তাকু, কুকুম্বর—শশা।
পম্‌কিন—লাউ কুমড়া, প্লৌম্যান—চাষা॥

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রথম দিকে এই কৌতুককর বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলিকে শশাঙ্কর বিদ্বিষ্ট চোখ দিয়া দেখিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে—সামান্য হইলেও এই নূতন শিক্ষা উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজন্মকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে।

"হরিদাস কহিলেন······এমন অদৃষ্ট হবে যে, যে"—শশাঙ্ক ও হরিদাস পরস্পরের যোগ্য সহচর, শয়তানি ও নির্মমতায় দুইজনের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলিতেছে। শশাঙ্ক 'শিশুদিগকে বড় হিতৈষী' বলিয়া 'অবলীলাক্রমে হেমের মৃত্যুকামনা করিলেন'। আর হরিদাসও গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সেই 'সৌভাগ্য'টির কথা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু খলচরিত্র হিসাবে শশাঙ্ক তুলনাহীন, তাহার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া হরিদাসের সাধ্য নয়। তাই হেমের মৃত্যুর কথা উচ্চারণ করিতে গিয়া হরিদাস অর্ধপথে দ্বিধাগ্রস্তভাবে থামিয়া গেল। কিন্তু শশাঙ্ক অত্যন্ত নির্বিকার প্রশান্তির সঙ্গে হৃদয়ের সমস্ত জিঘাংসাকে ব্যক্ত করিয়া গেল। একটু পরেই

তাঁহার এক প্রজার বিবাহ দেওয়ার ঘটনাও সে একই রকম নির্লিপ্ততার সঙ্গে বলিয়া গেছে। লেখক যেন একটি কঠিন অস্ত্রোপচার দ্বারা শশাঙ্কের হৃদয় হইতে বিবেক নামক অ-দৃষ্ট অঙ্গটিকে ছিঁড়িয়া লইয়াছেন, তাই সেখানে স্নেহ, দয়া, মায়া, ক্ষমা—মানুষের কোনো কোমল গুণ আর অবশিষ্ট নাই। শশাঙ্ককে পশু বলিলে অধমতম পশুদেরও নিন্দা করা হয়। অবশ্য পরবর্তী পরিচ্ছেদে এক মুহূর্তের জন্য সে তাহার অবলুপ্ত বিবেকের কঠোর দংশন অনুভব করিয়াছিল। স্বর্ণলতার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ তাহার মর্মে অত্যন্ত ক্ষণিকের জন্য একটুখানি তীব্র গ্লানির জন্ম দিয়াছিল। কিন্তু তাহা ঐ ক্ষণিকের জন্যই।

'যাহার যে ব্যবসায়···ভট্টাচার্যরা সন্ধ্যাহ্নিক করেন না।'—তারকনাথের ব্যঙ্গ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই মন্তব্য করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে এই অনুচ্ছেদটির প্রতি বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'পোষ্ট অফিসের সনাতন নিয়মানুসারে···বিলি হইবার সম্ভাবনা।'—একটি সাধারণ লৌকিক ঘটনাকে লেখক অত্যন্ত সুচতুরভাবে কাহিনী-গ্রন্থনের কাজে লাগাইয়াছেন। যে সামান্য সূত্রটির উপর ভর করিয়া লেখক কাহিনীটিতে এত জটিল সম্ভাবনা উন্মোচিত করিয়াছেন, সেটি ঐ যুগের একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা, বাস্তব, ও বিশ্বাসযোগ্য। আকস্মিকতা বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে, কিন্তু এটুকু পর্যন্ত থাকিলে গল্পের কোনো অসম্মান হইত না। সেই অবমাননাটুকু ঘটিয়াছে এই পরিচ্ছেদেই, একটু পরেই। লেখক গোপালের স্বর্ণলতা-উদ্ধারের পথটি অনাবশ্যকভাবে কণ্টকিত করিতে চান, সেজন্য একটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই তাহার পথে একাধিক প্রস্তরখণ্ড ফেলিয়া রাখিলেন। প্রথমে, চিঠিটি আসিল দেরি করিয়া। দ্বিতীয়ত, হেমের ব্যক্তিগত চিঠি ভাবিয়া গোপাল চিঠিটি যথাসময়ে খুলিলই না। তৃতীয়ত, নানা কাণ্ডের পর 'গোপালও নদীর ঘাটে গেলেন, অমনি ষ্টীমার "হুস্ হুস্" করিয়া যেন তাহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে চলিয়া গেল।' তারপর গাড়িতে উঠিয়া গোপালের মূর্ছা, হতচেতনভাবে বর্ধমান পৌছানো, টিকিট না-করার অপরাধে একরাত্রি গারদবাস—লেখক একটির পর একটি বেড়া বেচারীর পথের উপর স্থাপন করিতে লাগিলেন। গোপালের বিশ্বাস ছিল যে, "তাঁহার স্বর্ণলতা লাভ হইবেক।" কিন্তু তারকনাথ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এই নীতি মানিয়া চলেন,—স্বর্ণলতাকে তিনি বীর্যশুল্কা করিয়া রাখিয়াছেন। গোপাল শিক্ষিত, গুণবান, প্রিয়দর্শন—কিন্তু তাহাই

যথেষ্ট নয়। স্বর্ণলতা নারীত্বের পূর্ণতম প্রতিমা, তাহাকে লাভ করিতে হইলে আরও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দরকার। এ যেন সেই রূপকথার রাজপুত্রের কাহিনী। তাহাকে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে হয়, তেপান্তরের বিশাল মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হয়, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাকে নিঃশেষে বধ করিতে হয়, তারপর ঘুমন্ত রাজকন্যার দুই পাশের সোনার কাঠি রূপার কাঠি বদল করিতে হয়। এত বাধাকে সম্মান করিতে হয় সুখসমাপ্তির জন্য। গোপাল সমস্ত বাধাই উত্তীর্ণ হইয়াছে—লেখক তাহাকে স্বর্ণলতার যোগ্য অধিকারী করিয়া দিয়াছেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধের রক্তবীজ'—মার্কণ্ডেয় পুরাণের তেরোটি অধ্যায়ের নাম দেবী-মাহাত্ম্য। এই দেবী-মাহাত্ম্য নামক মার্কণ্ডেয় পুরাণের ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই হইল প্রসিদ্ধ 'চণ্ডী'—গ্রন্থ। 'চণ্ডী' বর্তমানে শাক্তসম্প্রদায়ের সর্বাধিক মান্য শাস্ত্র-গ্রন্থ। "চণ্ডী-গ্রন্থ-মধ্যে তিনকালে তিনটি প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া দেবীর মহিমা প্রচারিত হইয়াছে—প্রথমে দেবীর সহায়তায় বিষ্ণু কর্তৃক মধুকৈটভ অসুরদ্বয় বিনাশে; দ্বিতীয়ে স্বয়ং দেবী কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধে। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-উপলক্ষে অবশ্য দেবীকে চণ্ড-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রভৃতি আরও অনেক অসুর বধ করিতে হইয়াছে।"—'ভারতীয় শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

রক্তবীজ ছিল শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি। তাহার এক একটি রক্তবিন্দু মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেই তাহারই মতো ভীষণ আকৃতির এক একটি অসুরের জন্ম হইত। যুদ্ধে এই দানবটি দেবীকে খুব সঙ্কটে ফেলিয়াছিল। শেষে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া চামুণ্ডারূপিণী দেবী নিজের জিহ্বা প্রসারিত করিয়া ঐ সব অসংখ্য রক্তবীজের রুধির পান করিতে লাগিলেন। ফলে দৈত্যের রক্ত আর ভূমি স্পর্শ করিতে পারিল না এবং আর রক্তবীজ উৎপন্ন হইল না। দেবীও সহজে সকলকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।

'শশাঙ্ক...পূর্বাপেক্ষা ভীষণতর বিকট হাস্য হাসিলেন'—সাহিত্যে বাস্তববোধের অনেকগুলি পর্যায় পার হইয়া আসিয়া আমরা একথা কিছুতেই বুঝিতে পারি না—গল্পের 'ভিলেন' বা খলচরিত্র প্রতিক্ষেত্রেই বিকট হাস্য কেন করিবে। আরও তো কত রকমের হাসি আছে,—মৃদু হাসি তীক্ষ্ণ হাসি দৈত্যো হাসি—তাহার যে-কোনো একটা হাসি তারকনাথ শশাঙ্কর জন্য বরাদ্দ করেন নাই কেন? শয়তান

চরিত্রকে শয়তানের চেয়েও ভীষণতর করিবার এই মামুলি চেষ্টা করিয়া কী লাভ? এই হাসিতেই কেমন রোমান্সের গন্ধ রহিয়া গেছে। তারকনাথ 'স্বর্ণলতা' রচনার সময় বাস্তবতার দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু এইসব ছোটোখাটো ক্ষেত্রে তাঁহার অগোচরে খানিকটা রোমান্সের মামুলি অতিরঞ্জন ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কূটচরিত্রের এই অতিনাটকীয় হাস্য ইংরেজী-বাংলা রোমান্সে, বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে ও যাত্রায় এবং সস্তা গোয়েন্দা কাহিনীতে বহুবার দেখা গিয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে তারকনাথ ডিকেন্সের দীক্ষাকে পুরাপুরি বিস্মৃত হইয়াছেন। ডিকেন্সের খলচরিত্ররা কখনও বিকট হাসিয়া নিজেদের খলতাকে এত প্রকট করিয়া দেয় না। 'ডেভিড্ কপারফিল্ড্'-এ যুরিয়া হীপের সুবিনীত হাসিটি অত্যন্ত মধুর ছিল। তারকনাথ নিজের অভিজ্ঞতার বাহিরে গিয়াই বিপদে পড়িয়াছেন। চরিত্র পরিকল্পনায় যেখানেই একটু কল্পনার ছোঁওয়া লাগিয়াছে সেখানেই চরিত্রটি কখনও সাধুতা, কখনও ক্রূরতার অতিশয্যে অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে।

'সূর্যদেবের বংশে পক্ষপাতিত্ব .....পিতাপুত্র উভয়েই সমান।'—পুত্র অর্থে সূর্যতনয় মহারথ কর্ণের কথাই সম্ভবত আভাসে বলা হইয়াছে। অভিমন্যু বধের সময় কর্ণ অত্যন্ত অন্যায় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কিশোর অভিমন্যুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ঐ মহাবল বালকটির সঙ্গে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই, পরে দ্রোণের উপদেশে সমস্ত যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করিয়া পিছন হইতে অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন করিলেন, অশ্ব ও সারথিকে বধ করিলেন। তাহার পরে দ্রোণাচার্য, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও শকুনি একযোগে নিষ্করুণ হইয়া রথচ্যুত তরুণ অভিমন্যুর উপর শরবর্ষণে প্রমত্ত হইলেন। সেই অসহায় অথচ অমিত-পরাক্রমী বালকটিকে একটু পরেই দুঃশাসনপুত্রের গদাঘাতে প্রাণ দিতে হইল। ছয় জন মহা শৌর্যবান যোদ্ধা মিলিয়া একাকী নিঃসহায় অভিমন্যুকে নিপতিত করা যে নিদারুণ অধর্মের কাজ হইয়াছিল—কর্ণ সেই কলঙ্কিত অধর্মের একজন বড়ো অংশভাক্। তিনিও কি পিতা সূর্যের মতোই করুণাহীন? অভিমন্যু বধের ঐ ইঙ্গিতটি স্বর্ণলতার এই 'আনায় মাঝারে' অবস্থার বিবেচনায় অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদের তুলনায় এই পরিচ্ছেদটিকে অনেক স্বাভাবিক মনে হয়। মনে হয় এখানে তারকনাথ যেন তাঁহার স্বক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। পূর্বের পরিচ্ছেদে শশাঙ্কর সংলাপ খলচরিত্রের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই, বরং একটু বেশি সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের তাহা অস্বাভাবিক লাগে। আর তাহার সেই বিকট অট্টহাস্য! ঐ অট্টহাস্যই আগের পরিচ্ছেদটিকে অনেকখানি অবাস্তব করিয়া দিয়াছে। বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন, একেবারে নিছক বিশুদ্ধ ভালোলোক যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—নিছক বিশুদ্ধ খারাপ লোকও তেমনই দুর্লভ। শশাঙ্ককে ঐ নিছক খারাপ লোক করিতে গিয়া লেখক ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাহার চরিত্র ভয়ংকর হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। শয়তানকে এখন আমরা যতটা খারাপ মনে করি, আসলে কি সে ততটা খারাপ ছিল?

বরং একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে প্রমদা ও তাহার মায়ের কথাবার্তা, আচরণ সবই অত্যন্ত সঙ্গত ও বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়।

'রমেশের········মদ আনিতে দেরী হইল।'—এই ছোট্ট, সামান্য, আপাতনির্দোষ বাক্যটিতে লোক একটি ভবিষ্যৎ জটিলতার প্রস্তুতি সরিয়া রাখিলেন। রমেশ মদে লডেনম্ বা আফিঙের আরক মিশাইতেছিল [ত্রি-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য], তাহার জন্যই মদ আনিতে এই বিলম্ব।

'সন্ধ্যাবধি যে ঝড় হইতেছিল'—প্রমদার পুঞ্জীভূত পাপ লেখকের সহ্যশক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আর তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না,—তারকনাথ শেষ শাস্তির মুখে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন। তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি না কে জানে, কিন্তু পাপের দণ্ড শুরু হইয়া গেল। লেখক একা সম্পূর্ণ নিজের হাতে ঐ শাস্তির দায়িত্বটুকু রাখিতে যেন সম্মত নন। তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঐ পাপীয়সীর দণ্ডবিধানে সহায়তার জন্য আহ্বান করিলেন। বেগবান ঝঞ্ঝা বহিল, ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল, বিদ্যুৎপাত ও বজ্রনিনাদ, গৃহধ্বংস, প্লাবন, হাহাকারময় মৃত্যুলীলা—এই সবের মধ্যে প্রমদার জীবনের একমাত্র মমতা অলঙ্কারের বাক্সটি তাহার হস্তচ্যুত হইল। ভাগ্যিস প্রমদার মৃত্যু ঘটাইয়া লেখক পাপের সবচেয়ে মামুলি শাস্তিটি তাহাকে দেন নাই! তাহাকে গৌরবহীন, অহংকারহীন, অধিকারহীন, পরাশ্রয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকার যে ভয়াবহ দণ্ড দিয়াছেন, তাহা সম্ভবত মৃত্যুর চেয়েও কঠোর। কিন্তু এই পরিচ্ছেদে লেখক অত ঝড় বৃষ্টি বন্যা বিদ্যুৎ বজ্রের অবতারণা ঘটাইলেন কেন? তিনি কি ইহাই বলিতে চান যে ইহা নিয়তির খেলা—প্রমদা যে পাপ করিয়াছে তাহার শাস্তিদানের জন্য

সমগ্র বিশ্ববিধানের মধ্যে প্রস্তুতি চলিয়াছে। স্নেহহীন প্রেমহীন কুটিলপ্রাণ এই নারীটি নারীর সহজ ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট, তাই কি ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিকূলতা দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে চাহিলেন? সে উত্তর আমাদের মেলে নাই। কিন্তু আমরা জানি যে পাপের এইরূপ দণ্ডবিধান ঈশ্বরের ক্ষমতার যে পরিচয়ই দিক না কেন, ঔপন্যাসিকের ক্ষমতার কোনো পরিচয় দেয় না। এই deus-ex-machina বা দৈবী আকস্মিকতা আমদানি করিয়া তারকনাথ নিজের দুর্বলতারই পরিচয় দিয়াছেন। আসলে প্রমদার উপর তাঁহার ক্রোধ ছিল প্রচণ্ড, তাহার পাপের ক্রমবর্ধমান্ পৈশাচিকতা দেখিয়া তিনি নিজেই ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই নিজে তাহার শাস্তি দিলেন, প্রকৃতির হাতেও তাহার নবিশেষ লাঞ্ছনা ঘটাইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিয়াছে'—প্রমদার বেলায় তারকনাথ ঝড়বৃষ্টি-বন্যাকে প্রেরণ করিয়াছেন, শশাঙ্কের ক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন আগুনকে। 'অসৎ কার্যের বিপরীত ফল'—পরিচ্ছেদের এই নামকরণ হইতেই বোঝা যায় লেখক একটি অনিবার্য নৈতিক পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 'স্বর্ণলতা'র কাহিনী তাহার নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী বিবর্তিত হইতেছিল, কোথা হইতে লেখক একগাদা আকস্মিকতা আমদানি করিয়া বিপর্যয় ঘটাইলেন। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, আগুন—ইহারা যেন লেখকের আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র, 'টেম্পেস্ট্' নাটকের প্রস্পেরোর মতো যেন লেখক ইচ্ছামতো তাঁহার যাদুকৌশলে এইসব প্রাকৃতিক আন্দোলন-গুলিকে আমন্ত্রণ করিতেছেন—কেবল উপন্যাসের অপরাধী চরিত্রগুলিকে শাস্তি দিবার জন্য। ঝড় ও আগুন—ইহারা লেখকের নির্মম ক্রোধ হইতে প্ররোচনা পাইয়াছে—প্রমদা ও শশাঙ্ককে শাস্তি না দিয়া ইহারা ছাড়িবে না। শশাঙ্কের যোগ্য শাস্তি কী—ইহা নির্ধারণ করিতে গিয়া লেখককে একটুও দ্বিধায় পড়িতে হয় নাই। যে স্বর্ণলতাকে তিনি নিজের বিন্দু বিন্দু স্নেহমমতায় নির্যাস দিয়া অপরূপ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন সেই স্বর্ণলতাকে যে দুর্বিপাকে ফেলিতে চায়—সে-পাষণ্ডের শাস্তির ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ডের নীচে নামাই চলে না। প্রমদাকে ক্ষমা করা চলে;—তাহার ষড়্যন্ত্রের আঁচ স্বর্ণলতার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু শশাঙ্ককে ক্ষমা করা অসম্ভব। এই পরিচ্ছেদের শেষের অংশটুকু পড়িলে স্পষ্ট হয় শশাঙ্কের প্রতি লেখকের কী নিদারুণ অক্ষমা,—শশাঙ্ককে শাস্তি দিতে লেখক কোনো নির্মমতাই বাকী

রাখিবেন না। আগুন এবং কুঠারের আঘাতে বুক বিদীর্ণ হওয়া—মৃত্যুর এই দ্বিমুখী আক্রমণ হইতে শশাঙ্কর পরিত্রাণের কোনো পথ আর লেখক খোলা রাখেন নাই। মনে হয়, শশাঙ্কের মৃত্যুর দৃশ্যটি লেখক নিষ্ঠুরভাবে উপভোগ করিয়াছেন। টাকা উদ্ধার করিবার জন্য শশাঙ্কর প্রাণপণ প্রয়াস, কোমরের ঘুন্‌সিতে বাঁধা চাবি ফেলিয়া আসা, স্বর্ণলতার পলায়ন, তক্তপোশের দেরাজ ভাঙিবার জন্য কুঠারের সন্ধান, কুঠারঘাতে চালের জলন্ত আড়কাঠা ভাঙিয়া শশাঙ্কেরই পৃষ্ঠে নিপতিত হওয়া এবং সর্বশেষে হাতের কুঠারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়া—ঘটনার সমস্ত ক্রম-গুলিকে লেখক যেন গভীর তৃপ্তির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া গেছেন। প্রতিটি বাক্যের অন্তরাল হইতে তাঁহার নিষ্করুণ উল্লাস ধ্বনিত হইতেছে। ক্ষমা নাই, দুর্বলতা নাই, দ্বিধা নাই—লেখক আঘাতের পর আঘাত স্তূপীকৃত করিয়া শশাঙ্ককে শেষ সর্বনাশা মহাভয়ংকর মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার হাতের লেখনী এতটুকু কম্পিত হয় নাই। 'শশাঙ্কের জীবনের শেষ অধ্যায়' তারকনাথ যেরূপ আড়ম্বর করিয়া সমাপন করিছেন তাহার মধ্যে ধর্ষকামী [Sadist] নির্মমতা আছে কি না জানি না। আমাদের অভিযোগ করিবার কিছুই নাই,—শশাঙ্ক তাহার পাপের যোগ্য শাস্তিই পাইয়াছে, কিন্তু তবুও একটু প্রশ্ন থাকিয়া যায়। লেখক ঐ ক্রূর পাপের দেহটিকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে চান সত্য, কিন্তু, যেভাবে শশাঙ্কের ধ্বংস ঘটানো হইয়াছে তাহার স্বাভাবিকতায় সন্দেহ জাগে। আমাদের মধ্যেকার রূপকথাজীবী শিশুত্বটুকু হয় তো শশাঙ্ক নামক মানবরাক্ষসের এই ভয়াবহ পরিণামে সুখী হইবে কিন্তু পরিণত বিচারবোধ ইহার প্রয়োজনীয়তায় সংশয় প্রকাশ করিবে। অপরাধীকে একপাল সিংহের মুখে ঠেলিয়া দিয়া তাহার মৃত্যুর প্রতিটি বীভৎস পর্যায় বুভুক্ষু আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিবার যে অভ্যাস সভ্যতার পুরানো যুগে আমাদের ছিল, সেই অভ্যাস, সেই অমার্জনীয় কঠিন উল্লাসের স্মৃতি কি এখনও আমাদের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে?

'হরিদাসের পুত্র ক্ষুণ্নমনে অনুসরণ করিলেন।'—শশাঙ্কের মৃত্যু লইয়া তারকনাথের উত্তেজনা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ঐ উত্তেজনা 'স্বর্ণলতায়' তাঁহাকে বহুবার আক্রমণ করিয়াছে, নিজের নিরপেক্ষ রোহভূমিটি হইতে নানা অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য তিনি বহুবার লাফাইয়া নামিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে একটি দুর্লভ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ছিল। 'স্বর্ণলতা'র রচয়িতা হিসাবে তাঁহার যতখানি সফলতা, তাহা ঐ আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যই আসিয়াছে। শশাঙ্কের ঐ মৃত্যুদৃশ্যে দুর্বল লেখকের সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়িবার কথা, কিন্তু তারকনাথ তাহার পরেও হরিদাসের পুত্রের 'ক্ষুণ্নমনে সমপাঠী বয়স্যদিগের সহিত

ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন'-এর সংক্ষিপ্ত লঘু ছিন্নদৃশ্যটিকে লক্ষ্য করিতে ভোলেন নাই। বোধহয় শশাঙ্কের মৃত্যুই তাঁহার প্রতিবিধানের সমস্ত উত্তেজনাকে প্রশমিত করিয়া দিয়াছে, তাই তিনি এখন শান্ত প্রসন্ন চোখে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুক ও লঘুতাগুলির দিকে চাহিতে পারিতেছেন। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ, নিজেকে উত্তেজনা হইতে প্রসন্নতায় লইয়া আসার জন্য উপন্যাসের ঘটনাবলীই দায়ী বলিয়া মনে হয়।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কাহিনীর যে সূত্রটি গদাধর-রমেশের আখ্যান লইয়া নির্গত হইয়াছিল তাহা লেখক এই পরিচ্ছেদে সংহরণ করিলেন। রমেশ তাহার যোগ্য শাস্তি পাইল, কিন্তু তাহার প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতিই জাগে না। শশাঙ্ককে লেখক যেরূপ ঘটা করিয়া নিজের হাতে শাস্তি দিয়াছেন, রমেশের ক্ষেত্রে তাহার কিছুই নাই— অত্যন্ত অনুত্তেজিত ও অবিচলিতভাবে তিনি রমেশকে তাহার স্বাভাবিক পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এখানে জজসাহেব এবং জুরিদের হাতে তারকনাথ সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিয়াছেন, নিজেকে অনর্থক ব্যতিব্যস্ত করেন নাই। কাহিনীতে রমেশ স্বর্ণলতা হইতে দূরে অবস্থান করিয়াছে, তাহার অপরাধ স্বর্ণলতাকে স্পর্শ করে নাই। এইজন্যই কি লেখক রমেশের শাস্তিটুকু এত সহজ নির্লিপ্তির মধ্যে উচ্চারণ করিতে পারিলেন?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'সকলেই যাহাদিগের পদলেহন…পরিত্যাগ করিবেন?'—মাঝে মাঝে তারকনাথের কলম দিয়ে দুএকটি তীব্র বক্রোক্তি বাহির হইয়া আসে, যেগুলি তাঁহার স্বাভাবিক প্রসন্নতার মধ্যে একটু বেমানান বলিয়া মনে হয়। সমাজের উচ্চনীচের বৈষম্যবোধ তাঁহাকে কোনোদিন তেমন পীড়িত করে নাই, বঙ্কিমচন্দ্র যে জ্বালা লইয়া 'সাম্য' রচনা করিয়াছিলেন সেই জ্বালা তারকনাথের ছিল কিনা সন্দেহ। তবু মাঝে মাঝে ভল্‌তেয়ার-গন্ধী দু-একটি শাণিত বিদ্রূপ তাঁহার কলম হইতে নির্গত হইয়াছে, যেগুলি পড়িয়া আমাদের সংশয় জাগে—তবে কি তারকনাথ পৃথিবীকে, মানুষকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না? যাহা কিছু আছে, ঘটিতেছে— সকল কিছুর প্রতি তাহার কি খুব প্রচ্ছন্ন এবং তীব্র কোনো ক্ষোভ ছিল? যে তারকনাথ বিশ্ববিধানের মধ্যে সর্বত্রই একটি সুগভীর সামঞ্জস্য দেখিয়াছেন—লক্ষ্য

করিয়াছেন যে এখানে পাপ করিলে শুধু মানুষের হাতে নয়, প্রকৃতির হাতেও কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়, সেই তারকনাথের মুখ দিয়া এখন একটি সংশয়াকীর্ণ বক্রোক্তি কেমন করিয়া বাহির হইল ভাবিতে বিস্ময় লাগে। এই কথাটি যেন তাঁহার নিজেকেই প্রতিবাদ। কিংবা হয় তো তিনি নিজের সৃষ্টির রসে নিজেই নিমগ্ন হইয়া গেছেন, গোপালের বাধাবিপত্তিতে নিজেই এমন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে বিশ্ববিধানের প্রতি একটি কঠিন অবিশ্বাস আসিয়া হঠাৎ তাঁহার মানসিক সংস্থিতিবোধকে বিচলিত করিয়া দিয়াছে।

'অনতিদূরে জনকতক নৌকায় মাঝি'—এই Coincidence বা আকস্মিক সংযোগের উপর পরবর্তী সমস্ত ঘটনাবলী নির্ভর করিতেছে। ঔপন্যাসিকের কাছে আকস্মিকতা একটা উপায় বা অস্ত্র, গ্রীক নাটকের দৈবযন্ত্রের [deus-ex-machina-র] মতোই তাহা যখন তখন আখ্যানের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিতে পারে। আকস্মিকতা জীবনেও আছে, সুতরাং তাহা উপন্যাসে পরিগৃহীত হইবার পক্ষে আদর্শগত কোনো বাধা নাই। তবে উপন্যাসে আকস্মিককেও বাস্তবের বা সম্ভাব্যতার ভান করিতে হয়, তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠিতে হয়। তারকনাথ এখানে অত্যন্ত চতুরভাবে এই ঘটনাটিকে একটা বিশ্বাস্যতার আবরণ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আকস্মিকতার প্রয়োগে তিনি তাঁহার মন্ত্রগুরু ডিকেন্সের কাছ হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন। ডিকেন্স গল্পের খাতিরে আকস্মিকতার অবতারণা ঘটাইতে কোনোরূপ দ্বিধাই করিতেন না। সমারসেট মমের এই কথা অত্যন্ত যথার্থ যে, ডিকেন্স 'was not bothered by the necessity the modern novelist is under to make events not only likely, but so far as possible, inevitable'. [The World's Ten Great Novels]. তখনকার পাঠকেরাও অবশ্য এখনকার পাঠকদের মতো এতটা খুঁতখুঁতে ছিল না, তাহারা গল্প পড়িবার আশায় দুর্বহরকমের অবিশ্বাস্য যোগাযোগগুলিকেও বিনা-প্রতিবাদে হজম করিয়া যাইত।

„বড়মানুষে পেতল পরলে…পেতলের মোহর।"—বক্তা যে দ্বিতীয় মাঝিটি—তাহার বিষয়বুদ্ধি ও সাংসারিক জ্ঞান খুব প্রখর বোঝা যাইতেছে। এই কথা যখন বলা হইতেছে তখন সামন্ততন্ত্রের যুগ কাটিয়া গেছে, বাংলাদেশে ধনতন্ত্র এবং তাহার সঙ্গী নূতন রেনেশাঁস আসিয়াছে—তাহা স্পষ্ট। দরিদ্রের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অত্যাচার ও শোষণ চলিয়াছে, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সবটুকুই বিত্তবান লোকেরা সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে। ঐ বড়মানুষের দল তাহাদের সুবিধামতো নিজেদের মূল্যবোধ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা সমাজের উচ্চতম শ্রেণী, সুতরাং সমস্ত সম্ভ্রম ও সম্মান তাহাদের প্রাপ্য। তাহারা যাহা খায়, যাহা পরিধান

করে, তাহা বলে—সমস্তই আদর্শ ও অনুকরণীয়। বিত্তবান্-শাসিত সমাজে সমস্ত সমাজেরই এইরকম একটা হীনমন্যতা জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। লক্ষ্মী যাহাদিগকে আশীর্বাদ দিয়া ধন্য করিয়াছেন, তাহারা আমাদের সমস্ত প্রশংসা প্রভুর মতো রাজকর হিসাবে আদায় করিয়া লয়। সুতরাং বিত্তশালীর প্রতি মানুষের মনে এইরকম তোমামোদের ভাব জন্মিয়া গেছে। কারণ, বহু অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ দেখিয়াছে, বড়লোকের সামান্য প্রসাদটুকুও তুচ্ছ করিবার মতো নয়। ঐ প্রসন্নতার জন্য ন্যায়নীতি বা সত্যবিসর্জন দিলে মানুষের বিবেক একটু পীড়িত হয় বটে, কিন্তু বিবেকের ঐ পীড়ার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয় বড়লোকের অনুগ্রহ। আমরা সকলেই বোধ হয় ঐ অনুগ্রহের জন্য অন্তরে অন্তরে লালায়িত, ঐ লোলুপতা আমাদের অস্থি-মজ্জায় এমনভাবে মিশিয়া গেছে যে প্রত্যক্ষ ফলপ্রাপ্তির আশা না থাকিলেও আমরা অনেকসময় অহৈতুকীভাবে সমৃদ্ধিমানের প্রশংসা করিয়া যাই। ঐ চাটুকারিতা অবশ্য একেবারে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন নয়, ভবিষ্যতে কোন প্রকার লাভের একটি ক্ষীণ প্রত্যাশা তাহার সহিত জড়িত থাকে। এই যে আমরা 'বড়মানুষ'কে খুশী করিবার জন্য মিথ্যাচার করি, আত্মবঞ্চনা করি,—তাহারা পিতলের অলংকার পরিলে তাহাকে সোনা বলিয়া স্বীকার করিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা কার না—আমাদের মনুষ্যত্বের ঐ অবমাননার দাম বড়লোক অর্থ বা অনুগ্রহরূপে দিয়া থাকে। বড়লোক শ্রেণী ও তাহাদের প্রসাদ-লোলুপ মধ্যবিত্তরা এইরকম একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ফাঁদিয়া রাখিয়াছে।

এ মাঝিটির তীব্র উক্তি হইতে বোঝা যায়, সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত স্তরটাতে ঐ 'বন্দোবস্তে'র প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই অভিযোগ তাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সঞ্চয় করিয়াছে। যে-সমাজে কেবল বিত্তের দ্বারা সমস্ত মূল্য নির্ধারিত হয়, যে-সমাজে কেবল টাকাকড়ি দিয়া সমস্ত সত্য কিনিয়া লওয়া হয় এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে স্বীকাব করানো হয়—সেই সমাজের ethics বা নীতিতে মাঝিটির আর আস্থা নাই। সে জানে, 'লোকে' অর্থাৎ সাধারণ সামাজিক মানুষেরা 'বড়মান্‌ষে' 'পেতল পরলে' সোনা বলে, কিন্তু তাহারা যদি মোহর গাঁথিয়া গলায় পরে, তবু 'লোকে' সেগুলিকে 'পেতলের মোহর' ছাড় আর কিছুই বলিবে না। কারণ, ঐশ্বর্যের প্রতি আমাদের যেরূপ মনোভাব, দারিদ্র্যের প্রতি আমাদের মনোভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমোক্ত-জনকে আমরা আমাদের অগ্রিম বিশ্বাস নিবেদন করি, শেষোক্তদের দিই অগ্রিম অবিশ্বাস। অর্থদাস সমাজে সত্যিমিথ্যার ক্রয়বিক্রয় এইভাবে হয় বলিয়া মাঝিটির ক্ষোভের মধ্যে ঐ সমাজকে কশাঘাতের একটা নিষ্ফল ও অসহায় চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'স্বর্ণলতা'র নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

২। 'বাংলা উপন্যাসের আদিযুগে চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল।'—'স্বর্ণলতা'র চরিত্রগুলি আলোচনা করিয়া এই উক্তিটির বিচার কর।

৩। "বিষবৃক্ষ' ও 'স্বর্ণলতা' প্রায় সমসাময়িক, দুইটিই পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস, কিন্তু 'স্বর্ণলতা' প্রতিদিনের পাঁচালী মাত্র, সার্থক উপন্যাস নহে।"—এই উক্তিটির বিচার কর।

৪। 'বাস্তবজীবনচিত্রে, করুণ ও হাস্যরসে জীবন্ত গার্হস্থ্য-কাহিনীর এমন অনবদ্য রূপ উপন্যাসক্ষেত্রে কেবল অভিনব নহে, তাহা বাংলার নাট্যসাহিত্যকেও প্রভাবিত করিয়াছে।'—বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'স্বর্ণলতা'র বিশেষ স্থান আলোচনা প্রসঙ্গে এই উক্তিটির আলোচনা কর।

৫। 'স্বর্ণলতা'র জনপ্রিয়তার কারণ ও বঙ্কিম-যুগের উপন্যাসধারায় ইহার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

৬। 'স্বর্ণলতা'য় সামাজিক উপন্যাসের আদর্শ বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। ইহার কারণ নির্ণয় কর।

৭। "বঙ্কিম-সমসাময়িক যুগে কল্পনা-ভারাক্রান্ত উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'স্বর্ণলতা' এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।"—আলোচনা কর।

৮। "মানুষের স্থূল অনুভূতি লইয়া 'স্বর্ণলতা'র কারবার—সূক্ষ্মতা ও গম্ভীরতার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কম।"—আলোচনা কর।

৯। "যে-সাহিত্য সমাজের নিখুঁত নিপুণ বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে, শিল্প-মূল্যের সম্পদে সে যদি একেবারে কানাকড়ি হীন না হয়, তবে জনসমাদরের ব্যাপারে অন্তত তার মার নেই। 'স্বর্ণলতা' তার দৃষ্টান্ত।"—আলোচনা কর।

১০। 'স্বর্ণলতা'কে প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস বলা যায় কি? বলিবার পক্ষে তোমার নিজস্ব যুক্তিপ্রদর্শন কর।

১১। 'স্বর্ণলতা'র প্রণয়চিত্রে ও তেজস্বিতায় পরবর্তী যুগের নারীচরিত্রের পূর্বাভাস দেখা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে তোমার বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ কর।

১২। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের যথার্থ রূপ কতটা প্রস্ফুটিত হইয়াছে আলোচনা কর।

১৩। সামাজিক উপন্যাস হিসাবে 'স্বর্ণলতা'র সার্থকতা বিচার কর।

১৪। বাংলা উপন্যাসের ধারায় তারকনাথের বিশিষ্ট আসনটি নির্দেশ কর।

১৫। পারিবারিক উপন্যাসে পরিবার-জীবনবহির্ভূত নানা বিচিত্র আখ্যান ও অদ্ভুত ঘটনা স্থান পাওয়ায় উপন্যাসের উৎকর্ষের হানি হইয়াছে কি না বিচার কর।